শিশুকন্যা মৌসুমীকে,
যুদ্ধভয়মুক্ত, নিরাপদ
এক ভবিষ্যতের জন্যে

এক

ঝড়ের কেন্দ্রে

প্লেন তখন সবেমাত্র সমুদ্র-সীমা ছাড়িয়ে এসেছে।

নিচে, অনেক নিচে, অলস স্বপ্নের মতো সকালের দ্বিতীয় প্রহরের আলোয় তটের রেখা দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট। ককপিট থেকে ক্যাপ্টেনের গলার আওয়াজ ভেসে এলো: 'উই হ্যাভ নাউ এন্টার্ড দি টেরিটরি অব ভিয়েৎনাম।'

ভিয়েৎনাম! আমরা যে যার সিটে সোজা হয়ে বসে ঝুঁকে পড়লাম জানালার দিকে। আরো ভালো করে তাকালাম বাইরের দিকে।

ভিয়েৎনাম!

ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর আমাদের সতর্ক করে দিল: ভিয়েৎনাম সরকারের নিয়মানুসারে প্লেন থেকে নিচের ছবি তোলা নিষিদ্ধ, কেউ যেন ছবি তোলবার চেষ্টা না করেন।

এই সেই দেশ যার জন্যে আমরা দীর্ঘ প্রহর অপেক্ষায় ছিলাম! সান ফ্রান্সিসকো থেকে আমরা, অর্থাৎ এসিয়া ও দূর প্রাচ্যের একদল সাংবাদিক, রওনা হয়েছিলাম সন্ধ্যা রাতে। তারপর গভীরতর রাত্রির দিকে আমাদের প্লেন ছুটে চলেছিল। প্যান আমেরিকানের বোয়িং ৭০৭। আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখা পার হয়েও রাত্রি তখনও গভীর হচ্ছিল। তিনবার ব্রেকফাস্ট খেয়েও সে-রাত্রি শেষ হয়নি। তবু যার কথা ভেবে ওই দীর্ঘ জাগর রাত্রি আমরা অনায়াসে কাটিয়ে দিয়েছিলাম, এ সেই দেশ!

আজকের দুনিয়ার দৃষ্টির কেন্দ্র-বিন্দু, সাংবাদিকের স্বর্গভূমি এই দেশ। কত কল্পনায়, কত বেদনায়, কত হতাশায়, কত বীভৎসতায় মোড়া। সেই দেশ এখন আমাদের চোখের তলায়।

লে ভান বিয়ার দেশ!

আমার সাংবাদিক বন্ধু লে ভান বিয়া। কতদিনেরই বা আলাপ এবং কতটুকুই-বা পরিচয়। তবু আজো যখনই ভিয়েৎনাম নিয়ে কোনো কথা ওঠে তখনই আমার তার কথা মনে পড়ে যায়।

আমরা তখন আমেরিকা সফর করছিলাম। মনে আছে যেদিন ওয়াশিংটনে আমাদের জানানো হল যে, আমাদের ভিয়েৎনাম যাবার ব্যবস্থাদি সব পাকা হয়ে গেছে, সেদিন সবচেয়ে খুশি হয়েছিল লে ভান বিয়া।

ছোটখাটো মানুষটি। ভিয়েৎনামীদের সাধারণত যেরকম পাকানো চেহারা হয় ঠিক সেরকম নয়। আমাদের দলে সে ছিল সবচেয়ে বেশী নীরব। একাকী। একটু যেন বিষন্ন। তবু সবচেয়ে বেশী প্রিয়।

জিজ্ঞেস করতাম, "আচ্ছা বিয়া, পারতে তুমি কখনো মুখ খোল না কেন বলতো?"

ও কিছু বলতো না। শুধু হাসত। অদ্ভুত বিষন্ন সে হাসি। পীড়াপীড়ি করলে বলত, "আমার ভালো লাগে না, দেশের কথা মনে পড়ে যায়।"

সেই বিয়াই এখন সবচেয়ে মুখর হয়ে উঠল। সকলের কাছে এসে এসে বলতে লাগল, "আমার দেশে যাচ্ছ, দেখবে কী সুন্দর দেশ।" বলেই সে কি হাসি। সেই হাসির মাঝখানেই হঠাৎ গেয়ে উঠছিল। দেখলাম, সে উত্তেজনায় কাঁপছে।

"আমেরিকায় কী আছে?" সে বলত। "চল ভিয়েৎনামে, দেখবে কত গাছপালা, নদী, পাহাড়, বন-উপবন, সমুদ্র। চোখ

ফেরাতে পারবে না। আর যদি দালাতে যাও···।" বলতে বলতে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। "দালাতে গেলে তোমার আর আসতেই ইচ্ছে করবে না। সে-রকম সমুদ্রতট তুমি দেখোনি, সে-রকম পাহাড়ও না। সেখানে আমার একটা চিকেন ফার্ম আছে, সেখানে তোমাদের নিয়ে যাব।"

পরের দিন সকালে হোটেলের লাউঞ্জে নেমে দেখি বিয়া এক-গাদা কাগজপত্র নিয়ে বসে আছে। কোত্থেকে জোগাড় করে এনেছে ভিয়েৎনামের ছবি, বই, ম্যাগাজিন, ডায়েরী। নিজের নাম লিখে লিখে সেগুলি আমাদের উপহার দিল।

একদিন শুনি সে আমাদের সংবর্ধনার আয়োজন করেছে। ওয়াশিংটনে দক্ষিণ ভিয়েৎনামী দূতাবাসে যে ভিয়েৎনামী মেয়েরা কাজ করে তাদেরই একজনের বাড়িতে। মেয়েটিকে সে আগে কখনও দেখেনি, কিন্তু তাতে কি। "তোমরা ভিয়েৎনামে যাচ্ছ, তোমাদের জন্য সবকিছু করতে পারি।"

যেদিন আমেরিকা ছাড়ব সেদিন সকাল থেকে বিয়ার কোনো খোঁজ নেই। সে কোনদিন একা একা কোথাও যেত না। অবসরের সময়টা হোটেলের ঘরে বসে দেশে চিঠি লিখতেই সে ভালবাসত। কাজেই হঠাৎ অনেকক্ষণ তাকে অনুপস্থিত দেখে আমরা একটু চিন্তিতই হয়ে পড়েছিলাম। কিছু পরেই গাড়ি আসবে আমাদের লস এঞ্জেলেস এয়ারপোর্টে নিয়ে যেতে। সেখান থেকে সান ফ্রান্সিসকো গিয়ে আমাদের ভিয়েৎনামের প্লেন ধরতে হবে।

গাড়ি যথাসময়েই হাজির এবং আমরা যে-যার মালপত্র গাড়িতে তুলে দিয়ে হাত-পা ঝেড়ে অপেক্ষা করছি। ড্রাইভার সমানে তাগাদা দিচ্ছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে রওনা হতে না পারলে প্লেন ধরাই যাবে না।

কিন্তু বিয়া একেবারে বে-পাত্তা।

উৎকণ্ঠার একেবারে শেষ সীমায় যখন আমরা উপস্থিত হয়েছি এবং ভাবছি আজকের মতো প্লেনের আশা বুঝি আমাদের ছাড়তেই হবে, তখন দেখি ছু'হাতে ছুটো প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বিয়া আসছে।

"কী ব্যাপার?" আমরা সবাই প্রায় একই সঙ্গে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।

"কোথায় ছিলে?"

বিয়ার মুখে সেই হাসি। হাসি ছাড়া ও কি আর কিছু জানে না?

সেই হাসি এবং কয়েকটি ছুর্বোধ্য ইংরিজি শব্দ থেকে বুঝলাম, সে এই দ্বাদশ মুহূর্তে কিছু কেনা-কাটা করতে গিয়েছিল। আর সুযোগ পাবে না; তাই যা ছিল সব খরচা করে বাজার করে নিয়ে এসেছে।

"হাতের টাকাগুলো এভাবে খরচা না করলেই হত না? এগুলো দেশে নিয়ে গেলেই তো পারতে?" আমি বললাম।

"পাগল হয়েছ?" সে বলেছিল। "আমার দেশের অবস্থা তুমি জানো না। এ টাকা নিয়ে গেলে তার বিনিময়ে যেটুকু পিয়াস্ত্রা (ভিয়েৎনামী মুদ্রা) পাবো তা কিছুই নয়। তার চাইতে এই ভালো হ'ল। জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যাচ্ছি, ওরা খুশি হবে।"

ওরা অর্থাৎ তার স্ত্রী ও ছুটি ছেলেমেয়ে। "তবে তোমাদের কথা আলাদা," একটু থেমে সে বলেছিল। "পিয়াস্ত্রার একটা কালোবাজারী দর আছে। সেটা সরকারী দরের দ্বিগুণেরও বেশী। আমেরিকানদের জন্যে এই দর রাখতে হয়েছে। যে-কোন বিদেশীর জন্যে। তোমরা সে সুযোগ ছাড়বে কেন?"

বিয়ার ওই একটি মন্তব্যের মধ্যে সেদিন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অসহায়তার রূপটি নিদারুণ স্পষ্টতার সঙ্গে আমার চোখের সামনে ধরা দিয়েছিল।

আমেরিকানদের জন্যে। হ্যাঁ, আমেরিকানদের জন্যেই তো!

সে বলেছিল, "ওই টাকায় আমার দেশে তোমরা কত কিছু কিনতে পারবে। দেখবে আমার দেশে জিনিসপত্র কত সস্তা।"

আমি পরে জেনেছিলাম, সে-ও আমেরিকানদেরই জন্যে। পিয়াস্ত্রার কালোবাজারী দরের তুলনায় জিনিসের দাম কেবল সস্তা নয়, একেবারে জল।

এবং সে বলেছিলঃ "হ্যাঁ, সব কিছুই সস্তা, কেবল···শান্তি ছাড়া।"

এটাও কি আমেরিকানদের জন্যেই নয়?

সেই বিয়া। এবং সেই ভিয়েৎনাম। আমরা এখন তার সাধের দেশের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সায়গনের তান সন নুট বিমানবন্দরে নামব।

সে তিন বছর আগেকার কথা।

সায়গন! ফরাসীরা বলত এই শহর হচ্ছে প্রাচ্য দুনিয়ার প্যারিস। স্থানীয় লোকেরা বলতে ভালোবাসে প্রাচ্যের মুক্তা।

কিন্তু সে কথা ভাববার মতো মনের অবকাশ আমার তখন ছিল না। তিন বছর আগের একটি রৌদ্র-দগ্ধ গ্রীষ্মের দিনে আমার বিমান যখন তান সন নুট বিমানবন্দরের ওপর এসে নিচে নামবার জন্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল তখন আমার কেবলই মনে হচ্ছিল আমি যেন কোন ঝড়ের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে যাচ্ছি।

সাধারণত বিমান নামবার আগে যে-রকমের পাঁয়তারা কষে এই ঘুরপাক ঠিক সেই রকমের ছিল না। আকাশে ছোট ছোট অলক্ষ্য বৃত্ত এঁকে অনেকটা সোজাসুজিভাবে নেমে আসছিল বিমানটি।

"ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ!" আমি যখন আমার আসনে খাড়া হয়ে বসে ভাবছিলাম কী ব্যাপার, তখনই জনৈকা বিমান-

সেবিকার গলা ভেসে এলো: "তান সন নুট আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দরের আশেপাশে ভিয়েৎকং গেরিলাদের আক্রমণের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, আর সেই জন্যেই সতর্কতার জন্যে আমাদের প্রায় সোজাসুজি নামতে হচ্ছে। আকাশে বেশি সময় থাকা নিরাপদ নয়।"

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। একটু যে ভয় ভয় করছিল না তা নয়। নিচে বিমানবন্দরের চারপাশে শান্ত স্নিগ্ধ বনাঞ্চল স্বপ্নের মতো বিছিয়ে ছিল। ওই জঙ্গলের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে গেরিলারা কে জানে? কখন তাদের বিমানধ্বংসী কামান গর্জে উঠবে কে বলতে পারে?

একটা হাঁসুলীর মতো বাঁক নিয়ে সায়গন নদী বিছিয়ে ছিল যেন একটা প্রকাণ্ড সরীসৃপ। সেই বাঁকের মুখেই সায়গন শহর, একটা সুন্দর, বাঁধানো, ছড়ানো, সাজানো গ্রামের মতো। তারই এক প্রান্তে, শহরের সীমা ছাড়িয়েই বুঝি হবে, আগে লক্ষ্য করিনি, এখন দেখলাম, একটা ছোটখাটো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে।

তারপর জঙ্গলের কার্পেট আর দাবার-ছক ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে দূরে তাকিয়ে দেখি একটা···দুটো···অন্ততঃ পাঁচ-ছটা জায়গায় ওই রকম ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।

"যুদ্ধের টাইটেল পেজ দেখে নাও," একজন আমাকে বলল।

"নিশ্চয় মার্কিন বোমারু বিমানের কীর্তি," আর-একজনের মন্তব্য।

"ভিয়েৎকংদের কামান হলেই বা ক্ষতি কী?" তৃতীয় একজন বললেন।

চোখকে উৎকণ্ঠিত এবং কানকে উৎকর্ণ করার মতো আরো কারণ ছিল। তান সন নুট বিমানবন্দর ঠিক সাধারণ বিমানবন্দরের মতো ছিল না। বিরাট এই বিমানবন্দর শুধু বিমানের বন্দরই নয়, বিমানের ঘাঁটিও। সর্বত্র রাইফেলধারী সামরিক পুলিশের আনা-

গোনা। জঙ্গী বিমানের গাদাগাদি। অগণিত হেলিকপ্টার ওঠা নামা করছে। সর্বত্র একটা ব্যস্ততা ও ত্রস্ততার ভাব। আমার মনে আছে ওই সব দেখে আমি ভাবছিলাম মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বুঝি সরাসরি যুদ্ধের খপ্পরে গিয়ে পড়ব।

কেন জানি না, প্লেনের দরজা থেকে চারদিকে তাকিয়ে তান সন নুট বিমানবন্দরকে আর ততটা ভয়াবহ মনে হয় নি। রাইফেল-ধারী পুলিশ আর স্কাইরেডার, স্কাইহক, স্ট্র্যাটো-ফরট্রেস, থাণ্ডার-চীফ, ডেল্টা ড্যাগার বিমানগুলিও হঠাৎ যেন চোখের সামনে থেকে কোথায় সরে গেল। একটা অগোছালো ভিড়ের মধ্যে আমি মিশে গেলাম। একটা যুদ্ধরত জাতির যে-চিত্র আমি মনে মনে কল্পনা করে রেখেছিলাম ওই ভিড়ের সঙ্গে তার বিরাট অমিল ছিল। দেখলাম চারদিকে সবাই ব্যস্ত, কিন্তু বিশৃঙ্খল-ভাবে ব্যস্ত। আমার ধারণা ছিল, বুঝি পদে পদে পরিচয়পত্র দেখিয়ে এগোতে হবে। তার কিছুই করতে হল না। ভেবেছিলাম কাস্টমসের চেকিং নিয়ে বুঝি খুব কড়াকড়ি করা হবে। আমার ব্যাগেজ কেউ খুলেও দেখল না। মিনিট পনেরোর মধ্যে আমি বিমানবন্দরের বাইরে। রাস্তায় লোকের ভিড় নিরুদ্বিগ্ন। জীর্ণ রেনো ট্যাক্সি আর পেডিক্যাবগুলি যাত্রীর অপেক্ষা করছে। আমার সামনে সায়গন।

সায়গন! ঝড়ের কেন্দ্র!

হ্যাঁ, ঝড়েরই কেন্দ্র। আমি আগে ভাবতেই পারি নি সায়গন সম্পর্কে এই উপমা এত চমৎকারভাবে খেটে যাবে। আমার মনে আছে আমি যে গাড়িতে করে শহরে গিয়েছিলাম তার জানালাগুলি ছিল মোটা মোটা তারের জাল দিয়ে আটকানো। এই সতর্কতা, আমাকে বলা হয়েছিল, ভিয়েৎকংদের অতর্কিত

আক্রমণের বিরুদ্ধে। ডাউনটাউন সায়গনে ট্র্যুয়ং কং দিন স্ট্রীটে হোটেল মাইলোয়ান নামে যে হোটেলে আমাকে তোলা হয়েছিল, দেখেছিলাম তার সামনে ছিল কাঁটাতারের বেড়া, দরজায় ছিল রাইফেলধারী প্রহরী। হোটেলের কাছেই ছিল সায়গনের রেল-স্টেশন, যেখান থেকে হ্যানয় পর্যন্ত একটি লাইন গিয়েছে। ওই লাইন অনেকদিন হল বন্ধ। তারই অদূরে সায়গনের একটি বড় থানা। তার সামনের ফুটপাত জুড়ে অনেকগুলি আলকাতরার ড্রাম ঠাসাঠাসি কিন্তু এলোমেলো করে সাজানো রয়েছে, যাতে কোনো লোক সহজে এবং তাড়াতাড়ি থানার মধ্যে ঢুকতে না পারে। কিন্তু এর বাইরে শহরের কোথাও কোনো অস্বাভাবিকত্ব দেখি নি। সব কিছুই ছিল শান্ত, অনুত্তেজিত; যেমন ঝটিকার কেন্দ্র শান্ত ও অনুত্তেজিত থাকে।

একথা বলার অর্থ এই নয় যে, কাঁটাতার কিংবা আলকাতরার ড্রাম কিংবা রাইফেলধারী প্রহরী আমি আর কোথাও দেখি নি। প্রায় দোতলা সমান উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দেখেছিলাম তুয়ং পাস্তর-এ ম্যাকভির (মিলিটারী অ্যাসিস্ট্যান্স কম্যাণ্ড, ভিয়েৎনাম) সদর ভবনের চারপাশে। নুয়েন উয়ে অ্যাভিনিউয়ে মার্কিন তথ্য-দপ্তরের সামনে কাঁচের বড় বড় জানালাগুলি ইঁট দিয়ে গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মার্কিন দূতাবাস তখন ছিল হাম নি অ্যাভিনিউতে। মাত্র মাসখানেক আগে গেরিলাদের বোমায় ভবনটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সতর্কতার জন্যে সেখানে অনেকখানি ফুটপাত ও রাস্তা আলকাতরার ড্রাম ও কাঠের বাফার দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। এবং আমি থাকতে থাকতেই একদিন জোর গুজব শুনলাম সায়গন নদীর ধারে বিখ্যাত টু ডো (আগেকার রু কাতিনাত) রাস্তার ওপর অবস্থিত খানদানী ম্যাজেস্টিক হোটেলের ওপর গেরিলারা চড়াও হবে। দেখতে দেখতে হোটেল প্রায় খালি।

এবং আরও কিছু কিছু দেখেছিলাম। মার্কিন মিলিটারী পুলিশের গাড়ি মাঝে মাঝে রাস্তায় আনাগোনা করছে। সায়গন বন্দরের প্রবেশপথে সান্ত্রীরা বন্দুক উঁচিয়ে চারদিকে লক্ষ্য রাখছে। বিয়েন হোয়ার রাস্তায় সৈন্যরা একটি ব্রীজ পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু তার বাইরে সায়গন শহরে যুদ্ধের চিহ্নমাত্র ছিল না। কারফিউ একটা ছিল বলে শুনেছি রাত একটা কি দুটোর পর থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত। সতর্কতার ব্যবস্থা হিসেবে তার মূল্য কিছুই নেই। আমার মনেই হয় নি আমি এমন একটি দেশের রাজধানীতে আছি যে-দেশ গত পঁচিশ ধরে প্রায় সমানে যুদ্ধ করে চলেছে।

রাস্তায় লোকের ভিড়ের সঙ্গে দেখতাম যেন রঙের বন্যা বইছে। রঙচঙা 'আও দাই' (গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা ও কোমর থেকে নিচের দিকে দুপাশে চেরা টিউনিক ধরণের পোশাক) পরা ভিয়েৎনামী মেয়েরা সায়গনের সেই চওড়া চওড়া গাছে-ঢাকা বুলেভার্ডগুলির চেহারাই দিত পাল্টে। ফুটপাথগুলি যেন এক-একটি মেলা। তারই মধ্যে খোলা রেস্তোরাঁয় দিন-ভর খাওয়া-দাওয়া চলছে। বিশেষ করে লে লোই, যেটা সায়গনের সবচেয়ে প্রধান রাজপথগুলির একটি, সেখানে ফুটপাথে চলবার উপায় ছিল না। ছিটকাপড়, রেডিমেড জামা থেকে আরম্ভ করে সান-গ্লাস, প্লাস্টিকের চিরুণী, মানিব্যাগ, পুরনো বই, স্যাণ্ডাল, বল পয়েন্ট প্রভৃতি হরেকরকম জিনিসের দোকানে ফুটপাথ ঠাসাঠাসি থাকত সব সময়। আর ছিল লোক আর লোক। চারদিকে শুধু লোকের মাথা গিজগিজ করছে। রাস্তায় উপচে পড়ছে। তারই মধ্যে পেডিক্যাব (সামনে-যাত্রীর-আসন-পেছনে-ড্রাইভার সাইকেল রিক্সা) ও ক্ষুদে রেনো ট্যাক্সিগুলি যে যার মতো ছোটাছুটি করছে। ট্র্যাফিকের নিয়মকানুনের কোনো বালাই নেই। কোথায় পুলিশ, কোথায় কি। সবসময় হুড়মুড় করে চলছে, যেন 'এক্ষুনি ঘাড়ের

ওপর এসে পড়বে। ঠিক টোকিওর 'কামিকাজে' ট্যাক্সি ড্রাইভারদের মতো।

আমার হোটেলের কাছেই সায়গনের সেন্ট্রাল মার্কেট। কলকাতার নিউ মার্কেটের মতো। জম-জমাট। দোকানে দোকানে জিনিস উপচে পড়ছে। দোকানি অধিকাংশই মহিলা এবং তরুণী। বাইরে ফুটপাথের স্টলে, শেয়ালদার হকার্স কর্ণারের মতো, মার্কিন ও ফরাসী জামার কাপড়, স্যুটের কাপড় বিক্রি হচ্ছে জলের দরে। পেছনে ফলের মণ্ডিতে থরে থরে ফল সাজানো : আপেল, আঙুর, কলা।

বেলা যতই পড়ে আসত, লোকের ভিড় বাড়ত তত বেশি। লোকেরা যেন কোন উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে। নুয়েন উয়ে অ্যাভিনিউতে বসত ফুলের হাট। এত জমকালো ফুলের বাজার আমি খুব কম দেখেছি। জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েদের দেখতাম তাদের সবচেয়ে ভালো সান্ধ্য পোশাকে সেজে ফুলের পসরা কিনে চলে যেত সায়গন নদীর ধারে যেখানে তাদের নিভৃত আলাপের কোন ব্যাঘাত ঘটত না।

তারপর সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার সঙ্গেই সায়গন যেন পাগল হয়ে উঠত। নাচ, গান আর হৈ-হুল্লোড়ে উৎসবের ধুম পড়ে যেত যেন। টু ডো'র বার-গুলি ভরে উঠত একে একে। কালমেত ষ্ট্রীটের বিখ্যাত ভান কান রেস্তোরাঁয় 'ফ্লোর শো' চলত পুরোদমে। ডাউনটাউন সায়গন যেন গান-বাজনার সমুদ্রে ভাসত। সায়গনের নৈশ জীবন এমনিতেই বিখ্যাত। তার ওপর মার্কিন সৈন্যদের কৃপায় তার জেল্লা এখন আরও বেড়েছে। আমার হোটেলের ঘরে শুয়ে ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে অনেক রাত পর্যন্ত আমি তার পরিচয় পেতাম। যেন দূর থেকে একটানা অস্পষ্ট ঢেউয়ের গর্জন ভেসে আসছে।

এমন কি আমেরিকানদের মধ্যেও যেন যুদ্ধের মেজাজ ছিল

না। তারা অবাধে, নিরস্ত্র হয়েই ঘুরে বেড়াত। আমার হোটেলটি ছিল মার্কিন সৈন্যদের একটি আস্তানা। তার ছ'তলার ঢাকা ছাদে ছিল একটি নাইট ক্লাব ও রেস্তোরাঁ। ওরা বলত নাইট ক্লাব ইন দি স্কাই। যে জি-আই'রা অন্য কোথাও যেত না তারা রাতের অধিকাংশ সময় কাটাতো সেখানেই, হোটেলের বিজ্ঞাপনের ভাষায় "নিরাপদে ও নিশ্চিন্ত আরামে"। সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত দেখা যেত ওরা হোটেলেরই কোন-না-কোন ভিয়েৎনামী মেয়ে-কর্মীকে বগলদাবা করে কফি ও টোস্টের শ্রাদ্ধ করছে। মার্কিন আর্মড্ ফোর্সেস রেডিওয় মেকং বদ্বীপের কোনো প্রত্যন্ত এলাকায় কিংবা সায়গনের উত্তরে লৌহ ত্রিভুজের জঙ্গলে যুদ্ধের বিবরণ আউড়ে চলেছে ভাষ্যকার। তারের জাল দিয়ে ঘেরা জানালা দিয়ে আমি দেখতাম আকাশে অন্ততঃ গোটা পঞ্চাশেক হেলিকপ্টার ভন ভন করে উড়ে বেড়াচ্ছে, আর অজস্র হ্যাণ্ড-বিলের বৃষ্টি ছড়িয়ে চলেছে। কিন্তু তাদের সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

টু ডো'তে একদিন ভর দুপুরবেলা দেখি একজন উন্মত্ত জি-আই একটি বার থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ধেই ধেই করে নাচছে।

কিন্তু তিন বছর আগে আমি শুধু সায়গন দেখি নি, শুধু কালো মেঘ দেখিনি, কালো মেঘে বিদ্যুতের ঝিলিকও দেখেছিলাম। সায়গনের বাইরে। শুকনো পাতাগুলি উড়ে যেতে আরম্ভ করেছিল। বুঝেছিলাম ঝড় আসছে।

সায়গন শহরের মধ্যে যদিও তখনই প্রায় ৮০০ সশস্ত্র ভিয়েৎকং ও অন্তত তিন হাজার স্বেচ্ছাসেবক ছিল, যদিও সায়গন-চোলোন ও নিকটবর্তী জিয়াদিন এলাকার জন্যে একটি বিশেষ প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছিল, এবং যদিও কয়েকজন জাপানী সাংবাদিক

আমাকে বলেছিল সায়গনের বহু দোকান ভিয়েৎকংদের নিয়মিত অর্থসাহায্য করে নিজেদের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখে, কিন্তু ভিয়েৎকংদের তৎপরতা তখন মূলত সীমাবদ্ধ ছিল দক্ষিণ ভিয়েৎনামের গ্রামাঞ্চলে ও সায়গনের আশেপাশে।

মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ নিজেরাই সেদিন স্বীকার করেছিলেন গেরিলাদের প্রচার-ব্যবস্থা, শৃঙ্খলাবোধ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও গতিশীলতা এক কথায় চমৎকার। সারা দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে ওরা পাঁচটি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করে ফেলেছে। সেখান থেকে প্রদেশ, জেলা, গ্রাম ও ক্ষুদ্রতম বসতি এলাকা পর্যন্ত তাদের কার্যকলাপ সুবিন্যস্তভাবে পরিচালিত। সেখানে সায়গনের প্রবেশ প্রায় ছিল না, যেটুকু ছিল তাও সীমাবদ্ধ। কারণ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অধিকাংশই ঘন গভীর দুর্ভেদ্য জঙ্গল। মার্কিন সৈন্যরা তো নয়ই দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সৈন্যরাও প্রচলিত যুদ্ধবিদ্যা ছাড়া আর কিছু জানত না বলে সেখানে ঢুকতে সাহস পেত না। ঢোকবার মতো মেজাজও তাদের ছিল না। এমন অনেক জায়গা ছিল যেখানে সায়গন-সরকারের পদার্পণ কস্মিন কালেও ঘটেনি। এখনো আছে। এবং পশ্চিমী বেসরকারী পর্যবেক্ষকদের প্রায় সকলেই একমত যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পঞ্চাশটি প্রাদেশিক রাজধানীর বাইরে সায়গনের কার্যকর প্রভাব কোনদিনই ছিল না।

সায়গন থেকে প্রায় ৭০ মাইল দক্ষিণে কিন হোয়া প্রদেশের ট্রুক-ইয়াংয়ে কাঁটাতার আর মাটির বাঙ্কার দিয়ে ঘেরা একটি সামরিক ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে একজন মার্কিন অফিসার কয়েক শ’ গজ দূরের একটা জঙ্গল দেখিয়ে আমাকে বলছিলেন: “ওটা ভিয়েৎকং এলাকা।”

জিজ্ঞেস করেছিলাম: “অর্থাৎ ভিয়েৎকংরা ওখানে ঘাঁটি করে বসে আছে?”

“না। ওরা রাত্রে আসে।”

"আর দিনের বেলা ?"

"দিনের বেলা ওটা সরকারের দখল।"

"তার প্রমাণ ?"

"তার প্রমাণ, আমরা ওর চারপাশে টহল দিয়ে বেড়াই এবং সে সময় কোনো ঘটনা ঘটে না।"

এ বড় আশ্চর্য জবাব, এবং সন্তুষ্ট হই নি বলেই আমি আবার উক্ত অফিসারকে প্রশ্ন করেছিলাম: "আপনারা যখন জানেন দিনের বেলা ভিয়েৎকংরা ওখানে থাকে না, তখন রাত্রেও যাতে ওরা না ঢুকতে পারে তার জন্যে কড়া পাহারা রাখেন না কেন ?"

মুখে হতাশার চিহ্ন টেনে তিনি বলেছিলেন: "পাহারা দিয়ে লাভ কি বলুন। ভিয়েৎকংদের তো পাব না, মিছিমিছি অনেকগুলো সৈন্য আটকে থাকবে। তাছাড়া জঙ্গল কি একটা ? কতগুলি জঙ্গল আপনি পাহারা দেবেন ? এত লোকই-বা কোথায় ? আর ভিয়েৎকংদের চিনবেনই বা কী করে ?"

ঠিক এই কথাই বলেছিলেন কিন হোয়া প্রদেশের কর্তা কর্নেল ট্রান-নক চাও'র একজন মার্কিন উপদেষ্টা: "আপনি হয়ত কোনো গ্রামের রাস্তা দিয়ে ফিরছেন। যদি কেউ আপনাকে আক্রমণ করে তবে বুঝবেন ওরা ভিয়েৎকং, যদি না করে তবে জানবেন ওরা বন্ধু।"

"এ ছাড়া জানবার কোনো উপায় নেই ?"

"কোনো উপায় নেই।"

শহর সায়গন ও তার উত্তরে বিন হোয়া এলাকাটিকে বলা হয় দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সবচেয়ে সুরক্ষিত এলাকা। কিন্তু কোনো ভিয়েৎকং যদি ব্যাগে বোমা পুরে কিংবা আর কোনভাবে অস্ত্র বা অস্ত্রের অংশ নিয়ে সায়গনে আসতে চায় তবে তাকে বাধা দেবার কোনো উপায় নেই। গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বোধ হয় সম্ভবও নয়।

আমরা একদিন বিন হোয়ায় একটা ছোট ব্রীজ পার হচ্ছিলাম। তাড়াতাড়ি যাতে কোন গাড়ি যেতে না পারে সেজন্য ব্রীজের রাস্তায় ইঁট দিয়ে এধার-ওধার কয়েকটা বাফার বানিয়ে রাখা হয়েছে। আমাদের গাড়ি ধীরে ধীরে এঁকে বেঁকে চলছিল। হঠাৎ দেখি ব্রীজের মুখে একটা বাঙ্কার থেকে একজন সৈন্য রাইফেল উঁচিয়ে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। কী ব্যাপার? আমরা কি কোথাও অনধিকার প্রবেশ করে ফেলেছি? ও হরি! আমাদের ভিয়েৎনামী ড্রাইভার আর সৈন্যটির মধ্যে কী কথা হল। পরে শুনলাম, আমাদের একজন কলা খেতে খেতে খোসাটা ব্রীজের ওপর ছুঁড়ে ফেলেছিল আর তাতেই প্রহরী-পুঙ্গবের আপত্তি।

এবং বলেছিলেন সায়গনের জনৈক মার্কিন মুখপাত্র। প্রশ্ন করেছিলাম, ভিয়েৎকং গেরিলাদের দমনের জন্য এই যে প্রতিদিন শত শত টন বোমা ফেলা হচ্ছে তাতে প্রকৃত কাজ হচ্ছে কতটুকু?

দু'হাত হতাশভাবে ছড়িয়ে দিয়ে, ঘাড়ে একটা মৃদু ঝাঁকুনি টেনে, মুখটাকে লম্বা করে তিনি বলেছিলেন: "কী করে বলি বলুন। যা গভীর জঙ্গল! বোমা পড়ল, উঁচু উঁচু গাছগুলো একটু সরে গিয়ে বোমাটা লুফে নিল। তারপর হয়ত একটি ধোঁয়া উঠল। ব্যস, আবার যে কে সেই। যেন কিছুই হয়নি। এই অবস্থায় কী করা যায় বলুন।"

না, কিছুই করার নেই, আমি স্বীকার করেছিলাম মনে মনে। সেই মুহূর্তেই আমার মনে হয়েছিল, এরা একটা প্রকাণ্ড মরীচিকার পেছনে উন্মত্তের মতো ছোটাছুটি করছে।

ট্রুক-ইয়াং থেকে সুন্দর পিচ-ঢালা রাস্তা চলে গিয়েছে নারকেল গাছের ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মেকং নদীর ধার পর্যন্ত। এত ঘন যে দিন-দুপুরেও গা ছমছম করে। ভিয়েৎকংরা দরকার হলে রাত্রে এসে এইসব জঙ্গলে আস্তানা নেয়। মাঝে মাঝে রাস্তার দু'পাশে সায়গন সরকারের 'সাইকোলজিক্যাল ওয়ারের' সাইনবোর্ড

চোখে পড়ছিল। একটি লোক আরেকজনের গলা টিপে ধরেছে আর তার নিচে লেখা রয়েছে: "ভিয়েৎকংদের হত্যা কর!"

আমি সঙ্গের একজনকে বলছিলাম: "ভিয়েৎকংদের স্পোর্টসম্যানশিপ আছে বটে, এই সাইনবোর্ডগুলি এখনও উপড়ে ফেলে নি।"

পরে বুঝেছিলাম উপড়ে ফেলার দরকার নেই। কারণ এই সাইনবোর্ডগুলি থাকল, কি থাকল না, তাতে গেরিলাদের কিছু এসে যায় না, মানুষগুলি তাদের সঙ্গেই আছে।

বিয়েন হোয়া এলাকার বুং একটা ছোটখাট গঞ্জের মতো। একদিন দুপুরে সেখানকার স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে চারদিকের কাজকর্ম লক্ষ্য করছিলাম। ছেলেমেয়েরা রাস্তায় খেলা করছে। দোকানে দোকানে ঝলমলে পোশাক-পরা মেয়েরা কেনাকাটায় ব্যস্ত। ফিরিওয়ালারা দোকান সাজিয়ে বসেছে, ফল, ফুল, আইসক্রীম, কোকাকোলার। কল কল করে কথা বলতে বলতে দলে দলে লোকেরা বাস থেকে নামছে কিংবা বাসে বোঝাই হচ্ছে।

হঠাৎ চারদিক কাঁপিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে পিচ-ঢালা রাস্তাটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে মেশিনগান উঁচিয়ে গোটা-চারেক সাঁজোয়া গাড়ি সাঁ সাঁ করে সেখান দিয়ে ছুটে গেল। শুনলাম, মাইল তিন-চার দূরে একটা জায়গায় ভিয়েৎকংরা আক্রমণ করছে। একটা জঙ্গলের মধ্যে গেরিলারা আশ্রয় নিয়েছে এবং সেখান থেকে একটি ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে এদিকে একটা দক্ষিণ ভিয়েৎনামী ঘাঁটির ওপর সমানে গুলি করে যাচ্ছে। ঘাঁটির অবস্থা যায়-যায়।

কিন্তু তাতে বুংয়ের কাজকর্মে কোনো বাধা পড়েনি। কয়েকটি উৎসুক ছেলেমেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল। বোঝা-কাঁধে এক বুড়ি একটু থেমে উৎকণ্ঠিত চোখ মেলে তাকালো। এধার-ওধার থেকে দু-চারটে মুখ উঁকি মারল কি মারল না। ব্যস! আবার সব চুপচাপ। যেন কিছুই ঘটে নি।

ভিয়েৎনামী সৈন্যদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের যে মধুর সম্পর্কের কথা জাহির করা হয়ে থাকে, তার আভাসটুকুও কোথাও পেলাম না।

বরং সৈন্যদের মেসিনগান সাধারণ মানুষগুলির দিকেই তাগ করা ছিল যেন। ভয়, যদি ওদের মধ্যেই কেউ গেরিলা হয়, যদি আচম্বিতে আক্রমণ করে বসে।

ভিয়েৎকংদের জোর এইখানে। তাদের সাফল্যের রহস্য এরই মধ্যে নিহিত।

।

একটা ছবির কথা মনে পড়ছে।

আমি ট্রুক-ইয়াংয়ে মেকংয়ের তীরে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের যেমন গঙ্গা, রাশিয়ার ভল্গা, চীনের ইয়াংসি, আমেরিকার মিসি-সিপি, ভিয়েৎনামের তেমনি মেকং। বিরাট নদী তার ঘোলা জলের সম্ভার নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে আমার পা ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। আমি শিহরিত হচ্ছিলাম। বাঁশ আর বেতের ঘন জঙ্গল জলের বুকে নুয়ে পড়েছিল। অলস বিকেলে দু-চারটে নৌকো মাঝদরিয়ায় গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। কলা আর নারকেল বোঝাই হয়ে যাচ্ছিল গঞ্জের ঘাটের দিকে। কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে আদুড় গায়ে একটা কাৎ-করা নৌকার গা ধরে জলের মধ্যে দাপাদাপি করছিল। চারদিকে একটা অখণ্ড, প্রশান্ত প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার চিত্র। কোথাও যেন বিন্দুমাত্র ছেদ পড়ে নি। এবং সেই প্রশান্তিকে গভীরতর করে দূরে মেকংয়ের বিস্তৃত বুকের একটা ছোট্ট দ্বীপের বৌদ্ধ-মন্দির থেকে বিক্ষিপ্ত ঘণ্টার ধ্বনি মাঝে মাঝে বাতাসে ভেসে আসছিল।

আর কিছু নয়। একটি চপল নদ, একটি বিবশ বিকেল, চারদিকে অখণ্ড নীরবতা, তারই মাঝে মাঝে চলমান জীবনের কয়েকটি আটপৌরে পদক্ষেপ। একটু অধীর হাওয়া, কয়েকটি অর্ধস্ফুট ঘণ্টার শব্দ, সব মিলিয়ে এমন একটা মায়াময় পরিবেশ

রচনা করেছিল যার নিজস্ব কোন গৌরব নেই, অথচ যা মনকে এক অনাবিল মাধুর্যে আবিষ্ট করে রাখে।

সেই স্বপ্নাবেশের মুহূর্তে আমার হঠাৎ মনে হল এই প্রশান্তির মধ্যেই বুঝি ভিয়েৎনামের বুকের আগুন লুকিয়ে রয়েছে। ঐ যে মাঝি মেকংয়ের উদার বুকে গা ভাসিয়ে দিয়ে ভাটিয়ালীতে গান ধরেছে, কিংবা যে লোকটি আমাকে চা দিয়ে গেল, কিংবা যে মেয়েটি বাঁশের বনে জ্বালানি কুড়োচ্ছে, কিংবা মোড়ের মাথায় যে সিগারেটের দোকান দিয়ে বসেছে, কিংবা যে রাখাল গোরু চরিয়ে বাড়ি ফিরছে, কিংবা যে শ্রমিক মাছ-পচানো **'সস'**-এর কারখানায় কাজ করছে, কে বলতে পারে সে গেরিলাদেরই একজন কি না?

সেই মুহূর্তে আমি আবিষ্কার করলাম গেরিলারা কোন আলাদা জীব নয়। তারা ভিয়েৎনামের জলের সঙ্গে, জঙ্গলের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে মিশে আছে। সেই মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করলাম গেরিলারা যারাই হোক, তাদের ঠেকানো সহজ নয়। তারা একদিন ঝড় তুলবেই।

দুই

বার, ব্রথেল, বুলেভার্ড

তিন বছর পর সায়গন এক নতুন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। আমার আগের দেখা সায়গনের সঙ্গে এই সায়গনের কোন মিল নেই।

৩১ জানুয়ারি ১৯৬৮—গেরিলারা যেদিন সারা দেশে আরও খান-ত্রিশেক শহরের সঙ্গে সায়গনে প্রথম প্রকাশ্য সর্বাত্মক আক্রমণ চালালো, ঝড় সেদিন ঝড়ের কেন্দ্রে প্রবেশ করেছিল।

সায়গন সেদিন জ্বলছে। তার আকাশকে আচ্ছন্ন করে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। রাস্তার উৎসব থেমে গিয়েছে কখন; চলছে হাতাহাতি লড়াই। হেলিকপ্টার নামছে। ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর শব্দে বাতাস উচ্চকিত। জি-আই'রা বেরিয়ে পড়েছে পাহারায়। নেহাৎ দায়ে না পড়লে সাধারণ লোকেরা কেউ আর রাস্তায় বেরোচ্ছে না। সায়গনেরই বিমান এসে কখন ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা ছিটিয়ে যাবে কে জানে।

এবং বিপর্যস্ত মার্কিনীরা, যারা রাস্তার লড়াইয়ে পেরে ওঠেনি গেরিলাদের সঙ্গে, তারা বোমা ছিটিয়ে যেত যখন তখন। রাস্তা ভরে উঠেছিল মৃতদেহে, পচে গলে বাতাস ভারী হয়েছিল দুর্গন্ধে। চোলোন বিধ্বস্ত হয়েছিল ব্যাপকভাবে।

কিন্তু তবু তারা গেরিলাদের হটাতে পারেনি। ওরা ছিল প্রায় দশ ব্যাটেলিয়ন ঝানু পদাতিক, ছত্রী ও নৌ সৈন্য, আর গেরিলারা বড় জোর শ'নয়েক। তবু গেরিলারাই ছিল সায়গনের প্রভু। এক রাতের মধ্যে তাঁরা আটটি থানা আক্রমণ করার পর দখল করে

নিয়েছিল ফু তো ঘোড়দৌড়ের মাঠখানি। মার্কিন দূতাবাসের কঠিন ব্যূহ ভেদ করে অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্যে দখল করে নিয়েছিল। এবং এক সময় দেখা গিয়েছিল সায়গনের ন'টি অঞ্চলের মধ্যে মাত্র তিনটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আছে, বাকিগুলি সব চলে গিয়েছিল গেরিলাদের হাতে।

ন্গুয়েন উয়ে অ্যাভিনিউতে ফুলের হাট এখনো কি সেই রকমই বসছে? সায়গনের বেতার কেন্দ্র পুড়ে প্রায় ছাই হয়ে গিয়েছিল। নতুন মার্কিন দূতাবাসের বাড়িতে গেরিলাদের সঙ্গে ঘরে ঘরে যুদ্ধ চলেছিল। বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল। গেরিলারা দরজায় দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলে যাচ্ছিলঃ "আমরা জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের লোক, আমরা সায়গনকে মুক্ত করতে এসেছি।" ভান কান রেস্তোরাঁয় গান-বাজনা বন্ধ। কন্টিনেন্টাল হোটেলের খোলা চত্বরে বসে সায়গনের চলমান জীবন দেখবার জন্যে আর কেউ অপেক্ষা করে ছিল না। শহর থেকে দলে দলে লোক চলে যেতে আরম্ভ করেছিল অন্যত্র। কড়া সান্ধ্য-আইনে শহরের নৈশ কণ্ঠ স্তব্ধ। যে প্যাগোডাগুলিতে তিন বছর আগেও নিরুপদ্রব পূজারতি চলেছে, সেগুলি বিপন্ন মানুষের আশ্রয় শিবিরে, অনেক ক্ষেত্রে গেরিলাদের ঘাঁটিতে পরিণত। তান সন ন্হুট বিমানবন্দরকে ঘিরে প্রচণ্ড লড়াই চলেছিল। মার্কিন সৈন্যদের থাকবার কয়েকটি বাড়ি আক্রান্ত হয়েছিল। "হায়!" জনৈক ভিয়েৎনামী ব্যবসায়ী আক্ষেপ করে বলে উঠেছিলেন, "শেষ পর্যন্ত সায়গনও নিরাপদ রইল না।"

যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত সায়গনকেও গ্রাস করেছিল। ভিয়েৎনামে এখন ঝড়ের কোন কেন্দ্র নেই। এ ঝড় এখন সর্বাত্মক।

সায়গনের প্রায় ৪০০ মাইল উত্তরে প্রাচীন আন্নামী রাজাদের রাজধানী উয়ে শহরে যুদ্ধ চলছিল আরো প্রচণ্ড। শহরের প্রায় সাড়ে তিন বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে প্রাচীন রাজারা বানিয়েছিল

তাদের দুর্গ। দেয়াল-ঘেরা সেই দুর্গ এলাকা দখল করে নিয়েছিল গেরিলারা। তার মাথার ওপর সগর্বে উড়ছিল ভিয়েৎকংদের লাল আর নীল রঙের পতাকা। উয়ে হাতছাড়া হয়েছিল মার্কিনী আর তাদের তাঁবেদারদের। আকাশ থেকে বোমা ফেলে আর মাটিতে বাড়ি বাড়ি প্রচণ্ড লড়াই করেও অনেকদিন পর্যন্ত শহরের দখল ফিরিয়ে নিতে পারেনি তারা।

ঠিক সেই সময়, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের উত্তর পশ্চিম কোণে খে সানে দ্বিতীয় দিয়েন বিয়েন ফু'র আয়োজন চলছিল। দুর্ভেদ্য করে বানানো ঐ ঘাঁটির চারপাশের পাহাড় একইভাবে দখল করে নিয়েছিল গেরিলারা, তারপর একইভাবে ট্রেঞ্চ কেটে কেটে চারদিক থেকে একটু একটু করে ক্রমেই এগিয়ে এসেছিল। যেন একটা ফাঁস এঁটে আসছিল ক্রমেই। ভারী বোমায়, নেপামে কার্পেটের মতো ছেয়ে ফেলা হয়েছিল আশেপাশের এলাকা, কিন্তু তবু গেরিলাদের অগ্রগতি রোধ করা যায়নি। খে সানের কয়েক মাইল পশ্চিমে লাং ভেই-য়ে মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের যে কংক্রীটের ঘাঁটি ছিল, এক রাত্রের আক্রমণে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে এই পরিবর্তন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ কোন্ পথে অগ্রসর হতে চলেছে।

ছোট্ট দেশ। সরু একফালি দেশ। এসিয়া মহাদেশের এক প্রান্তে দক্ষিণ-চীন সমুদ্র আর টংকিন উপসাগরের গা ঘেঁষে পড়ে আছে যেন একটা সূতো-ছেঁড়া ফুলের মালা; কিংবা ভিয়েৎনামী কৃষক-রমণীর হাতের কাস্তের মতো যেন, ফসল কাটা আরম্ভ হবার আগে একান্তে পড়ে আছে।

আয়তনে কতকুটুই বা হবে। যদি দক্ষিণ-ভিয়েৎনামকে আলাদা করে দেখা হয় তাহলে আমাদের ওড়িশা রাজ্যের চাইতে কিছু

বড় কিন্তু বিহার রাজ্যের চাইতে ছোট। যদি উত্তর-ভিয়েৎনামের সঙ্গে একত্রে ধরা হয় তাহলেও রাজস্থানের সমান হবে না।

একদিকে সমুদ্র আমি আগেই বলেছি। আর একদিকে পাহাড়—আন্নামী পর্বতমালা। উত্তর থেকে দক্ষিণে একটা বিরাট দেওয়ালের মতো মাঝখানের সমতলভূমিকে রক্ষা করছে। কোথাও কোথাও পাহাড়ের চূড়া আপন মুখ দেখছে সাগরের জলে।

আর আছে জঙ্গল। ঘন, গভীর, দুর্ভেদ্য জঙ্গল। উত্তরে যেখানে পাহাড় নেই খুব বেশি, সেখানে আছে একশ ফিট কি তারও বেশি উঁচু চিরহরিৎ গাছের জঙ্গল যা পাতার সামিয়ানা খাটিয়ে নিচের মাটিকে আকাশের দৃষ্টি থেকে একেবারে আড়াল করে রেখেছে এবং যা অঝোর ধারায় বৃষ্টি টেনে আনে। দক্ষিণে যেখানে সমতল-ভূমি জলায় পরিণত সেখানে আছে গরান, নারকেল, বাঁশ আর মানুষ সমান উঁচু ঘাসের জঙ্গল যার ভেতর দিয়েও বছরের অধিকাংশ সময় যাতায়াত দুঃসাধ্য। যেখানে ধানের ক্ষেত, সেখানে এক হাঁটুরও ওপর কাদা। যখন জল থাকে তখন বুক পর্যন্ত অনায়াসে ডুবে যায়।

ঐ জঙ্গলের মাঝে মাঝে আছে গ্রাম। ছোট্ট, সুন্দর, কলা আর পেঁপে গাছের সারি দিয়ে ঘেরা এক-একটি গ্রাম। আঁকা-বাঁকা ধূলি-ধূসরিত বলীরেখাঙ্কিত মেঠো রাস্তা। ধারে ধারে কঞ্চির বেড়া, কিংবা রাঙচিতার। ছোট ছোট ধানের ক্ষেত। কিংবা সব্জীর ক্ষেত। নীল রঙের টিউনিক পরে টোকা মাথায় মেয়েরা কাজ করছে। কয়েকটা দোকান। খাল কিংবা পুকুর। আদুড় গায়ে ছেলেমেয়েরা মাখামাখি করছে ধূলায় কিংবা ঝাঁপাঝাঁপি করছে জলে। শান্ত পরিবেশ। চিরন্তন।

এবং আছে নদী। সং কা—যাকে বাইরের দুনিয়া রেড রিভার বলে জানে—আছে উত্তরে। দক্ষিণে আছে মেকং, সায়গন, বাসাক, ডংনাই আর উয়ে, যার অপর নাম সুগন্ধি নদী। বড় বড় পালের

নৌকা ভাসে সেই সব নদীতে। দাঁড়ি-মাঝি গান গাইতে গাইতে জিনিসপত্র নিয়ে যায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। আছে অসংখ্য খাল, বিল, নালা যা দেশটার ওপর জালের মতো বিছিয়ে রয়েছে। প্রায় আড়াই হাজার মাইল খাল আছে একমাত্র মেকংয়ের বদ্বীপ এলাকাতেই। বর্ষা আসে। বর্ষাই ভিয়েৎনামের প্রধান ঋতু, মে মাসে আরম্ভ হয়ে নভেম্বর পর্যন্ত চলে। বৃষ্টি পড়ে অঝোর ধারায়, প্রবল বেগে। ঐ জলে খাল, বিল, নালা ভরে ওঠে, ফুলে ওঠে মেকং, সায়গন, বাসাক, ডংনাই আর উয়ের বুক, রাস্তা-ঘাট, গ্রাম-গ্রামান্তর দেয় ভাসিয়ে, পলির আস্তরণে ঢেকে দেয় মাটির শরীর।

জল, জঙ্গল আর পাহাড় নিয়ে এই যে দেশ যা চীনের সীমান্ত থেকে শ্যাম উপসাগর পর্যন্ত এক হাজার মাইল সমুদ্রোপকূল বেষ্টন করে রয়েছে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে যার সর্বোচ্চ বিস্তার ৩৫০ মাইল আর সবচেয়ে কম ৪০ মাইল, সেখানে থাকে সুন্দর, মিষ্টি, বন্ধুত্ব-পরায়ণ, কর্মঠ একটি জাতি।

সংখ্যায় এরা মাত্র ৩ কোটি ১০ লক্ষের মতো, দেড় কোটি দক্ষিণ-ভিয়েৎনামে, ১ কোটি ৬০ লক্ষ উত্তরে।

এরা শান্ত, নম্র, নির্বিবাদী মানুষ। এরা কাজ করে ধানের ক্ষেতে—ভিয়েৎনাম একসময় ছিল এসিয়ার অন্যতম শস্যভাণ্ডার—কিংবা রবার, চা আর কফির বাগিচায়। মাছ ধরে, গোরু-বাছুর চরায়, মাটির ভিতের ওপর বাঁশ আর খড় দিয়ে ঘর বাঁধে, সাপের মাংসের স্যুপ দিয়ে ভাতের মণ্ড মেখে খায়। মাত্র ১০ শতাংশ লোক থাকে শহরাঞ্চলে যেখানে মেয়েরা রঙ-চঙা আও-দাই পরে প্রচুর সংখ্যায় অফিসে কাজ করে কিংবা হাট-বাজারে দোকান চালায়।

এদের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে ১২ হাজার ৩৫০টি প্রাথমিক স্কুলে, ৩৮৫টি মাধ্যমিক স্কুলে, ১৭টি কলেজে, ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এদের শিক্ষিতের হার ৯৫ শতাংশ। এই উঁচু হার এরা অর্জন করেছে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার দ্বারা। ভিয়েৎমিনরা তাদের মুক্ত অঞ্চলে চালু করেছিল গণ-বিদ্যালয়। এমন কি দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রাক্তন ডিক্টেটর নো দিন জিয়েমও বয়স্ক শিক্ষার ক্লাস চালু করেছিলেন, নির্দেশ দিয়েছিলেন কোন বয়স্ক ব্যক্তি অশিক্ষিত থাকলে তাকে হত্যা করা হবে।

ধর্ম এদের জীবনকে সত্যিই ধরে রেখেছে। দিয়েছে বিনয়, শিখিয়েছে কষ্টকে অস্বীকার করতে, লক্ষ্যে একনিষ্ঠ থাকতে, আদর্শের জন্যে প্রাণ দিতে। এদের সহ্যের ক্ষমতার অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে আছে এদের ইতিহাসের পাতায় পাতায়। এরা বৌদ্ধ, তাওবাদ ও কনফুসীয়বাদের সঙ্গে যা মিশ্রিত। এরা পূর্বপুরুষের পূজা করে। এদের বাড়িই এক-একটি মন্দির। সেখানে বেদী আছে, বেদীর ওপর দেবতা আছেন। সেখানে তারা প্রতিদিন তাদের পূজা নিবেদন করে। কখনো কখনো যায় প্যাগোডায়, নীরব উপাসনায় ধূপ জ্বেলে দেয়। কিংবা যায় কাও দাই সম্প্রদায়ের মন্দিরে যেখানে বৌদ্ধধর্ম, কনফুসীয়বাদ, তাওবাদ ও খৃষ্টধর্ম একত্রিত হয়েছে। কাও দাইরা সংখ্যায় হবে প্রায় কুড়ি লক্ষ। আরেকটি নব্য-বৌদ্ধসম্প্রদায় হল হোয়া হাও। এদের শিষ্য সংখ্যা প্রায় পনেরো লক্ষ। আর আছে কুড়ি লক্ষের মত খৃস্টান, রোম্যান-ক্যাথলিক।

এই যে শান্ত, ধর্মভীরু মানুষগুলি, এবং এই যে জল ও জঙ্গলের একফালি দেশ, তার বুকের ভেতর আজ আগুন জ্বলছে। কোন্ পূজার প্রদীপ জ্বলছে এই আগুনে? কোন্ যজ্ঞের সাধনা চলছে এর শিখায়? তার উত্তর লেখা নেই কোন বইয়ে। ব্যাখ্যা নেই কোন ধর্মশাস্ত্রে। তার ইতিহাস শুধু লেখা হয়ে চলেছে পাহাড়ের চূড়ায় আর জঙ্গলের গভীরে, শহরে আর গ্রামে যেখানে রক্ত আর চোখের জল ঝরছে গত পঁচিশ বছর ধরে প্রতিদিন।

এই ইতিহাস পাঠ করে আমরা রোমাঞ্চিত হব, কিন্তু বিস্মিত হব না। কারণ এই ইতিহাস কেবল গত পঁচিশ বছরে গড়ে ওঠে নি। এই ইতিহাস ভিয়েৎনামী জাতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে। অন্তত আরো এক হাজার বছরের প্রস্তুতি এই ইতিহাসের রাজপথ তৈরি করে দিয়েছে। এই হাজার বছরের সংগ্রামের ঐতিহ্যই ভিয়েৎনামীদের আজকের এই বিপুল প্রতিরোধের পেছনে এতখানি শক্তি জুগিয়েছে।

"আমরা হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করেছি", ভিয়েৎনামীরা গর্ব করে বলে থাকে। "দরকার হলে আমরা আরো হাজার হাজার বছর যুদ্ধ করব।"

ভিয়েৎনামীদের এই এক হাজার বছরের ইতিহাস বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন লড়াইয়ের ইতিহাস। বিদেশী দাসত্ব ও প্রভুত্বকে অস্বীকার করার প্রবণতা যেন ভিয়েৎনামীদের রক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে।

ভিয়েৎনাম তখন ছিল চীনের শাসনাধীনে। চীনারা এর নাম দিয়েছিল আন নাম, অর্থাৎ দমিত দক্ষিণ। 'ভিয়েৎনাম' এই নামটি সরকারীভাবে গ্রহণ করা হয় মাত্র ১৮০২ সালে, যখন সম্রাট জিয়া লং ছিলেন শাসনের গদিতে। ভিয়েৎনাম, অর্থাৎ দূর-দক্ষিণ, ছিল চীনা ইউয়ে-নান শব্দেরই ভিয়েৎনামী প্রতিশব্দ। ইউয়ে-নান বলতে বোঝাতো 'ইউয়ের (বর্তমান কোয়াং টুং প্রদেশের প্রাচীন নাম) দক্ষিণ'।

মান্দারিন ধরণের সমাজব্যবস্থা আর কনফুসীয় নীতিশাস্ত্র ঐ সময়েই ভিয়েৎনামে আমদানী হয়। তার প্রভাব এক সময় ভিয়েৎনামী বুদ্ধিজীবী মহলকে খুবই আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল এবং তার কিছুটা আজও অবশিষ্ট আছে। কিন্তু একদিকে যখন এই চীনীকরণ চলছিল, অন্যদিকে চীনের শাসনকে উৎখাত করার জন্যে চেষ্টাও চলেছিল ক্রমাগত। যদিও চীনাদের সঙ্গে ভিয়েৎনামীদের

অনেক বিষয়েই মিল ছিল, তবু তাদের শাসন বিদেশী শাসন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এবং কোনরকম বিদেশী শাসন বরদাস্ত করা ভিয়েৎনামীদের চরিত্রের বিরোধী।

সায়গন নদীর তীরে, সেখানকার নৌ-ঘাঁটির কাছাকাছি বহু বছর ধরে দুটি যুগল মূর্তি শোভা পেত। ট্রুং বোনেদের মূর্তি।

ট্রুং ট্রাক ও ট্রুং নি।

ফরাসীদের যেমন যোয়ান অব আর্ক, ভিয়েৎনামীদের কাছে ট্রুং বোনেরাও তেমনি। মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে ভিয়েৎনামের প্রথম প্রকাশ্য বিদ্রোহের বীরাঙ্গনা ওরা। সে ৩৯ খৃষ্টাব্দের কথা। হানাদার শাসকেরা তাদের একজনের স্বামীকে অকারণে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে ওরা যোগাড় করেছিল একদল সৈন্য। শক্তি তাঁদের ছিল সামান্য, অস্ত্রবল ছিল না বিশেষ কিছু। কিন্তু তাই নিয়েই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দুঃশাসন মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে।

দু'জন মহিলার, দু'টি বোনের এই প্রতিরোধ চীনা পরাক্রমের কাছে স্বভাবতই টিকতে পারে নি। বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে ট্রুং বোনেরা উত্তর ভিয়েৎনামের ডে নদীর জলে আত্মবিসর্জন করেছিল।

কিন্তু তাদের সেদিনের ঐ ক্ষুদ্র প্রতিরোধ আজও ভিয়েৎনামীদের মনে এক বিরাট অনুপ্রেরণা হয়ে জেগে রয়েছে। ঐ যুগল মূর্তির একটি অংশ ১৯৬১ সালের নভেম্বরে নো দিন জিয়েমের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ-বিক্ষোভের সময় জনসাধারণ ভেঙে ফেলেছিল। কারণ ঐ মূর্তিটি গড়া হয়েছিল জিয়েমের ভাই-বৌ মাদাম নুর আদলে। কিন্তু ট্রুং বোনেদের স্মৃতি ভিয়েৎনামের স্বাধীনতার সংগ্রামে অলক্ষ্য প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে।

৯৩৯ সালে, চীনে যখন তাং যুগের অবসানের পর অরাজক অবস্থা চলেছে, ভিয়েৎনামীরা চীনের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব উৎখাত করতে

সক্ষম হয়। কিন্তু পরোক্ষ প্রভাব তখনও ছিল এবং মাঝে মাঝেই চীনারা হামলা চালিয়ে তাদের প্রভুত্ব পুনরায় কায়েম করার চেষ্টা করছিল। এক সময় তারা হ্যানয় শহরটি আবার দখল করে নিতে সমর্থ হয়েছিল।

এইভাবে চলেছিল প্রায় ৫০০ বছর। ১৪২৭ সালে যোদ্ধা-সম্রাট লে লোই চীনাদের হাত থেকে হ্যানয় পুনরুদ্ধার করেন এবং লে গোষ্ঠির পত্তন করে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন। এই সাম্রাজ্যের পত্তন যদিও তিনি করেছিলেন চীনকে তিন বছর পর পর প্রচুর উপঢৌকন পাঠানোর বিনিময়ে, তবু ভিয়েৎনামে চীনের কার্যকর শাসনের অবসান বলা যায় তাঁর সময় থেকেই ঘটে।

ভিয়েৎনামী ইতিহাসের এই অধ্যায়টুকুর উল্লেখ করা আমি প্রয়োজন মনে করি শুধু এইটে প্রমাণ করবার জন্যে যে, ভিয়েৎনামীরা ঘটনাচক্রে সময় সময় বিদেশী শাসন সহ্য করতে বাধ্য হলেও ঐ শাসনকে তারা কখনই মেনে নিতে পারে নি। ভিয়েৎনামীদের এই অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহার আরো প্রমাণ, তাদের বাগে আনবার জন্যে চীনাদের এক হাজার বছরে অন্তত ১৫ বার ভিয়েৎনামে অভিযান চালাতে হয়েছিল।

এই অন্তর্নিহিত স্বাধীনতা স্পৃহাই আরো জোরদার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল পরবর্তীকালে ফরাসীদের বিরুদ্ধে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই ভিয়েৎনামে ফরাসীদের আনাগোনা আরম্ভ হয়। এবং আরম্ভ হয় যথারীতি মিশনারীদের দিয়েই। নানারকম প্রলোভন দিয়ে ঐ মিশনারীরা বহু লোককে ধর্মান্তরিত করল। যে মিশন কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হল ক্রমে সেগুলি নিজেদের ক্ষমতার পরিধি বিস্তারের দিকে মন দিল। মিশনারীরা নিজেরা প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়ে উঠলেন। স্বভাবতই মিশনারীদের কার্যকলাপ ভিয়েৎনামী কর্তৃপক্ষের পক্ষে সহ্য করা দুরূহ হয়ে দাঁড়াল।

১৮৩৩ সালে সম্রাট মিং মাং এক হুকুমনামা জারি করে জনসাধারণকে এই বলে সাবধান করে দেন যে, যাঁরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন তাঁদের অপরাধের একমাত্র শাস্তি হবে মৃত্যু। "যীশুর ধর্ম আমাদের সর্বাত্মক ঘৃণার পাত্র," তিনি বললেন। "এই ধর্মের উপাসনা-গৃহ এবং যাজকদের বাড়িগুলি ভেঙে ধূলায় গুঁড়িয়ে দিতে হবে। আর মিশনারীদের গলায় পাথর বেঁধে নদীর জলে ডুবিয়ে মারতে হবে।" এই ফতোয়ার পর মিশনারীদের বিরুদ্ধে যে অভিযান শুরু হয় তা প্রবলতর আকার ধারণ করে পরবর্তী সম্রাট থিউ ত্রি'র আমলে। তারপর সম্রাট তু ডুকের সময় এই নিয়ে ফরাসীদের সঙ্গে গুরুতর মনোমালিন্য দেখা দেয়।

সম্রাট তু ডুক ভিয়েৎনাম থেকে শুধু ফরাসী নয় সমস্ত বিদেশী মিশনারীকেই নিশ্চিহ্ন করবার সঙ্কল্প করেন। এই সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করতে গিয়ে যখন বহু সংখ্যায় ফরাসী ও স্পেনীয় মিশনারীরা নিহত হল, তখন সেই অজুহাতে ১৮৫৮-৫৯ সালে একটি যুক্ত ফরাসী-স্পেনীয় বাহিনী দা নাং আক্রমণ করে, তারপর দক্ষিণ মুখে অভিযান চালিয়ে সায়গন দখল করে। সেখান থেকে আবার অভিযান চালিয়ে ফরাসীরা পার্শ্ববর্তী তিনটি প্রদেশ দখল করে নেয়।

ভিয়েৎনামে ফরাসী শাসন প্রতিষ্ঠার এই হল সূত্রপাত। এই সুসজ্জিত হানাদারদের বিরুদ্ধে তু ডুকের বিশেষ কিছু করবার ছিল না। ১৮৬২ সালে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে তিনি ফরাসীদের এই সাফল্য স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন। ১৮৮৩ সালে ফরাসীরা হ্যানয় ও হাইফং দখল করে নিয়ে ভিয়েৎনামে তাদের প্রতিষ্ঠা পুরোপুরি কায়েম করল। উয়ের রাজদরবার (উয়েই ছিল তখন ভিয়েৎনামের রাজধানী) উত্তরে টংকিন, মধ্যে আন্নাম আর দক্ষিণে কোচিন চীন, অর্থাৎ সারা ভিয়েৎনামের ওপরেই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নিল ফরাসী আধিপত্যের কথা।

একবার কায়েম হয়ে বসবার পর ফরাসীরা মিশনারীদের বিরুদ্ধে ভিয়েৎনামী রাজাদের অভিযানের শোধ নিয়েছিল নিজেদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে। সেই সঙ্গে চলল লুণ্ঠন। ভিয়েৎনামী কৃষক-শ্রমিকের পরিশ্রমের ফসল নিয়ে ওরা প্রাসাদ তুলল রিভিয়েরায়। এই কাজে ওরা সাহায্য নিত ক্যাথলিকদের। দেশের অধিকাংশ মানুষকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করে ওরা চাকরী-বাকরী, কাজ-কর্ম যা কিছু সব রেখে দিল মুষ্টিমেয় ক্যাথলিকদের জন্যে। বলা হয়ে থাকে, ক্যাথলিকদের সাহায্য না পেলে ভিয়েৎনামের বুকে ফরাসী কাঁকড়ার দাঁত বসানো সম্ভব হত না।

বার, ব্রথেল আর বুলেভার্ড, এই তিন 'বি' নিয়ে ফরাসীরা এসেছিল ভিয়েৎনামে। এই তিন 'বি' নিয়েই তাদের ঔপনিবেশিক সভ্যতা। ঐ সভ্যতা নিয়ে তারা ভিয়েৎনামের ভূগোলকেই দখল করতে পেরেছিল, সেখানকার মানুষগুলির মনের দখল নিতে পারে নি।

দেশের স্থানে স্থানে ফরাসীদের বিরুদ্ধে গেরিলা ধরণের লড়াই চলতে থাকে। উত্তর টংকিনের পাহাড়ে আর জঙ্গলের যেখান থেকে হো চি মিন পরবর্তী কালে তাঁর যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, সেখানে সেদিনও গেরিলারা ছিল সক্রিয়। মাও সে-তুংয়ের চীন হয়ত গেরিলা যুদ্ধের রীতি-নীতিকে একটা চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিল, কিন্তু গেরিলা যুদ্ধ ভিয়েৎনামে আবিষ্কৃত হয়েছিল অনেক আগেই, জনসাধারণেরই নিজেদের ভেতর থেকে। হয়ত ঐ লড়াই তখনও সংঘবদ্ধ ছিল না; প্রতিবাদের কণ্ঠও হয়ত ছিল না সোচ্চার। কিন্তু এটা অন্তত এ-থেকে প্রমাণিত যে, ভিয়েৎনামীরা ফরাসী শাসনের একেবারে গোড়া থেকেই এই শাসনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

ঐ সময় প্রতিরোধের নেতৃত্ব নেন রাজদরবার ও উচ্চপদস্থ

মান্দারিন মহল। কিন্তু ফরাসীদের অনুপ্রবেশের ফলে ভিয়েৎনামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা যতই ভেঙ্গে যেতে লাগল, ফরাসীদের অত্যাচারের মাত্রা যতই বেড়ে যেতে লাগল, বহুদিনের প্রচেষ্টায় গড়ে-তোলা ভিয়েৎনামের অপূর্ব শিক্ষা-ব্যবস্থার (যে ব্যবস্থায় ভিয়েৎনামের প্রায় প্রতিটি গ্রামে ছিল একাধিক প্রাইভেট স্কুল এবং আগেই বলেছি শতকরা ২৫ জন ছিল শিক্ষিত) সমাধি ঘটতে লাগল, ততই একদল অপেক্ষাকৃত তরুণ বুদ্ধিজীবী, যাঁরা পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পশ্চিমী ঔপনিবেশিকতার চরিত্র ও প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, ক্রমশ ফরাসী-বিরোধী আন্দোলনের সামনের সারিতে এসে দাঁড়াতে আরম্ভ করলেন।

"ফরাসী শাসনের আশীর্বাদে সাধারণভাবে আন্নামীরা পিষ্ট হচ্ছে," ১৯২৪ সালে ভিয়েৎনামের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন হো চি মিন। "আন্নামী কৃষকদের দুর্দশা আরো শোচনীয়। আন্নামী হিসাবে তারা নিপীড়িত, কৃষক হিসেবে তারা লুণ্ঠিত, শোষিত ও বিপর্যস্ত। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে এরাই। একদল পরগাছার জন্যে এরাই উৎপাদন করে খাদ্য। অথচ এরাই থাকে দারিদ্র্যে আর এদের হত্যাকারীরা বাস করে প্রাচুর্যের মধ্যে। যখন ফসল কম বা নষ্ট হয় তখন মরে যাওয়া ছাড়া এদের আর গত্যন্তর নেই। আগেকার কালে, আন্নামী শাসনের সময়, চাষের জমি উর্বরতা অনুযায়ী কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা ছিল। এই শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ীই কর ধার্য করা হত। বর্তমান ঔপনিবেশিক শাসনে এসবই বদলে গেছে। কলমের এক খোঁচায় তাঁরা অনুর্বর নিকৃষ্ট জমিকে উর্বর জমিতে পরিণত করেছেন, আর সেই অনুযায়ী কৃষককে বেশি কর দিতে বাধ্য করা হচ্ছে।"

এই শোষণ ভিয়েৎনামীদের মধ্যে যে প্রবল ঘৃণার সঞ্চার করেছিল তা ভাষা পেয়েছিল হো চি মিনের পরের কথাগুলির

মধ্যে। তিনি লিখেছিলেন: "গণতন্ত্রের মুখোসের আড়ালে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা আন্নামে এক ঘৃণিত মধ্যযুগীয় শাসন প্রবর্তন করেছেন। এমন কি লবণের ওপর কর বসাতেও তাঁরা দ্বিধা করেন নি। পুঁজিবাদী সভ্যতার বেয়োনেটের ডগায় আর খৃষ্টধর্মের বেশ্যাবৃত্তির ক্রুশের কাঠে আন্নামী কৃষককে হত্যা করা হচ্ছে।"

ক্রমে যে প্রতিরোধ ছিল মূলত রাজশক্তি পুনরুদ্ধারের আন্দোলন তা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ নিতে লাগল। কিছু সংখ্যক মধ্যপন্থী তখনও ছিলেন যাঁরা ফরাসীদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ফরাসীরা ঐ সহযোগিতার হাত যখন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল তখন হিংসার পথে পা বাড়ানো ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না।

ঐ সময়, অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে, দক্ষিণ-চীনের ক্যান্টনে ভিয়েৎনাম কোয়াং-ফুক হোই (ভিয়েৎনাম পুনরুদ্ধার সমিতি) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। ভিয়েৎনামের মধ্যে ছিল ঐ সমিতির গোপন শাখার একটা বিরাট জাল। ঐ সমিতি ও তার গোপন শাখাগুলির মাধ্যমে ভিয়েৎনামী যুবকদের প্রচুর সংখ্যায় গোপনে পাচার করা হতে লাগল চীনে ও জাপানে অস্ত্রবিদ্যায় দীক্ষা নেবার জন্যে। দেশে ফিরে এসে এই যুবকেরা অন্তত তিনবার—১৯১৩, ১৯১৫, ১৯১৭ সালে—সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা করে।

রক্তের পিচ্ছিল পথে ভিয়েৎনামের সুদীর্ঘ পদযাত্রা বলতে গেলে সেই থেকেই আরম্ভ হয়।

১৯২৭ সালে হ্যানয়ে স্থাপিত হল ভিয়েৎনাম কুয়োক-দান দাং, অর্থাৎ ভিয়েৎনামী জাতীয় দল। এই দলকে ঘিরে ভিয়েৎনামের জাতীয়তাবাদী শক্তি প্রথম পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করল।

তারপর এলো ১৯২৯ সালের সেই দিন, ভিয়েৎনামী জাতীয়

আন্দোলনের ইতিহাসে যে-দিনটির কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯২৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি।

র‍্যানে বাজঁা ছিলেন একজন পদস্থ কর্মচারী, ফরাসী মহলের একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। তাঁর কাজ ছিল টংকিন এলাকা থেকে সস্তাদরে শ্রমিক যোগাড় করে দক্ষিণে কোচিন চীন এলাকায় ফরাসীদের রবারের বাগিচাগুলিকে সরবরাহ করা। কিন্তু দক্ষিণে চালান হবার আগে ঐ শ্রমিকদের মধ্যে যারা ছিল মহিলা তারা চালান হত বাজঁার খাস-দরবারে। ফরাসী সভ্যতার প্রথম খেসারত তাদের দিতে হত সেইখানেই। এর অন্যথা হবার জো ছিল না। যারা প্রতিবাদের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করত, হঠাৎ এক-একদিন দেখা যেত তাদের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে রাস্তার পাশে, কিংবা কোন জঙ্গলের ধারে। স্বভাবতই তাঁর প্রতি ভিয়েৎনামীদের আক্রোশ ছিল প্রবল।

১৯২৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি র‍্যানে বাজঁা সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় যখন তাঁর বাংলোয় ঢুকতে যাবেন, সেই সময় একজন ভিয়েৎনামী যুবক তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াল। হাতে তার একখানি খাম বন্ধ-করা চিঠি।

কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে বাজঁা চিঠিটি নিলেন। অপাঙ্গে একবার পত্রবাহকের দিকে চেয়ে দেখলেন। যুবকটিকে তিনি চেনেন না।

"কে তুমি?" জিজ্ঞেস করলেন বাজঁা। "কোত্থেকে এসেছ?"

যুবকটি কোন উত্তর দিল না। কেবল আঙুল দিয়ে চিঠিটি দেখিয়ে দিল।

এইভাবে কোন চিঠিও তাঁর কাছে আসে না। একটু দ্বিধাগ্রস্ত-ভাবে তিনি যখন খাম ছিঁড়ে চিঠিটি বার করছেন, সেই সময় আকস্মিকভাবেই কাণ্ডটা ঘটে গেল। যুবকটি তার পকেট থেকে

একটা পিস্তল বার করে আনল এবং বাজ্যাঁ কিছু বোঝবার আগেই অত্যন্ত কাছ থেকে গুলী করল পর পর কয়েকটা।

কোন রকম শব্দ করবার সুযোগ পর্যন্ত পেলেন না বাজ্যাঁ। তার আগেই তাঁর প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল তাঁর বাংলোর প্রবেশ-পথের সামনে; রাস্তার ধুলায়। ঠিক যেমন করে অসহায় ভিয়েৎনামী নারীদের দেহ পড়ে থাকত। চিঠির কাগজটি তখনও তাঁর হাতে ধরা ছিল।

পরে পুলিশ এসে দেখল তাতে লেখা রয়েছে: "ভিয়েৎনামীদের রক্ত-চোষা জানোয়ার!"

এই হত্যাকাণ্ড ফরাসী শাসনকর্তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। ঐ সময় ভিয়েৎনাম জাতীয় দল ছিল দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি প্রকাশ্য, যার কেন্দ্র ছিল হ্যানয়ের একটি হোটেল; অপরটি গোপন। র‍্যনে বাজাঁর হত্যাকারীর সন্ধান পুলিশ কোনদিন পায় নি। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা ধরে নিল এটা জাতীয় দলেরই কাজ। তারা চড়াও হল হোটেল ভিয়েৎনামের ওপর, তছনছ করল দলের সদর দপ্তর, দলের প্রকাশ্য ভাগের প্রায় সকল সদস্যকেই গ্রেপ্তার করে চালান করল ভিয়েৎনামের আন্দামান পুলো কঁদোর দ্বীপে।

বাজাঁর হত্যা এবং তারপর ফরাসীদের প্রত্যাঘাত যেন ভিয়েৎনামীদের রক্তে একটা অভূতপূর্ব উন্মাদনা এনে দিল। জাতীয় দলের নেতৃবৃন্দ দেখলেন এই সুযোগ। যদি আঘাত হানতে হয় তো এই সময়। দেরি করলে হয়ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। দলের প্রকাশ্য শাখা যদিও পুলিশের হাতে আবদ্ধ তবু গোপন শাখার সন্ধান পুলিশ তখন পর্যন্ত পায় নি। সেই শাখার সদস্যদের অনেকেই ছিল সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত। সেই শাখাকেই এখন নেতৃবৃন্দ পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে দিলেন একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাবার জন্যে।

দেশ জুড়ে গোপন আড্ডায় আড্ডায় বোমা তৈরি আরম্ভ হয়ে গেল। এই কাজের ভার ছিল যার ওপর সে তখন সতেরো বছরের একজন যুবক মাত্র। নাম তার ত্রিন ভান ইয়েন, হ্যানয়ের এক মিডল স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। এই ইয়েনই পরে ১৯৪৬-৫৪ সালের ভিয়েৎনাম লড়াইয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বিশেষজ্ঞ হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

১৯৩০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের দিন ঠিক হল। দলের নেতা নুয়েন থাই হক সেই অনুসারে নির্দেশ পাঠালেন গোপন ইউনিটগুলিকে। পরে হঠাৎ একটা জরুরী কারণ ঘটায় তিনি তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়ে আরেকটি নির্দেশ জারি করলেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ সালে কী ঘটতে পারত তা এখন আর বলা যাবে না। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, নুয়েন থাই হক তাঁর জাল অত্যন্ত সতর্কতা ও যত্নের সঙ্গে বিস্তার করেছিলেন। কাজ হল না কেবল একটি ভুলের জন্যে।

অভ্যুত্থানের তারিখ পিছিয়ে দেবার খবরটি রেড রিভারের তীরে ইয়েন বে'র সামরিক গ্যারিসনের কাছে সময় মতো পৌঁছয় নি। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্রোহ করল সেখানকার সৈন্যবাহিনী।

তারা জানতেও পারে নি, জানবার কোন উপায়ও ছিল না যে, তারা একা। সম্পূর্ণ একা।

তাদের বিদ্রোহ তাই টিকল না বেশিক্ষণ। তাদের দমন করতেও তাই বিশেষ বেগ পেতে হল না ফরাসীদের। কষ্ট হল না এই বিচ্ছিন্ন ঘটনার সূত্র ধরে জাতীয় দলের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী আবিষ্কার করতে।

বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা পেরেছিল পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল কো আম নামে একটি গ্রামে। সেখান থেকে তারা যতক্ষণ পেরেছিল প্রতিরোধ করেছিল ফরাসী বাহিনীর। পারে

নি বেশিদিন। ফরাসীদের হাতে ছিল বিমান। আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ করে কো আম গ্রাম প্রায় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাটির সঙ্গে।

দলের যেটুকু অংশ তখনও বাইরে ছিল তারাও গ্রেপ্তার হল কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। ধরা পড়লেন নুয়েন থাই হক। প্রাথমিক স্কুলের একজন শিক্ষক যিনি সেই সময়ের অবিসম্বাদী জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অন্যান্য আরো প্রায় কুড়ি জনের সঙ্গে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

১৭ জুলাই বিদ্রোহী নেতাদের নিয়ে যাওয়া হল ইয়েন বে'তে। সেখানে ফরাসীর গিলোটিন অপেক্ষা করছিল তাঁদের জন্যে। একসঙ্গে পাশাপাশি থেকে তাঁরা প্রাণ দিলেন ভিয়েৎনামের অসমাপ্ত বিপ্লবের উদ্দেশ্যে। তাঁদের দেহ ছিল অচঞ্চল, কণ্ঠস্বর কাঁপে নি একটুও। হাসিমুখেই তাঁরা বরণ করে নিয়েছিলেন তাঁদের মৃত্যুকে, সেলাম জানাতে জানাতে, অনেকটা উপেক্ষা করতে করতে। ভিয়েৎনামের বীর সেনানীরা।

গিলোটিনের ব্লেড তাঁদের গলা স্পর্শ করবার মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা চিৎকার করে বার বার বলেছিলেন: 'ভিয়েৎনাম জিন্দাবাদ!'

দলের একজন ছিলেন যিনি ধরা পড়েন নি, তিনি একজন মহিলা। নাম তাঁর নুয়েন থি ইয়াং।

অনেক সাধ ছিল নুয়েন থি ইয়াংয়ের। অনেক স্বপ্ন। বিপ্লবের স্বপ্ন। থাই হককে নিয়ে ঘর বাঁধবার সাধ। থাই হককে ভালোবাসতেন তিনি। তাঁদের দেখা হয়েছিল থাই হকের স্বগ্রামে এক বটগাছের তলায়। সেই বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে তাঁরা প্রথম শপথ নিয়েছিলেন আজীবন পাশাপাশি থেকে সংগ্রাম করে যাবেন।

ইয়েন বে'তে ১৭ জুলাই যে ভিড় হয়েছিল বিপ্লবের নেতাদের গিলোটিন দেখবার জন্যে, সেই ভিড়ের মধ্যে ছিলেন থি ইয়াংও।

তিনি এসেছিলেন শেষবারের মতো বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে। শেষবারের মতো তাঁর প্রিয় নেতাকে আড়াল থেকে দেখে নেবার জন্যে।

তিনি দেখলেন। তারপর আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না সেখানে। চলে গেলেন থাই হকের স্বগ্রামে। সেখানে সেই বটগাছের নিচে যেখানে তাঁরা প্রথম পরস্পরকে পরস্পরের কাছে উৎসর্গ করেছিলেন, সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি গুলী করলেন নিজেকে।

তখন তাঁর কণ্ঠেও কি এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছিল—'ভিয়েৎনাম অমর হোক!'

আমরা জানি না। শুধু জানি, এইভাবে ভিয়েৎনামের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের একটি গৌরবময় অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছিল। কিছু সংখ্যক ব্যক্তি চীনে পালিয়ে গিয়ে জাতীয় দলকে নতুন করে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তা সফল হয় নি।

ঠিক এই সময়েই ভিয়েৎনামের রঙ্গমঞ্চে হো চি মিনের আবির্ভাব। জাতীয় আন্দোলনের যে অধ্যায় শেষ হয়েছিল ইয়েন বে'র হত্যাকাণ্ডের মধ্যে, সেইখান থেকেই সম্পূর্ণ নতুন এক অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছিল হো চি মিনের নেতৃত্বে। সেই অধ্যায় যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি বিস্ময়কর।

ঠিক ঠিক ধরতে গেলে আবির্ভাবের কাল অবশ্য আরো পাঁচ বছর আগে, ১৯২৫ সালে। ঐ বছর ক্যান্টনে তিনি বিপ্লবী যুব-সমিতি নামে একটি জাতীয়তাবাদী সংস্থা গঠন করেন। কিন্তু তাঁর কার্যকর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আরো পাঁচ বছর পরে, ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন ভিয়েৎনাম কম্যুনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল। এই দল গঠনের সময় হো'র সহযোগী ছিলেন ফাম ভান ডং যিনি এখন উত্তর ভিয়েৎনামের প্রধানমন্ত্রী এবং ভো নুয়েন গিয়াপ, হ্যানয়ের একটি স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক যিনি এখন উত্তর ভিয়েৎনামের প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

তিন

"বন্ধুগণ, আমাদের বাঁচান !"

চোখের সামনে থেকে তীরভূমি মিলিয়ে যেতে লাগল ক্রমে, সন্ধ্যার অন্ধকারে দিনের শেষ আলো যেমন করে মুছে যায়। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে ছিল বাইশ বছর বয়েসের এক যুবক।

১৯১২ সাল। এস-এস 'লা টুশ-ট্রেভিল' যাচ্ছিল সায়গন থেকে মার্সাইয়ে। পালের জাহাজ লা টুশ-ট্রেভিল। সেই জাহাজে যাত্রী ছিল ওই যুবক।

যাত্রী বললে ভুল হয়। আরোহী। আরোহীও ঠিক নয়। জাহাজের সাহায্যকারীর এই কাজটি যদি না জুটত তাহলে এই জাহাজে তার ওঠাই হত না। তার সমস্ত পরিকল্পনাই তাহলে রূপায়িত হত না, হয়ত অন্যভাবে রূপায়িত হত।

এর জন্যে তাকে তিন মাস ধরে ট্রেনিং নিতে হয়েছিল। কী করে পাকা রাঁধুনী হতে হয় তার ট্রেনিং।

বুদ্ধিটা দিয়েছিলেন তার বাবাই। বাবা ছিলেন সায়গনের একজন ডাক্তার। চীনা চিকিৎসাশাস্ত্রের ডাক্তার। ওষুধ দিতেন কিন্তু পয়সা নিতেন না। রোগীর বাড়াবাড়ি দেখলে সারাদিনই হয়ত থেকে যেতেন রোগীর বাড়িতে, সেখানেই কিছু খেয়ে নিতেন। সায়গনে তাঁর নাম-ডাক প্রচুর।

কিন্তু কেবল সেই জন্যে সে বাবার কাছে যায় নি। আরো কারণ ছিল। ফরাসীদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন তার বাবা। ফরাসীরা তাঁকে চালান করে

দিয়েছিল ভিয়েৎনামের আন্দামান পুলো কোঁদোর দ্বীপে। মুক্তি দেবার পরেও তাঁকে স্বগৃহে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সায়গনে। বিদ্রোহ ছিল যুবকের রক্তেও। চোখে ছিল স্বপ্ন। কিন্তু সে তখনও জানত না কোন্ পথে ওই বিপ্লবের দিকে যাত্রা করবে।

সেই জন্যেই সে বাবার কাছে গিয়েছিল পরামর্শের জন্যে।

"আমাকে বলে দিন আমি কী করব?" ছেলে জিজ্ঞেস করেছিল বাবাকে।

"তুমি কী করতে চাও?"

"বিপ্লব।" দ্বিধাহীন, দ্ব্যর্থহীন জবাব। "ফরাসীদের সমূলে উৎখাত করতে হবে, দেশকে স্বাধীন করতে হবে।"

চমকে উঠেছিলেন বাবা ছেলের কথা শুনে। বলে কি? ফরাসীদের সমূলে উৎখাত করবে? এ যে সন্ত্রাসবাদীর মত কথাবার্তা। তিনি নিজে একজন জাতীয়তাবাদী সন্দেহ নেই, কিন্তু চরমপন্থী তিনি কখনই নন। দেশে সংস্কার আসুক, ভিয়েৎনামীদের ফরাসীরা আরো বেশি অধিকার দিক, এটা তিনিও চান। কিন্তু তিনি চান এই পরিবর্তন আসুক ফরাসীদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে; ফরাসীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে।

কিন্তু মুখে তিনি বললেন না কিছুই। ছেলেকে সামনা-সামনি বাধা দিতে গেলে তার জেদকেই হয়ত উস্কে দেওয়া হবে। কয়েকদিন সময় চেয়ে নিলেন ছেলের কাছে। এরপর তাঁর পরামর্শ করার পালা। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা চলল। শেষে সবাই মিলে ঠিক করলেন ছেলেকে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। সেখানে সমাজ অন্য, আবহাওয়া অন্য। সেখানকার পরিবেশে আছে বৃহত্তর মুক্তি। ওই মুক্তির হাওয়ায় একবার যদি সে নিঃশ্বাস নিতে পারে তাহলে হয়ত তার দৃষ্টিভঙ্গি নরম হবে; বুঝতে শিখবে। তাছাড়া ফ্রান্সে আছে তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁরই মতো

মধ্যপন্থী জাতীয়তাবাদী। ফরাসীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী। একবার তাঁর তত্ত্বাবধানে গিয়ে পড়তে পারলে আর চিন্তা নেই। তিনিই তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারবেন।

তাই ছেলেকে তিনি বললেন, "তোমার ফ্রান্সে যাওয়া উচিত। সেখানেই তুমি তোমার পথের সন্ধান পাবে।"

তা-ই সে চলেছে। রাঁধুনী হিসেবেও নয়, রাঁধুনীর সহকারী হিসেবে। সামান্য চাকরী। জাহাজের খাতায় লেখা তার নামটিও অত্যন্ত সাধারণঃ শুধু ছোট্ট একটি 'বা'। তার সম্বলও সামান্যঃ একটি মাত্র ছোট স্যুটকেশ। তার দেহও মোটেই অসামান্য নয়। রোগা, তোবড়ানো গাল, ছোটখাটো একটি মানুষ যে ভিড়ের মধ্যে সহজেই হারিয়ে যায়।

কেবল তার চোখ দুটি ছিল অসামান্য। কী গভীর আবেগে যেন সব সময় জ্বলজ্বল করছে। সে চোখের দৃষ্টি শাণিত; সে চোখের দৃষ্টি স্বপ্নময়।

ওই চোখ নিয়েই সে তাকিয়েছিল বিলীয়মান তটরেখার দিকে। দূরে, অনেক দূরে, দিগন্তের ওই একটি রেখার মধ্যে নিবিড় হয়ে রয়েছে তার দেশ, পাহাড়, নদী, জঙ্গল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অনেক ইতিহাস, অত্যাচার, অনেক ব্যথা ও বেদনা, অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা, অনেক স্বপ্ন।

ক্রমে শেষ রেখাটুকুও বিলীন হয়ে গেল।

ওই চোখে কী জল ছিল?

আমরা জানি না। তবে পরে জেনেছি, ইতিহাস জানিয়েছে, ওই চোখে ছিল আগুন। কারণ ১৯১২ সালের গোড়ার দিকে লা টুশ-ট্রেভিল জাহাজ যে শীর্ণকায়, অখ্যাত, সামান্য এক রাঁধুনীর সাহায্যকারীকে নিয়ে মহাসমুদ্রের বুকে পাড়ি জমিয়েছিল, সে-ই পরে ফিরে এসেছিল ভিয়েৎনামের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের

সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী রূপে। ১৯৪১ সালে তখন তাঁর নাম নুয়েন আই কুয়োক। পরে হো চি মিন।

হো চি মিন একটি বিস্ময় ও বিশ্বাসের অপর নাম। হো চি মিন একটি স্বপ্নের প্রতীক। হো চি মিন ভিয়েৎনামের অন্তরের কামনার ভাবমূর্তি। হো চি মিন আর ভিয়েৎনাম আজ সমার্থক।

এ শুধু শোনা কথা নয় বা বইয়ে পড়া কথা নয়।

"দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তোমরা কাকে তোমাদের নেতা বলে মনে কর ?" আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম সায়গন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞানের কয়েকজন ছাত্রকে।

আশ্চর্য জবাব দিয়েছিল ওই ছাত্ররা :

"দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কোন নেতা নেই। দক্ষিণ বলুন, উত্তর বলুন, আমাদের একমাত্র নেতা হলেন হো চি মিন।"

এই প্রশ্নই আমি করেছিলাম আরো অনেককে। দোকানদার, পথচারী, রেস্তোরাঁর বয়, ট্যাক্সি চালককে। তাদের সকলেরই একই উত্তর : তাদের জাতীয় নেতা একজনই, তাঁর নাম হো চি মিন।

বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে যাঁর ছায়া ভিয়েৎনামের পাহাড়-পর্বত, জল ও জঙ্গল পেরিয়ে কালের স্বাক্ষরের মতো ইতিহাসের বুকে প্রলম্বিত রয়েছে, তিনি হো চি মিন। এই ছায়া ভোরের প্রথম উদ্ভাসের মতো, সর্বব্যাপী। ইতিহাস লিখিত হয়েছে তাঁরই অঙ্গুলি-হেলনে। তাঁরই নির্দেশে একটি জাতি পরিচালিত হয়েছে। তাঁরই কথায় আজও ওই জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা উদ্বেলিত হয়ে থাকে।

হো চি মিন!

হো একটি সাধারণ ভিয়েৎনামী পারিবারিক নাম। 'চি' মানে আকাঙ্ক্ষা। আর 'মিন' অর্থ প্রজ্ঞা। অর্থাৎ প্রজ্ঞার জন্যে আকাঙ্ক্ষা যাঁর বৈশিষ্ট্য তিনিই হো চি মিন।

দেশকে তিনি পরাধীনতার অচেতনতা থেকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন, তাই তাঁর নাম হো চি মিন।

হো চি মিনের নেতৃত্বের তুলনা নেই। ত্রিশ বছর তিনি দেশের বাইরে ছিলেন, কিন্তু ভিয়েৎনামের মুক্তি-আন্দোলনের গতি একদিনের জন্যেও শিথিল হয় নি। নিজে তিনি বন্দুক ধরেন নি একদিনও কিংবা পরিচালনা করেন নি কোন কম্যাণ্ড। কিন্তু ভিয়েৎনামের মুক্তিযুদ্ধের তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ স্ট্র্যাটিজিস্ট। এত অনমনীয়, অদ্ভুত ও বিপজ্জনক বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী সারা ভিয়েৎনামে আর দ্বিতীয় নেই, এই অভিমত প্রায় সকল পশ্চিমী পর্যবেক্ষকেরই। ১৯৪৭ সালে ফরাসী সরকার হো চি মিনের সঙ্গে দেখা করে মীমাংসা আলোচনা আরম্ভ করবার জন্যে যাঁকে পাঠিয়েছিলেন, সেই পল মুস ফিরে গিয়ে বলেছিলেন: "তিনি একজন আপোষহীন ও দুর্নীতির স্পর্শমুক্ত বিপ্লবী, ঠিক সেণ্ট যাস্টের মতো।"

পল মুস একটুও বাড়িয়ে বলেন নি। ভিয়েৎনামের মানুষের কাছে আজও তিনি দেবতার মতোই পূজিত হন। ঘরে ঘরে তাঁর ছবি 'ঠাকুরের আসনে' দেবতার পাশেই রেখে দেয় তারা। সেই ছবির সামনে আনত হয়ে চাষীরা মাঠে কাজ করতে যায়, শ্রমিকরা কল-কারখানায়।

ভিয়েৎনামে একটি মায়া ঝাঁপির উপাখ্যান প্রচলিত আছে। যদি কেউ কখনো কোন বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে ওই ঝাঁপি খুললেই সঙ্গে সঙ্গে তার সমাধান পেয়ে যাবে।

ভিয়েৎনামীদের কাছে হো চি মিন হচ্ছেন সেই মায়া ঝাঁপি। ওই ঝাঁপি খুললেই সকল বিপদ সকল সঙ্কটের অবসান। ভিয়েৎনামীরা এ-কথা বিশ্বাস করে। তাঁর নামের মধ্যেই একটা আশ্চর্য যাদু আছে। ওই যাদু একটা গোটা জাতিকে অর্ধ শতাব্দী ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে

তরুণ ও তরুণীরা ওই যাদুর প্রেরণায় চঞ্চল হয়ে জেগে উঠেছে, লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে।

তাঁর নাম উচ্চারিত হত ভয়ে, ভক্তিতে, ফিসফিস করে, যখন ফরাসীরা ছিল ভিয়েৎনামে। তাঁর উপস্থিতি ছিল ফরাসীদের কাছে বাতাসের মত, অলক্ষ্য কিন্তু অনুভূত। কেঁপে উঠত তারা। শঙ্কিত হত। কিন্তু কিছু করার ছিল না। তাঁকে দেখা যেত সর্বত্র, আবার তাঁকে দেখা যেত না কোথাও। ফরাসীর কারাগার তাঁকে বন্দী করার জন্যে তৈরি হয় নি। অনেকবারই তিনি হাতের কাছে ধরা দিয়েছেন, কিন্তু কোনদিনই ধরা পড়েন নি। পরনে খাকি হাফপ্যাণ্ট, গায়ে সাধারণ কুর্তা, পায়ে পুরনো মোটরের টায়ারের চটি, এই পবে তিনি ঘুরে বেড়াতেন পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, শহরে-গ্রামে। ডাক দিয়ে যেতেন একটা জাগ্রত কিন্তু নিরুপায় জাতিকে। স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করতেন। তাদের পাঠাতেন চীনে। অস্ত্রশস্ত্রে দীক্ষা দিয়ে আবার ফেরত পাঠাতেন ভিয়েৎনামে। লড়াই চলতে থাকত।

একবার ধরা পড়েছিলেন হো। চীনাদের হাতে। চীনে তখন কুয়োমিণ্টাংদের রাজত্ব। তারা তাঁকে ফরাসীদের গুপ্তচর হিসেবে গ্রেপ্তার করেছিল। প্রায় দু'বছর তাঁকে ঘোরানো হয় এক জেল থেকে অন্য জেলে। একবার তাঁকে ক্রমাগত আশি দিন ধরে হাঁটানো হয়েছিল পাহাড়ী রাস্তায়, পায়ে বেড়ি, হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। ওই নিদারুণ অত্যাচারে তাঁর চোখের দৃষ্টি প্রায় নষ্ট হতে বসেছিল। "আমার দাঁত পড়ে যেতে আরম্ভ করে", তিনি পরে বলেছিলেন। "একবার আমি আয়নায় আমার দিকে তাকিয়েছিলাম, তারপর আর তাকাতে ইচ্ছা করে নি। অস্থিচর্মসার যাকে বলে আমি হয়ে পড়েছিলাম তা-ই। সারা শরীর পচা ঘায়ে ভরে গিয়েছিল।"

ওই নিঃসঙ্গতার ও অত্যাচারের মুহূর্তে যখন তাঁর বেদনা শরীরের

ওপর ভার হয়ে ভেঙে পড়তে চাইত, তখন তাঁর চোখের জল রূপান্তরিত হত কবিতায়। কবিতার মধ্যেই তিনি মুক্তি খুঁজতেন কারাগার থেকে। কবিতার মধ্যেই তিনি ঘনিষ্ঠ হতে চাইতেন তাঁর দেশের সঙ্গে, পাহাড়, নদী আর বনানীর সঙ্গে। তাঁর দেশ-প্রেমের মতোই সহজ ছিল তাঁর কবিতা, একটি বেদনাহত মনের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত, পাহাড়ী হাওয়ার মতোই স্বতঃস্ফূর্ত।

"ফটকের সামনে রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে তার রাইফেল নিয়ে।
ওপরে, এলোমেলো মেঘ ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে চাঁদকে।
ছারপোকার দঙ্গল ভিড় করে আছে চারদিকে,
যেন শত্রুর ট্যাঙ্ক কোন যুদ্ধক্ষেত্রে।
আর মশারা গড়ছে স্কোয়াড্রন, আক্রমণ করছে
ঠিক যেন জঙ্গী বিমানের মত।
আমার হৃদয় ছুটে চলেছে এক হাজার 'লি' অতিক্রম করে
আমার দেশের মাটির স্পর্শ নেবার জন্যে।
আমার স্বপ্ন জড়ানো রয়েছে বিষণ্ণতায়
হাজার সুতোর জটের মতো।

অপরাধী নই,
তবু পুরো একটি বছর আমার
কেটে গেল কারাগারের অন্তরালে।
চোখের জলের কালি দিয়ে আমার
ভাবনাগুলিকে আমি রূপ দিচ্ছি কবিতায়।"

ওই প্রচণ্ড অত্যাচারের ধাক্কা হো আজও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর শরীর আজও শীর্ণ। মুখের ভাঙন প্রায় তেমনই আছে। ভাঙে নি কেবল তাঁর মনের দৃঢ়তা, তাঁর সঙ্কল্প।

"আমার দেশই আমার দল," তিনি বলেছিলেন একবার। আমার কার্যসূচী হল স্বাধীনতা।"

এই কথা তিনি এখনও বলতে পারেন। কারণ তাঁর দেশের স্বাধীনতা আজও পূর্ণ হয় নি।

এবং বলেওছেন। "আমরা আত্মসমর্পণ করব না, কখনও না। কারণ এই যুদ্ধ দেশপ্রেমের যুদ্ধ, ন্যায়ের যুদ্ধ, এবং আমরা এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দৃঢ়সঙ্কল্প। যদি পাঁচ, দশ, কুড়ি কি তার চেয়েও বেশি সময় লাগে তবুও।"

আমরা অবাক না হয়ে পারি না, যখন ভাবি হো চি মিনের বয়েস এখন আটাত্তর।

১৯১২ সালের গোড়ার দিকে একদিন এই লোকই একটি মালবাহী ফরাসী জাহাজে বাবুর্চির সহকারীর কাজ নিয়ে ফ্রান্সের পথে রওনা হয়েছিল। তার পকেটে বাবার লেখা একটি চিঠি, প্যারিসে তাঁর এক বন্ধুর উদ্দেশ্যে।

ফ্রান্সে পৌঁছে হো তাঁর পিতৃবন্ধুর ওখানেই উঠলেন। কিছুদিন থাকলেনও। কিন্তু শীগ্‌গিরই বুঝতে পারলেন, ওখানে বেশীদিন থাকা চলবে না। কারণ পিতৃবন্ধু ফান চু ত্রিনের রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে তাঁর মনের কোন মিল খুঁজে পাচ্ছেন না। ফান চু ত্রিন বিশ্বাস করেন ফ্রান্সের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার পথেই ভিয়েৎনামের স্বার্থ রক্ষা করা যাবে। হো মনে করেন, ওই পথে কোনদিন স্বাধীনতা আসবে না।

হতাশ হয়ে আরো কিছুদিন জাহাজে জাহাজে ঘুরে বেড়ালেন হো চি মিন 'বয়ে'র কাজ নিয়ে। ঘুরে বেড়ালেন দেশে দেশে, ইউরোপে, আমেরিকায়, আফ্রিকায়।

এমনিভাবে ঘুরে বেড়াবার ফাঁকে একবার তিনি এসেছিলেন সায়গনে, বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। দেখা হয়েছিল, কিন্তু

তার ফল হয়েছিল অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। দেখা মাত্রই বাবা একটা বেত নিয়ে তেড়ে এসেছিলেন ছেলেকে। ফান চু ত্রিন এক চিঠিতে তাঁকে লিখে জানিয়েছিলেন ছেলের রাজনৈতিক মতবাদের কথা।

ছেলে সেই যে বেরিয়ে গিয়েছিল পিতৃগৃহ থেকে তারপর আর কোনদিন ফিরে আসে নি। পরিবারের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখে নি আর কোন। সেদিন সেই মুহূর্তেই সে বুঝে নিয়েছিল যে, যে-পথে সে চলতে চাইছে সে-পথে তাকে চলতে হবে একাই।

ওই পথ এরপর যেখানে নিয়ে গিয়েছিল হো চি মিনকে, সেটা লণ্ডন। ১৯১৩ সালে। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন লণ্ডনে, বিখ্যাত কার্লটন হোটেলে আরো বিখ্যাত ফরাসী রাঁধুনি এস্কোফিয়ের সাহায্যকারী হিসেবে। কার্লটন হোটেলের রান্নাঘরে আলু-পেঁয়াজ কাটতে কাটতে তিনি ভাবতেন কিভাবে কাজ আরম্ভ করা যায়। তখনো কোন ধারণা তাঁর মনে দানা বাঁধে নি। কেবল মাঝে মাঝে চীনা ও ভারতীয় শ্রমিকদের গুপ্ত সংস্থা ওভারসীজ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাসমিতিতে যোগ দিতেন।

১৯১৭ সালের পর তিনি আবার গেলেন ফ্রান্সে। তাঁর নিজেরই ভাষায় "কখনো ফটোগ্রাফারের দোকানে রি-টাচার হিসেবে, কখনো চীনা পুরাদ্রব্যের (ফ্রান্সে তৈরি !) গায়ে রঙ লাগানোর কাজ নিয়ে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। আর ভিয়েৎনামে ফরাসী ঔপনিবেশিকদের অপরাধের নিন্দা করে প্রচারপত্র বিলি করতাম।"

প্যারিসে তখন প্রায় ৬০ হাজার প্রবাসী ভিয়েৎনামী ছিল। হো তাদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। তাদের কয়েকজনকে নিয়ে বার করলেন 'ল্য পারিয়া' ও 'ভিয়েৎনাম হন' নামে দুটি কাগজ। ফরাসী জাহাজে যে সব ভিয়েৎনামী কর্মী কাজ করত তাদের সাহায্যে ওই কাগজ পাচার করা হত ভিয়েৎনামে।

ওই সময়েই তিনি ফ্রান্সের বিশিষ্ট বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হন : লেয়ঁ ব্লুম, মার্সেল কাসাঁ, মারিয়াস মুতে, এবং আরো

অনেকে। তাঁদের প্রভাবেই তিনি ফরাসী সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

কিন্তু এই যোগদানের পেছনে, এটা লক্ষ্য করা দরকার, অন্য কোন রাজনৈতিক কারণ ছিল না। "আমি যোগ দিয়েছিলাম", তিনি লিখেছেন, "কারণ এই ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণ আমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, উৎপীড়িত মানুষের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন।"

১৯২০ সালের ২৫ থেকে ৩০ ডিসেম্বর তুর-এ ফরাসী সোস্যালিস্ট পার্টির যে অষ্টাদশ জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল, হো চি মিন তাতে ভিয়েৎনামের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। ওই অধিবেশনেই ফ্রান্সে কম্যুনিস্ট পার্টি স্থাপন করার এবং লেনিনের তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগদানের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। পশ্চিমী পর্যবেক্ষকেরা এই ঘটনার উল্লেখ করে প্রচার করে থাকেন যে, এরপর থেকে হো চি মিন জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে পরিত্যাগ করে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের স্বার্থরক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

কিন্তু তুর কংগ্রেসে হো চি মিন যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা উদ্ধৃত করেই দেখিয়ে দেওয়া যায় যে, এই বিশ্লেষণ অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। দেশপ্রেম ছাড়া তখনও হো'র দ্বিতীয় কোন চিন্তা ছিল না।

"আজ", তিনি পরিষ্কারভাবেই বলেছিলেন, "আপনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিশ্ব-বিপ্লবের সেবা করার বদলে আমি এখানে এসেছি গভীর বেদনা নিয়ে সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে আমার দেশের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদেব ঘৃণিত অপরাধের বিরুদ্ধে বলবার জন্যে।······আমাদের ওপর কেবল নির্লজ্জ অত্যাচার আর শোষণই চালানো হয় নি, আমাদের জীবনকে নির্দয়ভাবে বিষাক্ত করে তোলা হয়েছে।"

এরপর হো সংক্ষেপে ফরাসীদের অত্যাচারের একটা আভাস উপস্থিত সদস্যদের দেন। তার বিস্তারিত কাহিনী তিনি পরে লিখেছিলেন 'ল্য পারিয়া' কাগজে। চোখের জলে লেখা সেই সব কাহিনী। সে সব কাহিনী ভয়াবহ। হো'র পক্ষে তা ভুলে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না। এর প্রতিকারের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ আর কোন চিন্তা তাঁর থাকতেই পারে না।

কাহিনীর কি শেষ আছে?

কেবল কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে একজন আন্নামী তাকিয়েছিল জানালা দিয়ে একজন ফরাসীর বাড়ির ভেতরে। উক্ত ফরাসীর বুলেটের গুলী তার মাথার খুলি ভেদ করে চলে গিয়েছিল।

মঁ ব্রে নামে একজন বিল্ডিং কণ্ট্রাকটর একজন আন্নামীকে হাত-পা বেঁধে কুকুর দিয়ে কামড়িয়ে লাথি মেরে খতম করে দিয়েছিল।

একদিন হাইফংএর একজন ফরাসী মেকানিক মঁ অঁরি রাস্তায় একটা গোলমাল শুনে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখলেন, একটি আন্নামী মেয়ে একটি পুরুষের তাড়া খেয়ে দৌড়চ্ছে। মঁ অঁরির দরজা খোলা পেয়ে মেয়েটি তাড়াতাড়ি সেখানে ঢুকে পড়ল।

মঁ অঁরি ভাবলেন বুঝি কোন নেটিভ মেয়েটিকে তাড়া করছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিকারের বন্দুকটি নিয়ে এসে গুলী করলেন। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মরে পড়ে গেল।

তখন দেখা গেল যে, সে একজন ইয়োরোপীয়। পরে মঁ অঁরিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: "আপনি গুলী করলেন কেন?"

উত্তরে বলেছিলেন মঁ অঁরি: "আমি ভেবেছিলাম লোকটা একজন নেটিভ।"

একবার ফরাসী সৈন্যরা একটি গ্রামে গিয়ে হাজির হলে গ্রামের সমস্ত লোক ভয়ে পালিয়ে গেল। কেবল পড়ে রইল দুজন বৃদ্ধ, একজন তরুণী এবং বুকে দুধের শিশু ও হাতে আট বছরের মেয়েকে ধরে একজন মা। এরা পালাবার পথ পায় নি।

সৈন্যরা এসে তাদের কাছে টাকা-পয়সা চাইল, মদ আর আফিং দিতে বলল। গ্রামের মেয়ে ওরা, ফরাসীদের ভাষা বুঝবে কেন। আর তাইতে সৈন্যরা গেল ক্ষেপে। রাইফেলের কুঁদা দিয়ে একজন বৃদ্ধকে মেরেই ফেলল ওরা। আর অপর বৃদ্ধকে ওরা পুড়িয়ে মারল ধীরে ধীরে, কাঠের আগুন জেলে। তারপর মহিলা দুজন আর আট বছরের মেয়েটির ওপর অত্যাচার করল পাশবিকভাবে।

তারপর? হ্যাঁ, তারও পর আছে।

ক্লান্ত সৈন্যরা এরপর হত্যা করল তরুণীটিকে। মা তার দুধের শিশুটিকে নিয়ে সেই ফাঁকে পালিয়ে যেতে পেরিছিল কয়েক শ' গজ দূরে একটা ঝোপের মধ্যে। সেখানে বসে বসে সে দেখল তার আট বছরেব মেয়েটি চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। সারা শরীর বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা। আর একজন সৈন্য ধীরে ধীরে তার বেয়োনেটটি একবার মেয়েটির পেটের মধ্যে ঢোকাচ্ছে আরেক-বার বার করছে। এইভাবে কিছুক্ষণ করার পর সে মৃত মেয়েটির আঙুল কেটে আংটি খুলে নিল। শেষে গলাটা কেটে ফেলে তার নেকলেসটি বার করে নিল।

এই ছিল ফরাসী অত্যাচারের ধরণ। এই অত্যাচারের তুলনা পাওয়া ভার। হো চিন মিন লিখেছেন: "গান্ধী ও ডি ভ্যালেরারা যদি কোন ফরাসী উপনিবেশে জন্ম নিতেন তাহলে তাঁরা অনেক আগেই স্বর্গে আরোহণ করতেন।"

এই অত্যাচারের কথা মনে রেখেই তিনি তুর কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: "সমগ্র মানবজাতির পক্ষ থেকে, সোস্যালিস্ট পার্টির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি! কমরেডগণ, আমাদের বাঁচান।"

যদি কেউ এর পরেও এই প্রশ্ন করেন যে, হো সোস্যালিস্ট পার্টির কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন কেন, তাহলে কেবল

একটিই উত্তর দেওয়া যায়। অত্যন্ত সোজা এবং অত্যন্ত সরল উত্তর। তিনি অন্য কোথাও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পান নি বলে।

একথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, ভার্সাই শান্তি-চুক্তিতে সই করবার জন্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন যখন ফ্রান্সে এসেছিলেন তখন হো চি মিন ভিয়েৎনামী সম্পর্কে একটি আট-দফা কার্যসূচী তাঁর কাছে পেশ করার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। হো'র দাবি ছিল স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হোক, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা হোক, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হোক, ফরাসী ও ভিয়েৎনামীদের অধিকার সমান করা হোক এবং বাধ্যতামূলক শ্রম, লবণ কর এবং বাধ্যতামূলক মদ খাওয়া বাতিল করা হোক।

কিন্তু হো চি মিন চেষ্টা করেও প্রেসিডেন্ট উইলসনের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। ভিয়েৎনামী স্বাধীনতা সংগ্রামে মার্কিন সমর্থন পাবার জন্যে তাঁর আশা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল।

এর পর থেকে হো যদি মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে সেটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। ঔপনিবেশিক জাতিগুলির মুক্তিসংগ্রামের সম্পর্কে লেনিন ও তৃতীয় আন্তর্জাতিক-এর একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল যা হো'কে অভিভূত করেছিল।

আমরা জানি, কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্যে হো ১৯২২ সালে মস্কো গিয়েছিলেন। তারপর ১৯২৩ সালে আবার গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক কৃষক-কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্যে। ১৯২৪ সালে তিনি আরো দীর্ঘ সময়ের জন্যে যান এবং মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও বলশেভিক কলাকৌশলের পাঠ নেবার জন্যে ইস্টার্ন ওয়ার্কার্স ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হন।

সেখান থেকে ১৯২৫ সালে চীনে। প্রথম প্রথম চীনেও তাঁর

করবার বেশি কিছু ছিল না। তিনি সিগারেট আর খবরের কাগজ ফিরি করে তাঁর জীবিকা নির্বাহ করতেন।

তারপর তিনি এলেন ক্যান্টনে, মাইকেল বোরোদিনের সেক্রেটারী-দোভাষী হয়ে। সান ইয়াৎ-সেনকে সাহায্য করার জন্যে কমিনটার্ন থেকে যে উপদেষ্টা-মিশন পাঠানো হয়েছিল, বোরোদিন ছিলেন তার প্রধান। তখন কুয়োমিন্টাং ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে মধুচন্দ্রিমার যুগ চলছে। ক্যান্টনে একটি বিপ্লবী সরকার স্থাপিত হয়েছে। ক্যান্টনের কাছেই হোয়ামপোয়ার সামরিক অ্যাকাডেমি থেকে বিপ্লবের যোদ্ধারা অস্ত্রশস্ত্রে দীক্ষা নিয়ে বেরিয়ে আসছে।

ক্যান্টনের ওই বিপ্লবী আবহাওয়ায় হো তাঁর পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবের উৎসস্থল ক্যান্টন তখন ছিল এসিয়ায় বিপ্লবীদের মিলনের স্থান। তা ছাড়া ক্যান্টন ছিল ভিয়েৎনামের বাইরে ভিয়েৎনামী জাতীয়তাবাদীদের প্রধান আশ্রয়স্থল। হো এদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। এসিয়ার উৎপীড়িত জাতি সংগঠন নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পত্তন করলেন তিনি। গঠন করলেন ভিয়েৎনামী বিপ্লবী যুব-সমিতি। এই সমিতির কাজ ছিল হোয়ামপোয়ার সামরিক অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিং দিয়ে বিপ্লবীদের ভিয়েৎনামে ফেরত পাঠানো। সেখানে তারা গঠন করত গোপন সেল, বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবার জন্যে।

একমাত্র ক্যান্টনেই হো দু'শোরও বেশি ভিয়েৎনামী ক্যাডারকে ট্রেনিং দিয়ে সুশিক্ষিত করে দেশে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। ১৯২৬ সালে 'বিপ্লবের পথ' নামে একটি বইয়ে এই শিক্ষিত ক্যাডারদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, তারা যেন ফিরে গিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যেই কাজ করে। কারণ, তিনি লিখেছিলেন, "প্রথমত, তারাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত; দ্বিতীয়ত, তারাই হচ্ছে সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং তাদের বৈপ্লবিক শক্তিও হচ্ছে সবচেয়ে বেশি;

তৃতীয়ত, নিজেদের খালি হাত ছাড়া তাদের আর কিছু নেই, কাজেই যদি তারা পরাস্ত হয় তাহলে তাদের নিজেদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনেরই অবসান হবে, আর যদি তারা জয়ী হয় তাহলে সমগ্র দুনিয়া তাদের করায়ত্ত হবে।”

কিন্তু ক্যান্টনের এই কার্যকলাপ চলতে পারল না বেশিদিন। ১৯২৭ সালে কুয়োমিন্টাং ও কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে ধরল ভাঙন। চিয়াং কাই-শেক কম্যুনিস্টদের দমন করবার জন্যে এক রক্তাক্ত অভিযান আরম্ভ করলেন। ক্যান্টন ও সাংহাইয়ে হাজার হাজার কম্যুনিস্ট নিহত হল। মাইকেল বোরোদিন ও তাঁর উপদেষ্টা-মিশন কোনমতে প্রাণ নিয়ে মস্কো ফিরে গেলেন।

বাধ্য হয়ে ক্যান্টনের পাট ওঠাতে হয় হো'কেও। কিন্তু বিপ্লবী যুব-সমিতির কাজ যাতে বন্ধ না হয় তার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি তিনি করে গিয়েছিলেন। এবং যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন তাঁর সহকর্মীদের কাছে: “এই আকস্মিক বিঘ্নে আমাদের ভেঙে পড়লে চলবে না। মনে রাখবেন, ঝড় না বইলে পাইন আর সাইপ্রেস গাছের শক্তির পরীক্ষা হয় না।”

হো চি মিনকে আমরা এর পর দেখি থাইল্যাণ্ডে। সেখানে থেকে তিনি প্রবাসী ভিয়েৎনামীদের মধ্যে তাঁর কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে লাগলেন, যেমন চালিয়েছিলেন ক্যান্টনে। এই সময় তাঁর প্রচারের হাতিয়ার ছিল “লুমানিতে” নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং কাজের মাধ্যম ছিল ভিয়েৎনামী পারস্পরিক সহায়তা সমিতি নামে একটি সংগঠন।

এরপর দৃশ্যপট পরিবর্তিত হল হংকং-এ। সেখানেই ১৯৩০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি এক ঐতিহাসিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্দোচীন কম্যুনিস্ট পার্টি স্থাপন করা হয়েছিল।

হো এবং তাঁর সহকর্মীদের পক্ষে সময়টা ছিল অত্যন্ত অনুকূল। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর

জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যখন একটা গভীর হতাশা ও শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সময়েই ভিয়েৎনামী কম্যুনিস্ট পার্টির আত্মপ্রকাশ। স্বভাবতই গোড়া থেকেই এর প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি সহজাতভাবে এসে পড়েছিল। এই সহানুভূতি এসেছিল আরো একটা গভীর কারণ থেকে। ফরাসী শোষণের দরুণ এবং বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে ভিয়েৎনামী কৃষক-সম্প্রদায় দারিদ্র্যের চরমতম সীমায় পৌঁছেছিল। এবং ভিয়েৎনামের আশি শতাংশ লোকই হচ্ছে কৃষিজীবী। ট্যাক্স দেওয়া তো দূরের কথা খাবার কেনার মত পয়সাও তাদের হাতে ছিল না। অথচ খাবার ছিল হাস্যকর রকমে সস্তা। এই বৈপরীত্য গ্রামাঞ্চলে একটা বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি করে তুলেছিল। কম্যুনিস্ট পার্টির দশ-দফা কর্মসূচীতে যখন কৃষকদের এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারের দাবি জানানো হল তখন স্বভাবতই এই সংগঠনের পেছনে এসে দাঁড়াতে তাদের দ্বিধা হয় নি।

তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ১৯৩০ সালের মে-দিবসে যেদিন গ্রামে গ্রামে দরিদ্র চাষী, নিঃস্ব চাষী, বুভুক্ষু চাষীর দল কাতারে কাতারে মিলিত হয়েছিল বিরাট বিরাট জনসভায়, দৃপ্ত প্রতিবাদে। তারপর বার করেছিল ভুখা মিছিল, ঘিরে ফেলেছিল ফরাসী শোষণের কেন্দ্রগুলিকে। অচল করে দিতে চেয়েছিল তাদের শাসনের ব্যবস্থা।

উত্তরে ফরাসী শাসক মেশিনগানের গুলী চালিয়ে প্রতিবাদের কণ্ঠকে চেয়েছিল নিস্তব্ধ করে দিতে। পারে নি। নে-আন প্রদেশে, যেখানে হো চি মিনের জন্ম হয়েছিল ১৮৯০ সালে, তারা চীনাদের দৃষ্টান্তে গঠন করেছিল কয়েকটি কৃষক সোভিয়েত। নিপীড়নকে উন্মুক্ত করে দিয়ে 'ফরেন লিজিয়ন' ভেঙে দিয়েছিল ওই সোভিয়েতগুলিকে। কিন্তু আন্দোলনকে ভাঙতে পারে নি। আন্দোলন চলেছিল অব্যাহত গতিতে, প্রবল নিপীড়নের মধ্যে যেভাবে চলতে পারে।

ভিয়েৎনামী কম্যুনিস্ট পার্টির এই পর্যায়ের কার্যকলাপের উল্লেখ করে হো চি মিনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা পশ্চিমী

সরকারী পর্যবেক্ষকদের একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, যে কারণে হো মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন ঠিক সেই কারণেই দেশের মানুষকে সঙ্গে নেবার জন্যে তাঁকে কম্যুনিস্ট আদর্শে কিছু কিছু সংস্কারের কাজ করতেই হয়েছিল। এটা নিছক লোক দেখানো বা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সংস্কার ছিল না। এই সংস্কার ছিল ভিয়েৎনামের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন ও জরুরি। কারণ ফরাসী-শাসন দেশটাকে নিংড়ে, চুষে প্রায় ছিবড়ে করে ফেলেছিল। একটা বাস্তব পুনর্গঠনের পরিকল্পনা যদি তাঁরা সেই সময় হাতে না নিতেন তাহলে জনসাধারণকে তাঁরা এত ব্যাপকভাবে তাঁদের আন্দোলনের মধ্যে পেতেন না। কতটা ব্যাপকভাবে তা বোঝা যাবে এই থেকে যে, এক সময় অধিকাংশ ভিয়েৎনামী আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করত যে, ভিয়েৎনামী কম্যুনিস্ট পার্টিই তাদের একমাত্র ভরসা, হো চি মিন-ই তাদের একমাত্র আশা।

কিন্তু তাঁর আসল লক্ষ্য সম্পর্কে হো'র কোনদিন সংশয় ছিল না। জাতীয় স্বাধীনতার লক্ষ্য থেকে তিনি কোনদিন বিচ্যুত হন নি। স্বাধীনতা লাভের পর অন্য একটি দেশের হাতে তিনি নিজের দেশকে তুলে দেবেন এমন কোন দূরতম কল্পনাও তাঁর ছিল বলে আমরা জানি না। বরং এটাই জানা যায় যে, কৃষক সোভিয়েত সংগঠনের বেলায় পুরোপুরি রুশ বা চীনা আদর্শ গ্রহণ করতে তাঁর আপত্তিই ছিল। এই নিয়ে এবং অন্যান্য নানা কারণে কমিণ্টার্নের সঙ্গে যে তাঁর প্রায়ই মতবিরোধ দেখা দিচ্ছিল এটাও জানা কথা। আর সেই জন্যেই যে স্তালিন ভিয়েৎনামী কম্যুনিস্ট পার্টির ওপর খবরদারী করার জন্যে ফরাসী কম্যুনিস্ট নেতা মোরিস তোরেকে নিযুক্ত করেছিলেন সে-বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। এবং অনেকেই সন্দেহ করে থাকেন যে, ১৯৩৩ সালে হো যে হংকং-এর একটি হাসপাতাল থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন তার পেছনেও স্তালিনের হাত ছিল।

হো হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলন ক্ষয়রোগের চিকিৎসার জন্যে। তার আগে ১৯৩১ সালে হংকং-এ একবার এবং ১৯৩২ সালে সিঙ্গাপুরে আরেকবার তিনি ব্রিটিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ; হাসপাতালেও তিনি ছিলেন বৃটিশের হেফাজতে। সেখান থেকে তিনি কিভাবে বেমালুম উধাও হয়ে গেলেন তা এক অত্যন্ত রহস্যজনক ব্যাপার।

আট বছর তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

আট বছর পর, ১৯৪১ সালে, একদিন সকালে হো চি মিনকে হঠাৎ দেখা গেল মস্কোয় তাঁর বন্ধু নুয়েন কান তোয়ানের বাড়িতে করাঘাত করতে। তোয়ান ছিলেন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিয়েৎনামী ভাষার অধ্যাপক। ১৯২৭ সাল থেকেই রাশিয়ায় আছেন। হো'র বিষয় যে তিনিও আগে থেকে জানতেন না সেটা বোঝা যায় হঠাৎ এইভাবে হো'কে তাঁর বাড়িতে আসতে দেখে। তাঁর ওই বিস্ময়ের কথা তিনি পরে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বলেছিলেন।

হো বললেন তোয়ানকে তাঁর সঙ্গে ভিয়েৎনামে ফিরে যেতে। কারণ মুক্তি-সংগ্রাম আরম্ভ কবার এই-ই সুযোগ। ১৯৪০ সালে জার্মানীর হাতে ফ্রান্সের পরাজয়ের তিন মাসের মধ্যে জাপানীরা ভিয়েৎনাম দখল করে নিয়েছিল। ফরাসীরা এখন বিপর্যস্ত, জাপানীরা এখনো সংহত হতে পারে নি। সুতরাং এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়।

এই কথাই তিনি বলেছিলেন ভিয়েৎনামী জাতীয়তাবাদীদের উদ্দেশ্যে এই সময় লেখা এক খোলা চিঠিতে। বলেছিলেন : "আমার স্বদেশবাসী ভাই-বোনেরা! জেগে উঠুন তাড়াতাড়ি! চীনের জনগণের বীরত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন। ফরাসী ও জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে আসুন আমরা একটি জাতীয় মুক্তি সংস্থা গঠন করি।"

বলেছিলেন : "ধনী, সৈনিক, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, যুবক ও মহিলাবৃন্দ! আপনারা যাঁরা দেশকে গভীরভাবে

ভালবাসেন, মনে রাখবেন, জাতীয় মুক্তিই হচ্ছে এখনকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। মনে ও শক্তিতে এক হতে পারলে আমরা জাপানী আর ফরাসীদের আর তাদের তল্পিবাহকদের উৎখাত করতে পারবই, জনসাধারণকে ফুটন্ত জল আর জ্বলন্ত আগুনের সঙ্কট থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হবই।"

মনে করিয়ে দিয়েছিলেন কয়েক শ' বছর আগে ট্রান যুগের কথা যখন দেশের মানুষ মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সমবেত হয়েছিল। উদ্ধৃত করেছিলেন ফরাসীদের বিরুদ্ধে পূর্বসূরী শহীদদের দৃষ্টান্ত। ডাক দিয়েছিলেন এঁদের মহান পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে।

এই কথাই তিনি বলেছিলেন তোয়ানকে।

রাজি হলেন তোয়ান। ব্যবস্থাদি সব সম্পূর্ণ হল। কয়েকদিন পর হো চি মিন আর নুয়েন কান তোয়ান ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলে চেপে বসলেন ইয়েনানের পথে।

ইয়েনানে পৌঁছে তিনি তোয়ানকে রেখে দিলেন সেখানেই, কারণ সামনে যে বন্ধুর পথ, যে অনিশ্চিত জীবন, তোয়ানের পক্ষে তার সঙ্গে আর খাপ খাইয়ে চলা সম্ভব ছিল না। ট্রেনে আসতে আসতেই হো সেটা বুঝে নিয়েছিলেন।

তারপর একদিন তিনি গোপনে রওনা হয়ে গেলেন কুয়োমিণ্টাং অধিকৃত এলাকা অতিক্রম করে ভিয়েৎনাম সীমান্তের দিকে। সেখানে ফাম ভান ডং, ভো নুয়েন গিয়াপ এবং আরো কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি গঠন করলেন ভিয়েৎনাম ডক-লাপ ডং-মিন নামে একটি প্রতিষ্ঠান, সংক্ষেপে ভিয়েৎমিন, যার অর্থ ভিয়েৎনাম স্বাধীনতা সংগঠন।

চার

ভিনি, ভিডি, ভিসি

সেদিন হ্যানয়ের আকাশে একটি নতুন তারা উঠেছিল। রক্তিম আকাশে একটি হলুদ তারা।

অবাক বিস্ময়ে হ্যানয়ের মানুষ তাকিয়েছিল তার দিকে। কী আশ্চর্য উজ্জ্বল! বাতাসে বাতাসে অসংখ্য হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা শহর জুড়ে। রাস্তা-ঘাটে, গাছের মাথায়, বাড়ির ছাদে, লোকের হাতে তারাগুলি তারাবাতি হয়ে যেন উৎসবের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে চাইছিল সবকিছু।

লাল জমির ওপর হলুদ তারা। ভিয়েৎনাম মুক্তিবাহিনীর পতাকা, সংগ্রামের প্রতীক।

২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ এক নতুন হ্যানয় এই পতাকাকে অভিবাদন জানিয়েছিল এক ঐতিহাসিক উন্মাদনার সঙ্গে। ঐ রক্ত পতাকা ছিল তাদের ইতিহাসের স্বাক্ষর। ঐ হলুদ তারা উজ্জ্বল হয়েছিল তাদের স্বপ্নে।

শত শত শহীদের বুকের রক্তে আর চোখের জলে যে স্বপ্ন তারা রচনা করেছিল তিলে তিলে।

সেদিন তাই তাদের আবেগ অশান্ত হয়ে উঠেছিল বারবার। হ্যানয়ের রাস্তা বন্ধহীন মানুষের পদভারে কেবলই কেঁপে কেঁপে উঠেছিল সকাল থেকে সন্ধ্যা—সন্ধ্যা থেকে রাত্রি।

হ্যানয় অবশেষে মুক্ত! দীর্ঘ আশি বছর পর বিদেশীর শাসন থেকে শোষণ থেকে অত্যাচার থেকে হ্যানয় অবশেষে ভিয়েৎমিন মুক্তিবাহিনীর করায়ত্ত!

শুধু হ্যানয় নয়, সারা টংকিন। এবং শুধু টংকিন নয়, আন্নাম আর কোচিন-চীনও। সারা ভিয়েৎনাম।

সারা ভিয়েৎনাম সেদিন ঘোষণা করেছিল তার স্বাধীনতা। ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর, যেদিন হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক রিপাবলিক কায়েম হয়েছিল।

বা দিন স্কোয়ার সেদিন লোকে লোকারণ্য।

হ্যানয়ের সাহেবপাড়ার মাঝখানে এই বা দিন স্কোয়ার। মস্কোর যেমন রেড স্কোয়ার কিংবা পিকিংয়ের তিয়েন আন মেন, তেমনি হ্যানয়ের বা দিন যেখান থেকে প্রাক্তন ফরাসী গভর্নর-জেনারেলের প্রাসাদ মাত্র এক ঢিলের দূরত্ব।

সেই প্রাসাদের ঔদ্ধত্যকে উপেক্ষা করে লাল জমির ওপর হলুদ তারা যে-পতাকা সগর্বে উড়ছিল, তার তলায় সেদিন সমবেত হয়েছিল অগণিত মানুষ। তারা তাকিয়েছিল মঞ্চের ওপর আরেকটি বিস্ময়ের দিকে, যার নাম হো চি মিন। জীর্ণ-শীর্ণ, কাঠির মতো সরু সরু পা, ভাঙা মুখে পাতলা কয়েকগাছা দাড়ি, পরনে খাকি হাফ প্যাণ্ট আর বুক-খোলা সাদা শার্ট আর চওড়া পায়ে টায়ারের স্যাণ্ডেল এই যে মানুষটি এঁর জন্যেই তারা এতদিন অপেক্ষা করছিল।

সেই মানুষটিই আজ বা দিন স্কোয়ারে মঞ্চের ওপর তাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, পাহাড় ডিঙিয়ে, জঙ্গল পেরিয়ে, নদী অতিক্রম করে, ধীরে ধীরে, এক-পা এক-পা করে, কিন্তু দৃঢ় গতিতে।

কাটা ঘায়ে তাঁর পা দুটি ভরে গিয়েছিল।

শোনা যায় সেই সময় তাঁর স্বাস্থ্য এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, অবসরের সময়ে তিনি পাথর ছুঁড়ে যেতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দু'হাতে শক্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যে।

কিন্তু তাঁর সঙ্কল্পে শক্তির কোন অভাব ছিল না।

সঙ্কল্পের সেই শক্তিকেই ভাষা দিয়েছিলেন হো চি মিন যখন ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর বা দিন স্কোয়ারে লাল জমি আর হলুদ তারা পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে ভিয়েৎনামের স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা করেছিলেন পৃথিবীর কাছে।

"আমরা শিকল ছিন্ন করেছি," তিনি উচ্চকণ্ঠে জানিয়েছিলেন, "যে শিকল প্রায় শতাব্দীকাল ধরে আমাদের আবদ্ধ রেখেছিল। আমরা স্বাধীনতা এনেছি আমাদের পিতৃভূমির জন্যে।··· ভিয়েৎনামের সমস্ত মানুষ তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে, সম্বল দিয়ে, এমন কি প্রাণ দিয়েও এই স্বাধীনতা রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

বলেছিলেন: "স্বাধীন ও মুক্ত দেশ হিসাবে বেঁচে থাকবার সমস্ত অধিকার ভিয়েৎনামের আছে, কারণ আশি বছরেরও বেশি কাল ধরে এই দেশ ফরাসী প্রভুত্বের বিরোধিতা করে এসেছে।"

বলেছিলেন: "আশি বছরের বেশি সময় ধরে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশকে শোষণে জর্জরিত করেছে······ আমাদের সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে তারা। বর্বর আইন চাপিয়ে দিয়েছে আমাদের ওপর······স্কুল গড়েছে যত, জেলখানা গড়েছে তার চাইতে বেশি······আমাদের বনাঞ্চল তারা তছনছ করেছে······রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে আমাদের বিপ্লবকে। এই কারণে আমরা, অস্থায়ী সরকারের সদস্যগণ, ভিয়েৎনামের সকল মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা করছি যে, এর পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না; ভিয়েৎনাম সম্পর্কে ফ্রান্স যতগুলি চুক্তি সম্পাদন করেছে সবগুলি বাতিল করছি; আমাদের দেশে ফরাসীরা যেসব সুবিধা ভোগ করত সবগুলি বাতিল করা হচ্ছে।"

বলেছিলেন: "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মিত্র শক্তিবর্গ যারা তেহেরানে ও সান ফ্রান্সিসকোয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও দেশে

দেশে সমানাধিকারের নীতি স্বীকার করে নিয়েছে, ভিয়েৎনামের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করবে না।"

সে এক পরম গৌরবের মুহূর্ত, সেদিন ছিল এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের দিন।

রাস্তায় রাস্তায় যেখানে যত ফরাসী নাম লেখা সাইনবোর্ড ছিল সেগুলি টেনে নামানো হল। তার জায়গায় টাঙানো হল আন্নামী নামের সাইনবোর্ড। এই জয়ের মুহূর্তে পুরানো ইতিহাসের কোন পরিচয়ই তারা রাখতে চায় না, শোষণের কোন চিহ্ন। বুলেভার্ড অঁরি রিভিয়ের, রু আমিরাল কুর্বে, রু মিরিবেল, ফরাসী হোমরা-চোমরাদের নামে যেসব রাস্তার নাম হয়েছিল সেগুলি এখন বহন করতে লাগল ভিয়েৎনামী বিপ্লবী কিংবা প্রাচীন আন্নামী রাজাদের স্মৃতি। ফরাসী দোকানের বিরাট বিরাট সৌখীন জানালাগুলি গেঁথে দেওয়া হল কাঠের টুকরো দিয়ে। চারিদিকে শুধু উন্মত্ত জনতার ভিড়। উদ্বেল মানুষ চিৎকার করে বলে উঠছিল:

"স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু!"

"ভিয়েৎনাম ভিয়েৎনামীদের!"

"মৃত্যুও ভালো, তবু দাসত্ব আর নয়!"

বাড়ির দেয়ালে, ট্রামের গায়ে, রাস্তাজোড়া বিরাট বিরাট ব্যানারে লেখা হয়ে চলেছিল এক অভূতপূর্ব নতুন ইতিহাসের কাহিনী। সে ইতিহাসের নায়ক হো চি মিন।

যে দিকে তাকানো যায় শুধু হো চি মিনের ছবি: তোবড়ানো গাল, মুখে পাতলা কয়েকগাছা দাড়ি, ঠোঁটে বিষণ্ন হাসি। শুধু লাল জমি আর হলুদ তারা। যেখানে কান পাতা যায় শুধু সেই শ্লোগান:

"স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু!"

"ভিয়েৎনাম ভিয়েৎনামীদের!"

"মৃত্যু, তবু দাসত্ব নয়!"

সে ইতিহাসের স্রোত আবর্তিত হয়েছিল অত্যন্ত দ্রুত। এত দ্রুত যে ভিয়েৎমিনরাই তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

বাও দাই নিজেই পদত্যাগ করেছিলেন হো চি মিনের অনুকূলে।

সম্রাট বাও দাই, যিনি প্রায় কুড়ি বছর ধরে আন্নামের শাসনতক্তে অধিষ্ঠিত ছিলেন ফরাসীদের হাতে পুতুল-রাজা হয়ে। যিনি পরে জাপানীদের উৎসাহে ১৯৪৫ সালের ১১ মার্চ 'তাঁর দেশের' স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

১৭ আগস্ট ভো নুয়েন গিয়াপ যখন একদল ভিয়েৎমিন সৈন্যের অগ্রভাগে হ্যানয়ে প্রবেশ করলেন, এবং ১৮ আগস্ট যখন একটি অস্থায়ী ভিয়েৎমিন কমিটি শহরের দায়িত্ব গ্রহণ করল, তখন পদত্যাগ করা ছাড়া বাও দাই'র আর কিছু করণীয় ছিল না।

কারণ তাঁকে মদত দেবার মত কেউ আর অবশিষ্ট ছিল না। ফরাসীরা জাপানীদের দ্বারা আগেই পর্যুদস্ত হয়েছিল। এবার মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণের দ্বারা জাপানও শক্তিহীন। তাই ২৫ আগস্ট এক ঘোষণার দ্বারা তিনি নিজেই শাসনতন্ত্র থেকে নেমে দাঁড়ালেন।

ওই ঘোষণায় তিনি বললেন: "আমার কুড়ি বছরের শাসন-কালের কথা মনে করে আমি দুঃখিত না হয়ে পারছি না। ওই সময়ের মধ্যে আমি দেশের কোন উল্লেখযোগ্য কল্যাণ সাধন করতে পারি নি।......অনেক তিক্ততার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। এর পর থেকে একটি স্বাধীন দেশের একজন স্বাধীন নাগরিক হিসেবে থাকতে পেরে আমি সুখী। দীর্ঘস্থায়ী হোক ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা! দীর্ঘজীবী হোক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র!"

২৯ আগস্ট হো প্রবেশ করলেন হ্যানয়ে।

এ যেন ভিনি, ভিডি, ভিসি। এলাম, দেখলাম, আর জয়

করলাম। প্রতিরোধ ছিল না বিশেষ, রক্তপাতও হয়নি তেমন। সারা আগস্ট মাসে মাত্র একজন ফরাসী নিহত হয়েছিল হ্যানয়ে একটি রাস্তার সংঘর্ষে। এবং গিয়াপ ডবল মার্চ করতে করতে নেমে এসেছিলেন চীনের সীমান্তবর্তী কাও বাং প্রদেশের পাহাড় আর জঙ্গল থেকে সং কার উপত্যকা অতিক্রম করে হ্যানয়ের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত।

কত সহজে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে গিয়াপের এই সময়কার একটি কার্যতালিকা থেকে :

১১ আগস্ট : হা তিন প্রদেশ মুক্ত করা হল।

১২ আগস্ট : ভিয়েৎ ব'ক স্বাধীন অঞ্চলের মুক্তি সম্পূর্ণ হল।

১৩ আগস্ট : কোয়াং নাই প্রদেশ মুক্ত হল।

১৫ আগস্ট : তাই নুয়েন প্রদেশ মুক্ত।

১৭ আগস্ট : হ্যানয়ে ভিয়েৎমিন অনুপ্রবেশ।

১৯ আগস্ট : হ্যানয়ে ভিয়েৎমিন বিদ্রোহ।

১৯ আগস্ট : আনুষ্ঠানিকভাবে হ্যানয়ে প্রবেশ।

দেখতে দেখতে সারা উত্তর ভিয়েৎনাম ভিয়েৎমিনদের করায়ত্ত হয়েছিল। এমনিতেই সেখানে ফরাসীদের কার্যকর প্রভাব বিশেষ ছিল না। তার ওপর জাপানীদের দখল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণতি যে সুযোগ এনে দিয়েছিল ভিয়েৎমিনরা তা গ্রহণ করেছিল পুরোপুরি।

তাছাড়া ছিল তাদের চমৎকার সংগঠন যার ফলে কাজ অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছিল।

১৯৪১ সালের মে মাসে দক্ষিণ চীনের চিংসিতে ভিয়েৎনাম ডক-লাপ ডং মিন-এর পত্তন হবার পর ফরাসীদের বিরুদ্ধে গেরিলা লড়াই চালাবার জন্যে হো চি মিন গিয়াপের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, গিয়াপ সে-দায়িত্ব উৎসাহের সঙ্গে পালন করেছিলেন।

চিংসি থেকে মাইল ষাটেক নেমে এসে কাও বাং প্রদেশের পাহাড়ের ওপর গিয়াপ স্থাপন করেছিলেন তাঁর প্রথম গেরিলা শিবির। কিন্তু প্রথমেই তিনি ফরাসীদের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চাইলেন না। কারণ তাঁর অস্ত্রবল তখনো সীমিত।

তার বদলে তিনি ভিয়েৎমিন প্রভাব বিস্তারের কাজে আত্ম-নিয়োগ করলেন। তাঁর লোক ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম থেকে গ্রামে, সেখান থেকে শহরে। ফরাসীদের গতিবিধি সংক্রান্ত খবরাখবর পাঠাতে লাগল গিয়াপের পর্বত-শিবিরে। সেই সঙ্গে গ্রামে গ্রামে গড়ে তোলা হতে লাগল প্রতিরোধ কমিটি। ওই কমিটির মাধ্যমে কাজ চলল শিক্ষা বিস্তারের। একথা বিচিত্র মনে হতে পারে কিন্তু ভিয়েৎমিনদের গোড়ার দিককার প্রধান কাজই ছিল শিক্ষার বিস্তার। যুদ্ধকালীন অবস্থার মত দ্রুতগতিতে তারা এই কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। অজস্র বয়স্ক শিক্ষার স্কুল গজিয়ে উঠল চারদিকে। কৃষক টোকা মাথায় কাজ করতে যাচ্ছে মাঠে, তাকে থামিয়ে তার অক্ষরজ্ঞান যাচাই করা হতে লাগল। বাজারে যাবে কেউ, তাকে দাঁড় করিয়ে বানান জিজ্ঞেস করা হল। পারল তো ভালোই, না পারলে সঙ্গে সঙ্গে বাজারের দরজা থেকে ফেরত। এইভাবে কয়েক বছরের মধ্যে যেখানে ৮০ শতাংশই ছিল অশিক্ষিত সেখানে ৮০ শতাংশই হল সাক্ষর।

শিক্ষা বিস্তারের এই পরিকল্পনা সবচেয়ে আগে হাতে নেওয়া দরকার ছিল ভিয়েৎমিনদের। কারণ তা না হলে তাদের বক্তব্য সাধারণ মানুষের কাছে ভালোভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হত না। এই বক্তব্য এখন দূর গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছতে লাগল হাজার হাজার প্রচারপত্র আর রঙ ও চকখড়ি দিয়ে দেয়ালের গায়ে লেখা শ্লোগানের মাধ্যমে।

এইভাবে জমি তৈরি করার পরেও কিন্তু গিয়াপ কাজ আরম্ভ করে দিলেন না। তার বদলে হো'র নির্দেশে তিনি গেলেন

ইয়েনানে মাও সে-তুংয়ের আদর্শে গেরিলা যুদ্ধের তালিম নেবার জন্যে।

গেরিলা যুদ্ধই বেছে নিয়েছিলেন হো ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে, কারণ সামনা-সামনি যুদ্ধ করে লোকক্ষয় করার মত অবস্থা তাঁদের ছিল না। তাছাড়া তখন চীনে মাও সে-তুংয়ের লাল ফৌজ গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমেই সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে চলেছে। কাজেই সেই দৃষ্টান্ত থেকে তাঁরা অনুপ্রাণিত হবেন এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

১৯৪২ সালের প্রায় অধিকাংশ সময়ই গিয়াপ ইয়েনানে ছিলেন। বছরের শেষে তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ফরাসীদের বিরুদ্ধে যদি সাফল্য অর্জন করতে হয় তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি সশস্ত্র ফৌজ তাঁকেও গড়ে তুলতে হবে।

তুললেনও। মাত্র চৌত্রিশজন সশস্ত্র লোক নিয়ে। একটি বিরাট সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মাত্র চৌত্রিশজন লোক নিয়ে কাও বাংয়ের পাহাড়ে গিয়াপ তাঁর সংগ্রাম আরম্ভ করেছিলেন।

দেখতে দেখতে সে সংখ্যা বেড়ে চলল। পাঁচ শ' ছাড়িয়ে হাজারে গিয়ে পৌঁছল। ফরাসী ঔপনিবেশিক বাহিনীর ভেঙে-দেওয়া ইউনিটগুলিতে যেসব ভিয়েৎনামী সৈন্য ছিল, গিয়াপ তাদের টেনে নিলেন। সেই সঙ্গে কোয়াংসির লিউচোয় একটি ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হল নতুন নতুন গেরিলা তৈরী করবার জন্যে। টাকা এল চিয়াং কাই-শেকের সরকারের কাছ থেকে। এলো মাল-মশলা, অস্ত্রশস্ত্র। চিয়াংয়ের দরকার ছিল জাপানীদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে নিয়মিত গোপন খবরাখবর জানবার। ভিয়েৎমিনদের পক্ষে সে-খবর যোগাড় করা মোটেই দুঃসাধ্য ছিল না। তারই বিনিময়ে তারা এখন সাহায্য পাচ্ছিল চুংকিংয়ের।

কাও বাং প্রদেশ পুরোপুরি ভিয়েৎমিনদের হাতে আসতে বেশি সময় লাগল না। সেখান থেকে বাক কান ও তাই ঙুয়েন। ভিয়েৎমিনদের ডাকে গ্রাম কমিটিগুলি জেগে উঠল নিমেষে। দু'চার জায়গায় বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল ফরাসীরা, কিন্তু চোরাগোপ্তা আক্রমণে অভ্যস্ত না থাকায় তারা পেরে উঠছিল না গেরিলাদের সঙ্গে।

ফ্রান্সে তখন একদিকে মার্শাল পেতাঁর ভিচি সরকার, অন্যদিকে জেনারেল দ্য-গলের নেতৃত্বের 'স্বাধীন ফরাসী' আন্দোলন। ভিয়েৎনামের ফরাসী মহলও সেই অনুসারে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। অনেকেই ছিল 'স্বাধীন ফরাসী'দের প্রতি সহানুভূতি-শীল। চুংকিংয়ে একটি 'স্বাধীন ফরাসী' মিশনও স্থাপিত হয়েছিল। তারা 'স্বাধীন ফরাসী' স্বেচ্ছাসেবক পাঠাতো ভিয়েৎনামে হাজারে হাজারে। প্যারাসুট দিয়ে নামিয়ে দিত পাহাড়ে, জঙ্গলে। উদ্দেশ্য প্রধানত ছিল জাপানীদের ওপর নজর রাখা।

ভিয়েৎমিনরা এই 'স্বাধীন ফরাসী' সেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল। দু'জনেরই বিরুদ্ধপক্ষ যখন জাপানীরা তখন হাত মিলিয়ে কাজ করলে সুবিধে হবে এই ছিল তাদের বক্তব্য। কিন্তু স্বাধীন ফরাসীরা ঐ প্রস্তাবে রাজী হয় নি। বলেছিল: "এখন আপনারা জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে অস্ত্র চাইছেন। পরে ঐ অস্ত্রই আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবেন। অসম্ভব!"

ভিয়েৎমিনরা তার প্রত্যুত্তর দিয়েছিল চোরাগোপ্তা আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে। এইভাবে অস্ত্র যোগাড় হতে লাগল। যোগাড় হল গোলা-বারুদ, রসদ, রেডিও ট্রান্সমিটার। ধীরে ধীরে, কিন্তু অপ্রতিহত গতিতে গিয়াপ শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন।

এই শক্তি দুর্বার হয়ে উঠল তার সঙ্গে জন-সমর্থন যুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে। অত্যন্ত ধৈর্য ও যত্নের সঙ্গে ভিয়েৎমিনরা এই

সমর্থন আদায় করেছিল। তাদের আদর্শ ছিল মাও সে-তুংয়ের প্রবর্তিত সেই আটটি অবশ্য-গ্রাহ্য নীতি যা তিনি সফল গেরিলা যুদ্ধের মূল ভিত্তি বলে বর্ণনা করেছেন।

এক, জনসাধারণের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করতে হবে ;

দুই, তাদের সঙ্গে কাজ-কারবারে ন্যায়সঙ্গত থাকতে হবে ;

তিন, যদি কিছু ধার নিতে হয় তাহলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে ;

চার, যদি কিছুর ক্ষতি হয় তাহলে তার দাম দিয়ে দিতে হবে ;

পাঁচ, জনসাধারণের ওপর হম্বি-তম্বি করা চলবে না ;

ছয়, ফসলের ক্ষতি করা চলবে না ;

সাত, মহিলাদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করা চলবে না ;

আট, বন্দীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা চলবে না।

গিয়াপ তাঁর গেরিলাদের মনের মধ্যে এই নীতিগুলি একেবারে গেঁথে দিলেন। এই নির্দেশের একটুও নড়চড় হবার জো ছিল না। সেই সঙ্গে মুক্ত অঞ্চলগুলিতে ১৯৩০ সালে গৃহীত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের দশ-দফা নীতিগুলি রূপায়িত করতে লাগলেন।

তার ফলও পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। গ্রামের মানুষ গেরিলাদের স্বাগত জানালো সসম্মানে। তাদের আশ্রয় দিল শত্রুপক্ষের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে। তাদের রসদ যোগাড় করে দিতে লাগল। টাকা-পয়সা গয়নাগাঁটি যা সম্ভব তা-ই দিয়ে সাহায্য করতে লাগল। শত্রুপক্ষের গতিবিধির খবরা-খবর পৌঁছে দিতে লাগল। ক্রমে সাধারণ গ্রামবাসীরাও যোগ দিতে লাগল ভিয়েৎমিনদের দলে।

তাদের কলেবর দ্রুত বাড়তে লাগল।

১৯৪৫ সালের অক্টোবরে হো চি মিন পা দিলেন ভিয়েৎনামের মাটিতে। তাই ন্গুয়েন প্রদেশের এক দুর্গম পাহাড়ের গুহায় তিনি স্থাপন করলেন তাঁর সদর দপ্তর। তারপর গিয়াপের গেরিলাদের একত্রিত করে গড়লেন ভিয়েৎমিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম প্ল্যাটুন।

নাম দেওয়া হল স্যালভেশন প্ল্যাটুন, মুক্তি-ফৌজ। গেরিলা বাহিনী এই প্রথম একটি সংগঠিত রূপ পেল। আনুষ্ঠানিকভাবে ভিয়েৎমিন বাহিনীর পত্তন হল।

হাতে তখন তাদের ১৭টি বোল্ট রাইফেল, ১৪টি ফ্লিন্টলক আর দু'টি রিভলভার!

কিন্তু এই নিয়েই অসাধ্য সাধন করেছিল গিয়াপের বাহিনী। বাক কান, লাং সন, তুয়েন কোয়াং, হা জিয়াং, ফু লাং তুয়ং, প্রকৃতপক্ষে উত্তর টংকিনের এক বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে ভিয়েৎমিনদের প্রভুত্ব কায়েম হল।

এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটল যা ভিয়েৎমিনদের কাজকে অপেক্ষাকৃত সহজ করে দিয়েছিল। ১৯৪৫ সালের ৯ মার্চ জাপানী কর্তৃপক্ষ এক চরমপত্র জারি করে সমস্ত ফরাসী সৈন্যকে তাদের ব্যারাকে আটকে রাখলেন। তাদের সরাসরি জাপানী কম্যাণ্ডের আওতায় আনা হল। জাপানী সৈন্যরা বন্দুক আর সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে পাহারার জন্যে মোতায়েন হয়ে গেল। কিন্তু ফরাসীরা ভিয়েৎনামের ভূগোলের সঙ্গে যতটুকু পরিচিত ছিল জাপানীরা তা-ও ছিল না। তাছাড়া তাদের কার্যকর প্রভাব নিজেদের ঘাঁটির বাইরে মোটেই বিস্তৃত ছিল না। এর ফলে গেরিলারা মাঠ ফাঁকাই পেয়েছিল।

চুংকিংয়ে সেই সময় ছিল মাকিন স্ট্র্যাটিজিক সার্ভিসের দপ্তর সেখানকার কর্তারা দেখলেন ফরাসীরা অকেজো হয়ে যাবার পর একমাত্র ভিয়েৎমিন সূত্র ছাড়া জাপানীদের উদ্দেশ্য ও গতিবিধি সম্পর্কে টাটকা খবরাখবর পাবার আর কোন সূত্রই খোলা নেই। সুতরাং…

সুতরাং মাকিন স্ট্র্যাটিজিক সার্ভিসের দপ্তর থেকে ভিয়েৎমিনদের জন্যে মূল্যবান সামরিক সাহায্য আসতে লাগল। আজ এটা বিচিত্র বলে মনে হ'তে পারে, কিন্তু সেই সময়, সেই ১৯৪৫ সালে, যখন ভিয়েৎনামে ফরাসীরা অস্তগামী আর জাপানীরাও প্রতিষ্ঠিত নয়, তখন আমেরিকা এগিয়ে এসে দরাজ হাতে সাহায্য করে হো চি মিনের হাত

শক্ত করেছিল। হো'র সৈন্যরা ইয়েনানে গিয়ে গেরিলা যুদ্ধের তালিম নিয়েছিল, মাও সে-তুংয়ের 'গেরিলা যুদ্ধ' বইটি ছিল তাদের গীতা, তা সত্ত্বেও চুংকিংয়ের মাকিন কর্তৃপক্ষ সেদিন তাঁকে একজন জাতীয়তাবাদী নেতা এবং ভিয়েৎমিন সংগ্রামকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বলেই মেনে নিয়েছিলেন।

মাকিন সাহায্য—অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, রসদ—প্যারাসুট দিয়ে পেঁ ছে দেওয়া হল তাই নুয়েন প্রদেশে তাঁর দুর্গম গুহা-শিবিরের একেবারে দ্বারপ্রান্তে। তার সূত্র ধরে এলো এক দল মাকিন প্রশিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ। তাদের সহায়তায় গিয়াপ তাঁর বাহিনীকে সম্প্রসারিত করলেন। ভাগ করে দিলেন ছোট ছোট ইউনিটে। উত্তরে, পশ্চিমে, দক্ষিণে তারা ছড়িয়ে পড়ল, গ্রামের পর গ্রামে, একেবারে সং কা'র (রেড রিভার) ব-দ্বীপ এলাকা পর্যন্ত।

গিয়াপের হাতে তখন ৫ হাজারেরও বেশি সশস্ত্র, সুশিক্ষিত গেরিলা।

তার পরের ইতিহাস খুবই দ্রুত। ৬ আগস্ট হিরোশিমার ওপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হবার পর মহাযুদ্ধে জাপানের পরাজয় অনিবার্য হয়ে পড়ল। হো চি মিনের পক্ষে তা অনুমান করে নেওয়া মুস্কিল ছিল না। পরের দিনই তিনি একটি ভিয়েৎনাম গণ-মুক্তি কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। যে-কোন মুহূর্তে দেশের শাসনভার গ্রহণের জন্যে কমিটি প্রস্তুত হ'তে লাগল।

১৬ আগস্ট যখন জাপানীরা দেশের কর্তৃত্ব সরকারীভাবে আন্নামে বাও দাইর হাতে এবং কোচিন-চীনে ইউনাইটেড পার্টি নামক একটি দলের হাতে অর্পণ করছিল, তখন হো চি মিন তুয়েন কোয়াং প্রদেশের তান ত্রাও গ্রামে ভিয়েৎমিন কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হলেন। ওই বৈঠকেই স্থির করা হল আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাপানীদের নিরস্ত্র করতে হবে, তাদের অস্ত্রশস্ত্র আটক করতে হবে, এবং গণ-মুক্তি কমিটিকে হ্যানয়ে স্থানান্তরিত করতে হবে।

এবং ওই বৈঠক থেকেই হো চি মিন গণ-মুক্তি কমিটির নেতা হিসেবে দেশবাসীর প্রতি স্বাধীনতার জন্যে বিদ্রোহ করবার আহ্বান জানালেন।

ওই আহ্বান ভিয়েৎনাম মুক্তি-সংগ্রামের এক উদ্দীপনাময় দলিল।

তিনি বললেন: "জাপানী সৈন্যবাহিনী এখন বিধ্বস্ত। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সমাজের সর্বস্তরের লক্ষ লক্ষ মানুষ, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, সৈনিক, ভিয়েৎমিনদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।......

"প্রায় শতাব্দীকাল ধরে আমাদের জনগণ তাদের মুক্তির জন্যে যে সংগ্রাম করে এসেছে তার ইতিহাস এখন এক বিরাট ধাপ এগিয়ে গেল।

"এই ঘটনায় আমার দেশবাসীর সঙ্গে আমিও অভিভূত।

"তাই বলে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না। আমাদের সংগ্রাম হবে দীর্ঘ ও কঠিন। জাপানীরা পরাজিত হয়েছে বলেই আমরা রাতারাতি স্বাধীন হয়ে যাব না। আমাদের আরও চেষ্টা করতে হবে, সংগ্রামকে চালিয়ে যেতে হবে। কেবল ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দ্বারাই আমরা স্বাধীনতা পেতে পারি।

"ভিয়েৎমিন ফ্রণ্ট বর্তমানে এই সংগ্রাম ও ঐক্যের ভিত্তি। ভিয়েৎমিন ফ্রণ্টে যোগ দিন, একে সমর্থন করুন, একে আরো বিরাট আরো দুর্বার করে তুলুন।

"যে জাতীয় মুক্তি কমিটি গঠন করা হল, বর্তমানে সেটাই আমাদের অস্থায়ী সরকার। এর পাশে দাঁড়ান, এর নীতি ও নির্দেশাবলী সারা দেশে কার্যকর করুন!

"এইভাবে আমাদের পিতৃভূমি স্বাধীনতা অর্জন করবেই, শীগ্‌গিরই।

"আমাদের জনগণের ভাগ্যের পরমতম লগ্ন সমুপস্থিত। আসুন আমরা উঠে দাঁড়াই; সর্বশক্তি নিয়ে নিজেদের স্বাধীন করবার জন্যে চেষ্টা করি!......

"চলুন! এগিয়ে চলুন! ভিয়েৎমিন ফ্রন্টের পতাকাতলে সাহসের সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে চলুন!"

তার পরের ঘটনা: ২৫ আগস্ট বাও দাইর পদত্যাগ, ২৯ আগস্ট হো চি মিনের হ্যানয়ে প্রবেশ, ২ সেপ্টেম্বর ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা ঘোষণা। সে-কথা আমি আগেই উল্লেখ ক'রছি।

কিন্তু ২ সেপ্টেম্বর আরও কিছু ঘটেছিল যা ভিয়েৎনামের ইতিহাসের গতিই দিয়েছিল পাল্টে, যার জন্যে ভিয়েৎমিনরা স্পষ্টতই প্রস্তুত ছিল না।

ঘটেছিল সায়গনে।

হো চি মিন যখন ক্ষমতা দখলের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন উত্তরে, তখন স্বাধীনতার জোয়ারে আন্দোলিত হচ্ছিল সায়গনও।

জাপানীদের পোষকতা-পুষ্ট ইউনাইটেড পার্টি যদিও তখন সায়গনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তবু তার নেতৃত্বে যিনি ছিলেন, ত্রান ভান ইয়াউ, ভিয়েৎমিন আন্দোলনের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। তাঁর সক্রিয় সহায়তায় এবং গেরিলাদের তৎপরতায় টংকিন ও আন্নামের মত কোচীন-চীনেও ভিয়েৎমিন প্রভাব দ্রুত কায়েম হয়েছিল।

হ্যানয়ের অনুকরণে একটি ভিয়েৎমিন গণ-কমিটি গঠিত হয়েছিল সায়গনেও। ওই কমিটির ডাকে ২৫ আগস্ট প্রায় এক লক্ষ লোকের এক বিপুল শোভাযাত্রা এক অভূতপূর্ব বিক্ষোভে বেরিয়ে এসেছিল সায়গনের রাস্তায়। মুখে আকাশ-ফাটানো চিৎকার, হাতে বিরাট বিরাট ফেস্টুন, চোখে আসন্ন স্বাধীনতার স্বপ্ন।

ওই কমিটিই ডাক দিয়েছিল ২ সেপ্টেম্বর বিপুলতর আরেক সমাবেশের। উদ্দেশ্য যেমন ছিল ভিয়েৎমিন শক্তি ও জনপ্রিয়তার পরিচয় দেওয়া তেমনি মিত্রশক্তিকে স্বাগত জানানো।

মহাযুদ্ধের শেষে পট্সডাম সম্মেলনে জাপানের কাছ থেকে ভিয়েৎনামের দখল বুঝে নেবার জন্যে ষোড়শ সমান্তরাল বরাবর

দেশকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছিল। উত্তরের অংশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল চিয়াং কাই-শেকের চীনকে, আর দক্ষিণের দায়িত্ব পড়েছিল বৃটেনের ওপর। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট: পরাজিত জাপানী সৈন্যদের এক জায়গায় জড়ো করে, নিরস্ত্র করে দেশে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করা। আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার তাদের দেওয়া হয় নি।

সেই অনুসারে আগস্টের শেষ থেকেই বৃটিশ প্রতিনিধিরা সায়গনে আসতে আরম্ভ করেছিল। বিংশতিতম ভারতীয় ডিভিশনের বৃটিশ ও ভারতীয় 'ইউনিটগুলিকে নিয়োগ করা হল এই কাজের জন্যে। ভিয়েৎমিনরা তাদের কখনই শত্রুপক্ষ বলে মনে করে নি, বরং তাদের কাজে নানাভাবে সহায়তাই করেছিল।

২ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে সারা শহর সাজানো হল মিত্রশক্তির পতাকা দিয়ে। বড় বড় ফেস্টুন টাঙানো হল রাস্তা জুড়ে: তাতে মিত্রশক্তিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শ্লোগান লেখা।

বিকেলে কয়েক লক্ষ লোকের এক প্রকাণ্ড মিছিল বেরোল শহর পরিক্রমায়। এক উদ্বেল জনসমুদ্র। চওড়া চওড়া বুলে-ভার্ডগুলিতে মানুষের ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি, কল্লোলিনী স্রোতস্বিনী যেন। কিংবা কোন প্রকাণ্ড সরীসৃপ যেন ফুলে-ফুলে, কেঁপে-কেঁপে, দুলে-দুলে উঠছে। যানবাহন অনেক আগেই বন্ধ। দোকান-বাজারে আজ কোন কাজ নেই। অফিস-কাছারির কোন প্রশ্নই ওঠে না। আজ শুধু উৎসাহ আর উদ্দীপনা। শুধু উন্মত্ত গৌরব। শ্লোগান উঠছে ঘন ঘন: "স্বাধীন ভিয়েৎনাম জিন্দাবাদ!" কেঁপে উঠছে রু কাতিনাত, বড়লাটের প্রাসাদ, প্রাসাদসংলগ্ন বিস্তীর্ণ বাগান, ব্যাঙ্ক অব ইন্দোচীনের পাথরের দেয়ালগুলি।

হঠাৎ……।

বিকেল তখন পাঁচটা। ঘণ্টা তিনেক ধবে শহর পরিক্রমা করার পর শোভাযাত্রীরা সবেমাত্র ছত্রভঙ্গ হতে আরম্ভ করেছে। একটা

নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তির ভাব লোকের চোখে-মুখে। আজ তারা স্বাধীন। আজ তারা মুক্ত। মিত্রশক্তি সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে এসেছে সেই স্বাধীনতাকে নিরাপদ করার জন্যে।

শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে যে-যার ঘরে ফিরে যাচ্ছিল তারা।

হঠাৎ সন্ধ্যার আকাশ খান খান হয়ে গেল গুলির শব্দে। বিনা প্ররোচনায়, বিনা কারণে শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র উৎসবমুখর মানুষের ওপর চলল গুলির পর গুলি। দেখা গেল ভিড়ের প্রান্তদেশে তুমুল উত্তেজনা ও ছোটাছুটি। অন্তত তিনজন ঘটনাস্থলেই নিহত।

গুলি করেছিল ফরাসীরা।

মহাযুদ্ধের বিপর্যয় এবং পট্‌স্‌ডাম বৈঠকের নির্দেশ উপেক্ষা করে ভিয়েৎনামে আবার আধিপত্য বিস্তারের জন্যে ফরাসীরা তলায় তলায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। সেই চেষ্টায় একটা স্থান ছিল কলকাতারও। কলকাতায় তখন 'স্বাধীন ফরাসী'দের একটি মিশন ছিল। সেখান থেকে কিছু সংখ্যক ফরাসী অফিসারকে পাঠানো হয়েছিল ভিয়েৎনামে, প্যারাসুট দিয়ে নামানো হয়েছিল গোপন স্থানে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিছু ধরা পড়েছিল জাপানীদের হাতে, কিছু উধাও হয়েছিল ভিয়েৎ-মিনদের বন্যার মুখে! আরেকটি অগ্রবর্তী দলকে সমুদ্রপথে পাঠানো হয়েছিল সায়গনে। কিন্তু তাদের গতিবিধি গোড়া থেকেই এত নিয়ন্ত্রিত ছিল যে, তাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব ছিল না।

সে সুযোগ এলো এতদিনে। বেশ কিছু সংখ্যক বৃটিশ সৈন্য তখন সায়গনে উপস্থিত। সুতরাং বিপাকে পড়লে একেবারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মার খেতে হবে না। এতে তাদের সাহস গেল বেড়ে। স্থানীয় বৃটিশ কর্তৃপক্ষও তাদের উৎসাহ দিয়ে থাকতে পারে। সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ফরাসীরা এখন একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলতে চাইল।

ভিয়েৎনামের মানুষের পক্ষে এই ষড়যন্ত্র অনুমান করে নিতে

কোন অসুবিধা হল না। ক্রুদ্ধ ভিয়েৎমিনরা সেদিন সন্ধ্যায় ফরাসীদের আস্তানায় হানা দিয়ে প্রায় ২০০ ফরাসীকে গ্রেপ্তার করল।

তাদের এই ক্রোধ মোটেই অন্যায় বা অস্বাভাবিক ছিল না। বরং যদি এই ক্রোধের প্রকাশ আরো রক্তাক্ত পথ বেছে নিত তাহলেও অবাক হবার কিছু থাকত না।

পরে অবশ্য মার্কিন মহলের অনুরোধে—মার্কিন যুদ্ধবন্দীদের দায়িত্ব বুঝে নেবার জন্য একটি ছোট মার্কিন প্রতিনিধিদল সে সময় সায়গনে ছিল—তাদের সকলকেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু বৃটিশ ও ফরাসী চক্রান্তকারীরা সুযোগ কোনমতেই হাতছাড়া হতে দিতে চাইল না। মেজর-জেনারেল ডগলাস গ্রেসি, বৃটিশ কম্যাণ্ডার, পটস্‌ডাম সম্মেলনের নির্দেশ উপেক্ষা করে জাপানীদের দমন করার বদলে ভিয়েৎনামীদের দমন করার জন্যে অগ্রসর হলেন।

সামরিক আইন জারী করা হল। ভিয়েৎনামী খবরের কাগজগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল। ভিয়েৎমিন মিলিশিয়া ও পুলিশকে নিরস্ত্র করার জন্যে নির্দেশ গেল। সেই সঙ্গে জাপানীদের দ্বারা যে হাজার পাঁচেক ফরাসী সৈন্য অন্তরীণ হয়েছিল তাদের আবার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করা হল।

এবং শুধু তাদের নয়। যে জাপানীদের নিরস্ত্র করে দেশে ফেরত পাঠাবার দায়িত্ব নিয়ে বৃটেন এসেছিল ভিয়েৎনামে, সেই জাপানীদেরও—হ্যাঁ, সেই জাপানীদেরও—মেজর-জেনারেল গ্রেসি আবার সশস্ত্র করেছিলেন ভিয়েৎনামীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার জন্যে।

এত নির্লজ্জ, এত জঘন্য, এত ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের এত নিকৃষ্ট উদাহরণ ইতিহাসে খুব কমই আছে। দীর্ঘ, রক্তাক্ত সংগ্রামের পর যে-স্বাধীনতা ভিয়েৎনামের মানুষের করায়ত্ত হয়েছিল, তাকে রক্ষা করার নামে তাকে গ্রাস করার মধ্যে যে নিম্নস্তরের ব্যভিচারী মনোবৃত্তির পরিচয় রয়েছে, কোন সভ্য জাতির চরিত্রের সঙ্গে আমরা তাকে যুক্ত করি না।

"আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস," হো চি মিন বলেছিলেন তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণায়, "মিত্র শক্তিবর্গ, যারা তেহেরানে ও সান ফ্রান্সিসকোয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও দেশে দেশে সমানাধিকারের নীতি স্বীকার করে নিয়েছে, ভিয়েৎনামের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করবে না।"

সেই বিশ্বাস রূঢ় আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

যে মার্কিন মহল ২০০ জন ফরাসী বন্দীকে মুক্তি দেবার জন্য অনুরোধ করতে পেরেছিল, মেজর-জেনারেল গ্রেসির ঔদ্ধত্যকে বাধা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হল না।

আজ যাঁরা ভিয়েৎনাম কম্যুনিস্ট হয়ে যাচ্ছে বলে বিলাপ করছেন, যাঁরা ভিয়েৎনামে কম্যুনিজম ঠেকাবার ধর্মযুদ্ধে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের আমি ইতিহাসের এই অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছি। একটা ছোট্ট জাতি সেদিন তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। একটি জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম তাঁদের সমর্থনের জন্যে অপেক্ষা করছিল। প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেই জাতির সঙ্গে, সেই সংগ্রামের প্রতি তাঁরা অত্যন্ত নগ্নভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তারপরেও তাঁরা কি করে আশা করেন ভিয়েৎনামের মানুষ তাঁদের হাতের পুতুল, অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকবে ?

ভিয়েৎনামীদের চরিত্রে সে কথা লেখা নেই। সুতরাং তারা তা থাকেও নি।

জেনারেল গ্রেসির দমননীতি যতই প্রবল হতে লাগল, প্রতিরোধও ততই প্রবলতর হতে লাগল।

১২ সেপ্টেম্বর আরো সৈন্য—প্রায় সকলেই ভারতীয়—সায়গনে এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল গ্রেসি ভিয়েৎমিন সরকারকে উচ্ছেদের জন্যে অগ্রসর হলেন। সরকারী বাড়িগুলি ঘিরে ফেলে সেখান থেকে ভিয়েৎমিনদের বহিষ্কার করা হল। থানাগুলি দখল করে নেওয়া হল। ব্যাঙ্কের লেন-দেন বৃটিশ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে

আনা হল। দুষ্প্রাপ্য খাদ্যসামগ্রীর জন্যে রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ভিয়েৎনামীদের তা থেকে বাদ দেওয়া হল। এক কথায়, শাসনক্ষমতা দখল করার জন্যে যা যা করা দরকার সবই করা হল। এবং করা হল ফরাসীদের আবার ভিয়েৎনামে ফিরিয়ে আনবার জন্যে।

২৩ সেপ্টেম্বর সকাল হবার আগেই ফরাসী অধিনায়ক কর্নেল সেদিলের নেতৃত্বে ফরাসী সৈন্যদল হোটেল দ্য ভিল আক্রমণ করল। হোটেল দ্য ভিল ছিল স্থানীয় ভিয়েৎমিন সরকারের সদর দপ্তর।

সেদিন সায়গনের রাস্তা রক্তে প্লাবিত হয়েছিল। অতর্কিত আক্রমণে রক্ষীরা প্রত্যাঘাতের সময় পেল না। গুলি করে তাদের একে একে হত্যা করা হল। হত্যা করা হল বাড়ির অধিকাংশ লোককে। সেখান থেকে সৈন্যরা গেল জেনারেল পোস্ট অফিসে ও ফরাসী আমলের রাজনৈতিক পুলিশের দপ্তরে। সেখানেও চলল হত্যা আর হত্যা। বাড়ি বাড়ি তল্লাসী চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হল শত শত লোককে।

সকাল নটা নাগাদ দেখা গেল ত্রিবর্ণ ফরাসী পতাকা সায়গনের আকাশে আবার পত পত করে উড়ছে।

কিন্তু প্রতিরোধ দানা বাঁধতে সময় লাগে নি বেশি। সায়গনের রাস্তায় আজকের মতই হাতাহাতি লড়াই চলেছিল সেদিনও। সাধারণ ধর্মঘটে অবশ হয়ে গিয়েছিল শহরের জীবন। দোকান-পাট বন্ধ। ট্রাম-বাস নেই। রিক্সা উধাও। সায়গন যেন মৃতের শহর। কেবল মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শোনা যাচ্ছে গুলির আওয়াজ কিংবা বোমা ফাটার গর্জন।

অক্টোবরের মাঝামাঝি আরো ফরাসী সৈন্য এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ, ফরাসী ও জাপানী সৈন্যরা একযোগে সায়গনের চারপাশে আক্রমণ সুরু করল।

আরম্ভ হল খোলাখুলি যুদ্ধ। স্বাধীনতা লাভের মাসখানেকের মধ্যে ভিয়েৎনামীদের আবার নতুন করে স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ করতে হল।

পাঁচ

কাঁটার পথে আঁধার রাতে

"আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না, কারণ আমরা বাঁচতে চাই।"

সারা ভিয়েৎনামের মানুষ যেন ক্রোধে, বিক্ষোভে, প্রতিজ্ঞায় গর্জে উঠেছিল ফরাসীদের বিরুদ্ধে হো চি মিনের এই কথাগুলির মধ্যে।

হত্যা করবে? অত্যাচার করবে? পীড়ন করবে? দেখি তোমরা কত হত্যা, কত অত্যাচার, কত পীড়ন করতে পার। "আমাদের লক্ষ লক্ষ সৈনিক তৈয়ার," হো হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন, "যদি দরকার হয় তারা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেবে, প্রতিরোধ যত দীর্ঘ হোক সে প্রতিরোধ তারা চালিয়ে যাবে, তবু ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা আমরা বিপন্ন হতে দেব না, তার শিশুদের আমরা দাসত্ব থেকে উদ্ধার করবই।"

আসন্ন সংগ্রামের জন্যে দেশবাসীকে ডাক দিয়েছিলেন জাতীয়তাবাদের চারণকবি: "ভাই সব! ওরা আমাদের বাড়ি-ঘর-দোর জ্বালিয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। গ্রামের পর গ্রাম ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। এই হানাদারদের হাত থেকে আমাদের পরিবারবর্গকে, আমাদের পিতৃভূমিকে রক্ষা করতেই হবে।"

বলেছিলেন: "একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে যদি মরতেও হয় তবু একজন ক্রীতদাস হয়ে বাঁচব না, এই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা। যদি সমস্ত মানুষ এই প্রতিজ্ঞার পেছনে জড়ো হয়, তবে আমাদের কেউ ঠেকাতে পারবে না। কারণ এই লড়াই ন্যায়ের লড়াই।"

মানুষ দূরে থাকে নি এর পর। থাকতে পারে নি। এসেছিল কৃষক, মজুর, কর্মচারী, ছাত্র ও অধ্যাপক, ব্যবসায়ী, সৈনিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবী। ফরাসীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, মিত্রশক্তির জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সেদিন ভিয়েৎনামে জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার এসেছিল, তাতে রাজনীতির কোন ছাপ, নরমপন্থী-চরমপন্থী, কম্যুনিস্ট-অকম্যুনিস্ট ভেদাভেদের কোন স্থান ছিল না। এক-লক্ষ্য, এক-মন ও এক-ব্রত হয়ে ভিয়েৎনামের মানুষ ফরাসীদের উৎখাতের জন্যে হো চি মিনের নেতৃত্বে প্রস্তুত হয়েছিল।

কাঁটার পথে, আঁধার রাতে সেদিন তাদের সঙ্গে ছিল না কেউ, কোন বাইরের সম্বল। কার ওপর নির্ভর করতে পারত তারা? চীন? এক প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধে সে নিজেই তখন বিপর্যস্ত, অপরকে সাহায্য করবে কি।

রাশিয়া? একটি মুক্তি-সংগ্রামী দেশের প্রতি তার সমর্থন এতই জোরালো ছিল যে হো চি মিনের গণতান্ত্রিক রিপাবলিককে স্বীকৃতি দেবার আগে তাকে পাঁচ বছর ধরে ভাবতে হয়েছিল। লেনিনের যে রাশিয়ার কাছ থেকে তিনি এই সংগ্রামের প্রেরণা পেয়েছিলেন, এই আচরণের পর তার সম্পর্কে হো'র কোন মধুর ধারণা থাকার কথা নয়।

আর ফরাসী কম্যুনিস্ট? ভিয়েৎনামীরা ফরাসী কম্যুনিস্টদের আগে ঔপনিবেশিক ও পরে কম্যুনিস্ট বলে মনে করত। ওরা কী করে ভুলবে যে, সায়গনে ওই সময় যে কুড়িজন ফরাসী কম্যুনিস্ট ছিল, তাদের মধ্যে মাত্র একজনের সহানুভূতি ছিল ভিয়েৎনামী সংগ্রামের প্রতি, এবং তারা এই সংগ্রামে চুপ করে থাকবার জন্যে ফরাসী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় এসেছিল?

সুতরাং হো চি মিনকে সেদিন তাঁর নিজের শক্তির ওপরই নির্ভর করতে হয়েছিল, তার স্বদেশবাসী ভাই-বোনেদের মিলিত শক্তির ওপর। এটা তাদেরই সংগ্রাম, কাজেই তাদেরই জয় করতে

হবে। আর কেউ এসে তাদের জন্যে জয় করে দিয়ে যাবে না। এটা তিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন। তাই কোন্ দল কোন্ পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে এটা তাঁর কাছে আর বড় ছিল না। স্বাধীন মানুষ, শোষিত মানুষ, অত্যাচারিত মানুষ তাদের জাতীয় মুক্তির জন্যে লড়াই করছে এটাই ছিল একমাত্র সত্য।

সেই সত্যের উপলব্ধি থেকেই তাঁর দীর্ঘ, নিঃসঙ্গ অভিযান আরম্ভ করার প্রাক্কালে জাতীয়তাবাদী ছাড়া আর কোন পরিচয় তিনি নিজের জন্যে রাখতে চান নি। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে, প্রায় পনেরো বছর পর, তিনি ভিয়েৎনাম কম্যুনিস্ট পার্টির পৃথক অস্তিত্ব ভেঙে দিয়েছিলেন।

"এখন থেকে আমার দেশই হল আমার দল," তিনি বলেছিলেন। "আমার কার্যসূচী হল দেশের স্বাধীনতা।"

এখন থেকে দল ও মত নির্বিশেষে সকলের একমাত্র পরিচয় হল তারা জাতীয়তাবাদী। এবং এখন থেকে দল ও মত নির্বিশেষে দেশের মানুষ সামিল হ'তে লাগল এই জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সঙ্গে। যাদের সংশয় ছিল তারা সংশয়মুক্ত হল। যাদের দ্বিধা ছিল তাদের দ্বিধা কেটে গেল। যারা পেছনের সারিতে ছিল তারা সামনে এগিয়ে এল। যারা ছিল সাধারণ ছা-পোষা মানুষ, তারাই হয়ে উঠল অসাধারণ যোদ্ধা। যা ছিল একদল অসমসাহসী মানুষের বিদ্রোহ, তা হয়ে উঠল সমগ্র জাতির অপ্রতিরোধ্য সংগ্রাম।

লড়াই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। সায়গনের বিমানঘাঁটিতে রয়াল এয়ারফোর্সের পেট্রোলের ডিপোগুলি উড়ে গেল গেরিলাদের বোমায়। সায়গনের ফরাসী এলাকাটি ঘিরে ফেলল তারা। শহরে আসবার সমস্ত সড়ক ও সড়ক-সেতু কেটে দেওয়া হল।

এইভাবে আসার ও যাওয়ার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে সেদিন রক্তাক্ত প্রতিশোধ নিয়েছিল গেরিলারা ফরাসীদের ওপর।

অক্টোবরের গোড়ার দিকে একটি সাঁজোয়া ও দু'টি পদাতিক রেজিমেণ্ট এবং একটি কম্যাণ্ডো ব্যাটেলিয়ান ফরাসী সৈন্য এসে পৌঁছল। সেই সঙ্গে এসে পৌঁছলেন লে ক্লার্ক, একজন স্বাধীন ফরাসী জেনারেল। তিনি এসেই জাপানী, ভারতীয় ও বৃটিশ সৈন্যদের পুরোপুরি লাগিয়ে দিলেন কাজে।

ক্রমে সায়গন থেকে গেরিলারা ছড়িয়ে পড়ল গ্রামাঞ্চলে, সায়গন নদের ব-দ্বীপ এলাকায়, জলায়, জঙ্গলে আর পাহাড়ে। সেখানে তারা আত্মগোপন করল।

লে ক্লার্কের ছিল সাঁজোয়া গাড়ি, আর তাঁদের দখলে ছিল সুন্দর, বাঁধানো, দূরপাল্লার সড়কগুলি। সেই সড়ক বেয়ে লে ক্লার্ক এক শহর থেকে অন্য শহরে যেতে লাগলেন, এবং এইভাবে একদিন ষোড়শ সামন্তরালের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলেন।

তিনি ভাবলেন, গোটা দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে তিনি ভিয়েৎমিন গেরিলাদের তাড়িয়ে ছেড়েছেন।

কিন্তু তিনি জানতেন না, শহরে থেকে সম্মুখ সমরে লোকক্ষয় করার প্রয়োজন গেরিলাদের ছিল না। গেরিলা যুদ্ধের নীতিই তাই। লে ক্লার্ক যখন শহরগুলি দখল করে আত্মসন্তুষ্ট হচ্ছিলেন, তখন গেরিলারা গ্রামাঞ্চলে নিজেদের সংগঠিত করছিল।

দক্ষিণে গেরিলাদের নেতা ট্রান ভান ইয়াউ'র প্রথম কাজ হল গেরিলাদের ছোট ছোট প্ল্যাটুনে ভাগ করে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া। সেই সঙ্গে সংগ্রহ করা হ'তে লাগল আঞ্চলিক সৈন্য। গ্রামে গ্রামে তৈরি হল মিলিশিয়া। একটি ভিয়েৎমিন নিরাপত্তা বাহিনীও গঠিত হল যার ওপর বিশেষ দায়িত্ব ছিল সম্ভাব্য পঞ্চম বাহিনীর লোকেদের ওপর নজর রাখার।

এবং গঠিত হল বিশেষ বিশেষ কম্যাণ্ডো বাহিনী, সুইসাইড স্কোয়াড, গেরিলা লড়াইয়ে এর পর থেকে যা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে লাগল।

যেরকম দ্রুত গতিতে ভিয়েৎমিনরা তখন তাদের স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করত এবং এখনও ভিয়েৎকংরা করে থাকে, তা রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার। তাদের উচ্চমানের সংগঠন শক্তি ও গভীর জনপ্রিয়তা ছাড়া আর কোনভাবে এই সাফল্যের ব্যাখ্যা করা যায় না।

মার্কিন মুখপাত্রেরা, যাঁরা অনেক আগে থেকেই দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সরকারী সৈন্যদের ট্রেনিং দেবার কাজে লিপ্ত আছেন, নিজেরাই সেকথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। "ওরা এক-একজন আনাড়ীকে ধরে আনে এবং কয়েক মাস পরে তারা বেরিয়ে আসে যেন এক-একটি বাঘ। আর আমাদের অনিচ্ছুক সৈন্যরা ছ' মাস ট্রেনিং নেবার পরেও অনিচ্ছুক সৈন্যই থেকে যায়।"

ওদিকে ষোড়শ সমান্তরালের উত্তরে জেনারেল গিয়াপও প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বাক কান, কাও বাং, লাং সন, হা ইয়াং, তুয়েন কোয়াং ও তাই ন্গুয়েন এই ছ'টি প্রদেশে ভিয়েৎমিনদের প্রাধান্য আগেই স্থাপিত হয়েছিল। গিয়াপ এখন ওই বিরাট এলাকা জুড়ে তাঁর মূল ঘাঁটি স্থাপন করলেন। পাহাড়ে পাহাড়ে গুহা কেটে বা বড় করে স্থাপিত হল কোথাও অফিস, কোথাও রসদের ভাণ্ডার, কোথাও বা ওয়ার্কশপ, ফ্যাক্টরী ও স্কুল। ওই সব গুহা ছিল এত দুর্ভেদ্য ও সংগুপ্ত যে বাইরের কারো পক্ষে সেগুলি খুঁজে বার করা সম্ভব ছিল না। সেখানে জঙ্গল এত গভীর যে যদি কোন ব্যাটেলিয়ন সেখান দিয়ে রুট মার্চ করেও যায়, তবু দূর থেকে তা বোঝার উপায় নেই। সেখানকার ভূগোল ছিল এত অনুকূল যে তা রক্ষা করতে খুব বেশি প্রয়াসের দরকার ছিল না।

আর সেখানকার মানুষের সর্বাত্মক সমর্থন ছিল ভিয়েৎমিনদের প্রতি।

গেরিলাদের পক্ষে এর চাইতে আদর্শ পরিস্থিতি আর হ'তে পারে না। গিয়াপ তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। সেইখানে নিভৃত, নিরুপদ্রব শান্তিতে তিনি তাঁর "আঞ্চলিক" সৈন্যদের নিবিড় ট্রেনিং দিয়ে "নিয়মিত" গেরিলায় পরিণত করতে লাগলেন।

সেই সঙ্গে দ্বিতীয় আরেকটি ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুললেন রেড রিভারের ব-দ্বীপ এলাকায়, তান হোয়া, নে আন ও হা তিন প্রদেশ নিয়ে। সমুদ্রের কাছে থাকায় এই এলাকাটিও ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই সময় গিয়াপের নিয়মিত সৈন্যের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজারের মত। তাদের জন্যে যে সব অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হত, তা আমদানী করা হত আশেপাশের দেশ থেকে ওই সমুদ্রপথ দিয়ে।

এইভাবে উত্তরে ও দক্ষিণে ভিয়েৎমিন প্রস্তুতি যখন সাঁড়াশীর চাপ সৃষ্টি করে চলছিল, তখন লে ক্লার্ক ভাবছিলেন তিনি দেশটাকে বাগে আনতে পেরেছেন।

তাঁকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে চরে খাবার জন্যে সায়গনে বসিয়ে দিয়ে বৃটিশ সৈন্যরা ইতিমধ্যে প্রস্থান করেছিল। এখন তিনি নিজের অবাধ ক্ষমতাকে ইচ্ছামত প্রয়োগ করবার জন্যে অগ্রসর হলেন।

স্বভাবতই ষোড়শ সমান্তরাল পর্যন্ত এসে থেমে থাকতে তিনি রাজী হলেন না। তিনি চাইলেন ফরাসী শাসন টংকিনেও সম্প্রসারিত হোক।

সেই সুযোগ এলো ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন জাতীয়তাবাদী চীনও হো চি মিনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবৃত্ত হল। ফ্রান্সের সঙ্গে এক বোঝাপড়ার মাধ্যমে কুয়োমিণ্টাংরা রাজী

হল টংকিন থেকে সরে যেতে। তারা এই কথাও বলল যে, তাদের শূন্যস্থান ফরাসীরা পূরণ করতে পারে।

লে ক্লার্ক এর চাইতে ভালো কিছু আশা করতে পারতেন না। একটি ষড়যন্ত্র তাঁকে সায়গনে গদিয়ান করেছিল, আর একটি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি হ্যানয়ে অধিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি জাহাজ বোঝাই করে তিনি একদল ফরাসী সৈন্য রওনা করে দিলেন। ৬ মার্চ তাদের নিয়ে জাহাজ নোঙর ফেলল হাইফং বন্দরে।

কিন্তু লে ক্লার্ক সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারলেন যে, কাজটা যত সহজ হবে মনে করেছিলেন আসলে ততটা সহজ নয়।

হাইফং ছিল ভিয়েৎমিনদের রেড রিভার ব-দ্বীপ ঘাঁটির একটা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। তাদের প্রস্তুতিও ছিল ব্যাপক। হাইফং দিয়েই প্রধানত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ আমদানী হ'ত বাইরে থেকে। তাই গেরিলাদের সম্বলও এখানে কিছু কম ছিল না।

তীরে তৈরী ছিল গেরিলারা। ফরাসী সৈন্যরা ডাঙায় ওঠবার জন্যে যেই জাহাজ ছেড়ে নামল, অমনি ভিয়েৎমিন কামান গর্জে উঠল একসঙ্গে।

এই আক্রমণের জন্যে ফরাসীরা প্রস্তুত ছিল না। থমকে দাঁড়াল যারা নামবার চেষ্টা করছিল। যারা নেমেছিল তাদের রক্তে রাঙা হয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ চীন সমুদ্রের জল।

প্রথম বিহ্বলতাটুকু কেটে যাবার পর ফরাসীরাও আক্রমণ স্নুরু করেছিল জাহাজ থেকে। এদিকে তীর থেকেও গোলাবর্ষণের বিরাম নেই। দক্ষিণ চীন সমুদ্রের জল টাল-মাটাল। টাল-মাটাল বুঝি গেরিলাদের প্রতিরোধের সঙ্কল্পও। ওরা প্রাণপণে ফরাসী সৈন্যদের বাধা দিয়েছিল। নামতে দেয় নি যতক্ষণ সাধ্য ছিল। এবং সাধ্য তাদের ছিল বহুক্ষণ।

সেদিন ফরাসী সৈন্যরা শেষ পর্যন্ত হাইফংয়ের মাটিতে অবতরণ করেছিল ঠিকই, কিন্তু সেই অবতরণ ছিল বিভীষিকাময়। এবং ওই অবতরণ একটুও দমন করতে পারে নি ভিয়েৎমিন প্রতিরোধের শক্তিকে। সঙ্গে সঙ্গে আরো সৈন্য এনেছিলেন লে ক্লার্ক, আরো অস্ত্রশস্ত্র, কিন্তু দশ দিন, পুরো দশ দিন তাদের আটকে থাকতে হয়েছিল হাইফংয়ে।

আটকে হয়ত থাকতে হত আরো বহুদিন যদি না বিপর্যস্ত ফরাসী কর্তৃপক্ষ দশ দিন পর যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করতে এবং হো চি মিনের সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আসতে রাজী হতেন।

এই চুক্তিতে ফরাসীদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন, জাঁ সাঁতেনি এবং ভিয়েৎমিনদের পক্ষে হো চি মিন ও ভু হুয়ং কান। ফরাসী সরকার এর দ্বারা হো'র ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরিবর্তে হোও রাজী হয়েছিলেন ইন্দোচীন ফেডারেশন ও ফরাসী ইউনিয়নের অংশ হিসেবে থাকতে। টংকিন, আন্নাম ও কোচিন চীন এই তিনটি অংশের একত্রীকরণ সম্পর্কে স্থির হয়েছিল যে, গণভোটের দ্বারা জনসাধারণের রায়েই তা নির্ধারিত হবে।

সেই সঙ্গে আরও ঠিক হয়েছিল যে, উত্তর ভিয়েৎনাম ও চীনের সীমান্ত বরাবর কয়েকটি নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে ফরাসীদের মোতায়েন থাকতে দেওয়া হবে।

হো চি মিনের পক্ষে ফরাসীদের বিশ্বাস করে এই চুক্তি করা সঙ্গত হয়েছিল কি না তা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকতে পারে। তবে চুক্তি যে তিনি করেছিলেন, এবং গণভোট সাপেক্ষে ফরাসী সৈন্যদের যে আবার টংকিনে প্রবেশ করতে দিয়েছিলেন, এ থেকেই সন্দেহবাতিকগ্রস্ত পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর, বিশেষ করে আমেরিকার বোঝা উচিত যে, কোন বিজাতীয় মতলব হো চি মিনের ছিল না।

বরং বদ মতলব ছিল ফরাসীদেরই। এই চুক্তি যে তারা

নিজেদের কাজ গোছাবার জন্যেই করেছিল এবং হো চি মিনের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তলায় তলায় তাঁর সর্বনাশের জন্যে চেষ্টা করে যাওয়াই যে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, সেটা কয়েক মাসের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

চুক্তির সর্ত ও সীমা লঙ্ঘন করে তারা একের পর এক গ্যারিসন পোস্টগুলি দখল করে নিতে লাগল। এলো সৈন্য, এলো রসদ অবারিত ধারায়। টংকিনে ফরাসী সামরিক শক্তি দ্রুত উদ্বেগজনকভাবে গড়ে উঠতে লাগল। উদ্বিগ্ন হলেন হো, চিন্তিত হলেন গিয়াপ। তাঁরা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, তাঁদের ভালো-মানুষীর সুযোগ নিয়ে ফরাসীরা যতগুলি সম্ভব ঘাঁটি দখল করে টংকিনে ক্ষমতা দখলের জন্যে তৈরি হচ্ছে।

আরও একবার হো বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হলেন।

এর পর আর এই চুক্তি মেনে চলার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। ফরাসীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এই চুক্তিকে চোথা কাগজে পরিণত করেছিল। সুতরাং নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই হো'র পক্ষে এই চুক্তি সম্পর্কে সতর্ক না হয়ে উপায় ছিল না। বিশ্বাসঘাতকের কথার ওপর আস্থা অব্যাহত রেখে দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন হতে দেবার জন্যে নিশ্চয়ই তিনি এই সংগ্রাম গড়ে তোলেন নি।

ঘাঁটি দখলের ব্যাপার নিয়ে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ আগেই সুরু হয়েছিল। এবার প্রত্যাঘাত পুরোদস্তুর আরম্ভ হয়ে গেল।

ফরাসীদের অনেকদিনের চেষ্টা ছিল হাইফং বন্দরের ওপর তাদের আধিপত্য কায়েম করার। কারণ এই বন্দর শুধু যোগাযোগের একটি প্রধান সূত্রই নয়, টংকিন ও আন্নামের প্রায় মাঝামাঝি হওয়ায় এখান থেকে ওই দুটি এলাকায় প্রভুত্ব বিস্তার করা সহজ। নিঃসন্দেহে এই বন্দরটি হাতে ছিল বলেই ভিয়েৎমিনরা ওই সময় ফরাসীদের ওপর এতটা প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছিল।

অক্টোবরের মাঝামাঝি ফরাসী সৈন্যরা হাইফংয়ের কাস্টম্‌স দপ্তরটি দখল করে নিল। ফরাসীদের পক্ষে এটি ছিল মস্ত লাভ, কারণ কাস্টম্‌সের ব্যাপারটা নিজেদের হাতে চলে আসার পর ভিয়েৎমিনদের অস্ত্রশস্ত্র আমদানী নিয়ন্ত্রণ করতে কোন অসুবিধা ছিল না।

বিস্ফোরণ এলো সেই নিয়েই। ২০ নভেম্বর ১৯৪৬ সাল।

ছোট্ট একটি ডিঙ্গি নৌকা সেদিন ভিয়েৎমিনদের জন্যে কিছু অস্ত্র নিয়ে আসছিল বন্দরে। খবর পেয়েই কর্নেল দেবে, হাইফংয়ে ফরাসীদের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, নির্দেশ দিলেন নৌকা আটক কর।

একটি টহলদার বোট সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেল ডিঙ্গির গতিরোধ করবার জন্যে।

গুলির আওয়াজে জবাব এলো ডিঙ্গি থেকে।

"কর্নেল দেবের আদেশ, ডিঙ্গি থামাও, নইলে বিপদ হবে।" বোট থেকে চিৎকার করে জানালো ফরাসী সৈন্যরা।

এবার জবাব এলো পেছন থেকে, এবং এবারও গুলির আওয়াজে। ফরাসীরা চকিতে পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখল একদল ভিয়েৎমিন আঞ্চলিক সৈন্য দ্রুত এগিয়ে আসছে। প্রতিরোধের জন্যে তৈরী হবার আগেই তারা অতি সহজেই ধরা পড়ে গেল ওই সৈন্যদের হাতে।

কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই মেটে নি। কারণ কর্নেল দেবে মেটাবার জন্যে ইচ্ছুক ছিলেন না। দুরাত্মার যেমন ছলের অভাব হয় না, তেমনি তাঁরও সেদিন ছলের অভাব হয় নি। কয়েকজন ফরাসীর গ্রেপ্তারকে উপলক্ষ্য করে তিনি তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন ভিয়েৎমিনদের ওপর ঢালাও আক্রমণ চালাবার জন্যে।

হাইফংয়ের মানুষ এই ঔদ্ধত্য নীরবে মেনে নেয় নি সেদিন। ওরা বেরিয়ে এসেছিল হাজারে হাজারে। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী করেছিল। সেই সব ব্যারিকেড পাহারা দেবার জন্যে

ভিয়েৎমিন নিয়মিত সৈন্যরা দাঁড়িয়ে গেল মর্টার নিয়ে। গোলায় গোলায় ফরাসী বাহিনী নিদারুণভাবে জর্জরিত হল। রাস্তার পর রাস্তা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল। সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে আঘাত হানল ফরাসীরা। কিন্তু সাধারণ মানুষের মিলিত প্রতিরোধের সামনে ফরাসী সাঁজোয়া শক্তিও এতটুকু অগ্রসর হতে পারে নি।

সম্মুখ সমরে ব্যর্থ হয়ে কাপুরুষ দেবে তাই পেছনের দরজা দিয়ে শোধ নেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিন দিন পর। ভিয়েৎমিনদের তিনি চরম পত্র দিয়ে বললেন হাইফং ছেড়ে চলে যেতে হবে। মেয়াদ মাত্র দু'ঘণ্টা। কিন্তু ওই দু'ঘণ্টা সময় পার হ'তে দেবার মত ধৈর্যও দেবের ছিল না। হাইফং বন্দরে হাজির ছিল একটি ফরাসী ক্রুজার। 'সুফ্রাঁ'। মেয়াদ শেষ হবার আগেই ক্রুজার সুফ্রাঁ থেকে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল শহরের ওপর। উন্মত্ত, অন্ধ গোলাবর্ষণ। যেন শহরের ভিয়েৎনামী অঞ্চলকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়াই কর্নেল দেবের উদ্দেশ্য।

অন্তত ৬ হাজার ভিয়েৎনামী এই অভাবিত আক্রমণে নিহত হয়েছিল। আহত হয়েছিল এর দ্বিগুণ।

কিন্তু তবু ভিয়েৎমিন বাহিনীকে তাদের জায়গা থেকে নড়ানো যায় নি একটুকু। হাইফং বিধ্বস্ত হয়েছিল, তবু কর্নেল দেবের করায়ত্ত হয় নি সঙ্গে সঙ্গে। মৃতদেহ আর ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে ফরাসীরা যখন শহরের দখল নেবার জন্যে ঢুকছিল, তখন ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে তাদের জানিয়ে দিয়েছিল যে, প্রতিরোধ এখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

আরো পাঁচদিন ওরা লড়াই করেছিল হানাদারদের বিরুদ্ধে। পাঁচদিন পরে যখন আর সাধ্যে কুলালো না, তখন ওরা শহর থেকে সরে এলো, ছড়িয়ে পড়ল গ্রামাঞ্চলে।

হাইফংয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ফরাসীরা এবার নজর দিল

হ্যানয়ের দিকে। ৬ মার্চের চুক্তির সুযোগে একদল ফরাসী সৈন্য আগেই হ্যানয়ে উপস্থিত হয়েছিল। ১৯ ডিসেম্বর তারা হো চি মিনকে জানালো, ভিয়েৎমিন সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে হবে।

বোঝা গেল ওরা কী চায়।

"ভাই সব!" পরের দিন দেশবাসীর উদ্দেশে এক আবেদনে বলেছিলেন হো, "আমরা শান্তি চেয়েছিলাম, তাই ফরাসীদের কিছুটা সুবিধা দিতে কুণ্ঠিত হইনি। কিন্তু আমরা যতই সুবিধা দিয়েছি ওরা ততই পেয়ে বসেছে। ওরা এখন আবার আমাদের দেশ আক্রমণ করতে চায়।······

"কিন্তু আমরা তা হতে দেব না। ভাই সব, আপনারা জাগুন, উঠুন।···যাঁদের হাতে রাইফেল আছে তাঁরা রাইফেল ছুঁড়ুন। যাঁদের হাতে তরোয়াল আছে তাঁরা চালান তরোয়াল। আর যাঁদের এসব কিছুই নেই তাঁরা কোদাল, লাঠি যা পারেন তা নিয়েই হানাদারদের ঠেকান। দেশকে বাঁচান!"

বেলা এগারোটা নাগাদ তিনি কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। জাপানীরা এর আগে যেভাবে ফরাসী সৈন্যদের তাদের ব্যারাকে নিরস্ত্র করে বন্দী করেছিল, এবার তাঁদেরও তাই করতে হবে। ফরাসী বিষদাঁত সমূলে উৎপাটিত করতেই হবে।

খবর দিলেন গিয়াপকে। বললেন, গিয়াপ যেন যতগুলি সম্ভব ইউনিটকে সজ্জিত করে শহরে হাজির রাখেন। সেই সঙ্গে স্থানীয় ফরাসীদের জানিয়ে দিলেন যে, ভিয়েৎমিন সরকার ফরাসীদের গতিবিধির ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করছেন। ফরাসী সৈন্যরা ইচ্ছা করলে ব্যারাক ছেড়ে শহরে অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারে।

হো'র পরিকল্পনা ছিল এই রকম : নিয়ন্ত্রণ শিথিল করায় ফরাসীরা স্বভাবতই আমোদ-ফুর্তির জন্যে বাইরে বেরিয়ে আসবে। আর যারা ব্যারাকে থাকবে তারাও থাকবে ছুটির মুডে। সুতরাং ভিয়েৎমিনদের সুপরিকল্পিত আক্রমণ রোধ করার শক্তি তাদের থাকবে না।

বেলা দুটো নাগাদ গিয়াপ খবর দিলেন তাঁর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ।

রাত তখন আটটা। ব্যারাকগুলিতে লোকজন বিশেষ ছিল না। যারা ছিল তারাও তখন খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত। ওই সময় ভিয়েৎমিনরা অতর্কিতে তাদের আক্রমণ শুরু করল।

প্রথমে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে উড়ে গেল পাওয়ার হাউস। হ্যানয় ডুবে গেল অন্ধকারে। তারপর একে একে বোমা ফাটল ফরাসী বাড়িগুলিতে, অনেকগুলি দখল করে নিল গেরিলারা। তার পর চড়াও হল ব্যারাকগুলিতে। প্রচণ্ড হাতাহাতি লড়াইয়ে বহু ফরাসী নিহত হল, আহত হল আরো অনেক।

কিন্তু প্রত্যাঘাত আসতে বেশি দেরী হল না। কারণ শেষ মুহূর্তে একজন মীরজাফরের মারফত ফরাসী কর্তৃপক্ষ হো'র পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছিলেন। ভিয়েৎমিন বাহিনী যখন ব্যারাকগুলি আক্রমণ করছিল তখন যেসব ফরাসী সৈন্য বাইরে ছিল তারা খবর পেয়ে ফিরে আসছে।

পরাজয় চূড়ান্ত হবার আগেই তাই ফরাসীরা সামলে নিতে পেরেছিল। এবং তারপর যে পাল্টা আক্রমণ করেছিল তা ছিল হাইফংয়ের আক্রমণের মতই সমান উন্মত্ত। তাদের হাতে ছিল ট্যাঙ্ক, এবং ছিল বিমান। সেই আক্রমণের মুখে ভিয়েৎমিন বাহিনী বাধ্য হয়েছিল পিছু হটতে। তা সত্ত্বেও চূড়ান্তভাবে পশ্চাদপসরণ করার আগে আরেকবার রুখে দাঁড়িয়েছিল তারা। হ্যানয়ের চীনা এলাকায়। ফরাসীদের অগ্রগতি কিছুদিন তারা ঠেকিয়ে রেখেছিল সেখানে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে নি।

কিন্তু এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কারণ ফরাসীদের হাতে ছিল আধুনিক, উন্নত এবং অপর্যাপ্ত অস্ত্রসম্ভার। আর ভিয়েৎমিনদের সম্বল তখনও ছিল সীমিত। সম্মুখ সমরে তাই তাদের পক্ষে পেরে ওঠা ছিল অসুবিধাজনক।

গেরিলা যুদ্ধের নীতিও যতদূর সম্ভব সামনা-সামনি লড়াই এড়িয়ে

যাবারই পরামর্শ দেয়। কারণ এতে লোকক্ষয় প্রচুর, সুবিধা প্রায় কিছুই হয় না। হো চি মিনও এতদিন সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়েই এসেছিলেন। কিন্তু ফরাসীরা যখন হাইফং দখল করতে উদ্যত হল, তখন তিনি বাধা না দিয়ে পারেন নি। কেন না হাইফং ছিল তাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তা ছাড়া, তিনি ভেবেছিলেন, টংকিনে ফরাসীরা তখনও স্থিতিশীল হতে পারে নি। সুতরাং এই মুহূর্তে আঘাত করলে তাদের পর্যুদস্ত করা সম্ভব। আর হ্যানয় ছিল ভিয়েৎমিনদের রাজধানী। তাকে রক্ষা করতে চাওয়ার একটা মনস্তাত্ত্বিক মূল্যও ছিল।

কিন্তু এখন বুঝতে পারলেন হো যে, শহর রক্ষার জন্যে শক্তি ক্ষয় ক'রে কোন লাভ নেই। তাদের সম্বল সীমাবদ্ধ, কাজেই সেই সম্বলকে হিসাব করে খরচা করতে হবে। সেই সঙ্গে আরো অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করতে হবে, সৈন্যদের ট্রেনিং আরো নিখুঁত করতে হবে। এক কথায়, নিজেদের আরো ভালোভাবে সংগঠিত করতে হবে। এবং করতে হবে গ্রামাঞ্চলে। কারণ গ্রামাঞ্চলে ফরাসীদের প্রভাব প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অপরপক্ষে ভিয়েৎমিনদের সেখানে অবাধ রাজত্ব। গ্রামাঞ্চল যদি পুরোপুরি দখলে আনা যায় তাহলে শহরগুলি ফরাসীদের অধিকারে থাকলেও কোন ক্ষতি নেই।

"শিকড় যদি শক্ত না হয় তবে
গাছ বাঁচতে পারে না বেশিদিন ;
দেশের মানুষ যদি ভিত্তি হয়
জয়ের সৌধ তবেই রচিত হতে পারে।"

হো এক সময় একটি কবিতায় লিখেছিলেন এই কথা। এখন তিনি সেই ভিত্তি রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

লোকজন ও দপ্তরগুলি গুটিয়ে নিয়ে ভিয়েৎমিনরা আবার ফিরে গেল উত্তর টংকিনের প্রত্যন্ত জঙ্গলে, পাহাড়ে, চুণা পাথরের গুহার অভ্যন্তরে।

১৯৪৭, ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ এই তিন বছর ধরে চলল ভিয়েৎমিন শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ ও স্থিতিশীল করার প্রয়াস। চলল গ্রামে গ্রামে নিজেদের দুর্ভেদ্য করে প্রতিষ্ঠিত করার নিরলস সাধনা।

ক্ষেত্র আগেই প্রস্তুত হয়েছিল, সুতরাং কাজ আরম্ভ করতে কোন অসুবিধাই হল না। ভিয়েৎমিনরা শুধু অস্ত্র আর সৈন্য সংগ্রহই করে নি, চাষের উন্নতির জন্যে হাতে-কলমে কাজ করেছিল মাঠে। জীর্ণ হয়ে পড়েছিল যেসব বাঁধ সেগুলি তারা সারিয়ে দিয়েছিল। বাতিল করেছিল কুখ্যাত পোল ট্যাক্স, লাঘব করেছিল অন্যান্য করের বোঝা। মানুষকে বাঁচিয়েছিল অনাহারের হাত থেকে, এমন কি তাদের জীবনের মানও উন্নত করতে পেরেছিল কিছুটা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ওরা মানুষকে দিয়েছিল গণতান্ত্রিক অধিকার। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারিতে হো চি মিনের অস্থায়ী কোয়ালিশন সরকারকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্যে জাতীয় পরিষদের যে নির্বাচন হয়েছিল তাতে ভিয়েৎনামের ইতিহাসে সেই প্রথম সাধারণ মানুষ ভোট দিয়েছিল। এ বড় কম কথা নয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ভিয়েৎমিনদের সাফল্য ছিল এক কথায় চমকপ্রদ। ওদের অসুবিধা ছিল অনেক। তার ওপর যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হত প্রতি মুহূর্তে। তা সত্বেও দুই বছরের মধ্যে প্রায় চল্লিশ লক্ষ মানুষকে ওরা শিখিয়েছিল লিখতে পড়তে। কোন কোন গ্রামে—এমন গ্রাম ছিল অনেক—অশিক্ষার 'অ' বলতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না।

এখন সেই কাজকেই বৃহত্তর সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবার জন্যে তৎপর হল তারা। ১৯৪৯ সাল নাগাদ সাক্ষরের সংখ্যা গিয়ে পৌঁছল ৬৫ লক্ষে। এবং ওই বছরই কৃষকদের দেওয়া হল জমির অস্থায়ী অধিকার। বহু শতাব্দীর শোষণ ও অত্যাচারের ইতিহাসের পর এই সংস্কার ভিয়েৎমিনদের সামনে জনপ্রিয়তার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল।

হো চি মিনের নির্দেশ ছিল কড়া এবং স্পষ্ট। জমির বা ফসলের ক্ষতি হতে পারে কিংবা মানুষের ঘরবাড়ি ও বিষয়সম্পত্তি নষ্ট হতে পারে এমন কিছু করা চলবে না। সাধারণ মানুষ যা স্বেচ্ছায় বিক্রি করতে বা ধার দিতে রাজী হবে না তা কেনা বা ধার করা চলবে না। পাহাড়ী মানুষের সংস্কারে যাতে আঘাত না লাগে সেজন্য কোন পাহাড়ীর বাড়িতে জ্যান্ত মুরগী নিয়ে যাওয়াও নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ কথা দিয়ে কথার খেলাপ করাও। মানুষের ধর্মে ও সামাজিক প্রথায় আঘাত দেওয়া তো একেবারেই বারণ: যেমন, ঠাকুর বেদীর সামনে কেউ শোবে না, উনুনের ওপর পা তুলতে পারবে না, বাড়িতে গান-বাজনা করা চলবে না, ইত্যাদি। এমন কোন কথা বলা বা এমন কোন কাজ করা চলবে না যাতে লোকে মনে করে তাদের ঘৃণার বা অনুকম্পার চোখে দেখা হচ্ছে।

অপর পক্ষে মানুষের দৈনন্দিন কাজেকর্মে যেমন—ফসল কাটায়, জ্বালানী কাঠ জোগাড় করে আনায়, জল তোলায়, সেলাইয়ের কাজে, সাহায্য করতে হবে। যাদের বাড়ি থেকে বাজার অনেক দূরের পথ তাদের হয়ে যখনই সম্ভব কেনা-কাটা করে দিতে হবে। জাতীয় লিপির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে লোকের, প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল করে তুলতে হবে। ধীরে ধীরে, গভীর সহানুভূতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের মন থেকে কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করতে হবে। নিজেরা যে নির্ভুল, পরিশ্রমী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ তা শুধু দেখালে চলবে না, সব সময় কাজে তার প্রমাণ দিতে হবে।

এই নির্দেশ থেকে একচুলও বিচ্যুত হবার উপায় ছিল না কারো। শৃঙ্খলা এবং নিয়ম অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হত। এর মধ্যে যদি কেউ রেজিমেণ্টেশানের গন্ধ পান তবে তিনি তা পেতে পারেন, কিন্তু ভিয়েৎমিনরা যে সংগ্রামে নেমেছিল তাতে

কোন রকম শৈথিল্যের স্থান ছিল না। অতন্দ্র, নিরলস প্রয়াসই ছিল তাদের সাফল্যের মূল মন্ত্র।

এইভাবে জনপ্রিয়তার একটা দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করার পর হো চি মিন তাঁর সামরিক প্রয়াসকে সংহত করার দিকে নজর দিলেন। কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা তিনি যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন তা-ই ভবিষ্যতে ভিয়েৎমিনদের দুর্বার, দুর্মর ও অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল, ফরাসীর পর্যুদস্ত সাম্রাজ্যবাদের ওপর বিপ্লবের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিয়েছিল। ভিয়েৎমিনদের উত্তরসাধক ভিয়েৎ-কংরা প্রতিরোধের যে ভাস্বর, গৌরবময় ও বীরত্বপূর্ণ পরিচয় দিনের পর দিন দিয়ে চলেছে, তার রহস্যের সূত্রও খুঁজতে হবে ওই ব্যবস্থার মধ্যেই।

হো চি মিন প্রথমে চোদ্দটি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করেছিলেন দেশটাকে এবং প্রত্যেক অঞ্চলের জন্যে একটি কমিটি, একজন কম্যাণ্ডার ও একজন রাজনৈতিক অফিসার নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু কর্তৃত্বকে আরো কেন্দ্রীভূত ও ব্যবস্থাকে আরো দৃঢ়নিবদ্ধ করার জন্যে কাঠামোর কিছু পরিবর্তন করলেন।

এবার দেশ বিভক্ত হল ছ'টি আন্তঃ-অঞ্চল বা লিয়েন খু'-তে : উত্তর-পশ্চিম টংকিন, উত্তর-পূর্ব টংকিন, রেড রিভার বদ্বীপ, উত্তর আন্নাম (উয়ে শহরের উত্তরাঞ্চল), দক্ষিণ আন্নাম (উয়ে শহরের দক্ষিণাঞ্চল) ও কোচিন চীন।

প্রত্যেকটি লিয়েন খু-র তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হল একটি কমিটির ওপর। কমিটিগুলিতে যেমন সদর দপ্তরের পাঠানো লোক থাকল তেমনি স্থানীয় লোকদেরও নেওয়া হল। এর দ্বারা কেন্দ্রের নির্দেশ ও স্থানীয় প্রয়োজনের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হল এবং এই লোকও নেওয়া হল যেমন সামরিক তেমনি রাজনৈতিক ক্যাডারের ভেতর থেকে। অর্থাৎ রাজনৈতিক ও সামরিক কম্যাণ্ডকে আগের মতো আলাদা না রেখে একই কমিটির মধ্যে

ঐক্যবদ্ধ করা হল। গঠনমূলক কাজের পাশাপাশি সামরিক সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাবার যে নীতি হো গ্রহণ করেছিলেন তার রূপায়ণের জন্যে এটা ছিল একান্ত আবশ্যক।

'লিয়েন খু'-র পরবর্তী পর্যায়ে ছিল আন্তঃ-প্রদেশ বা 'লিয়েন তিন' এবং তার পর আন্তঃ-গ্রাম বা 'লিয়েন জা'। এগুলির পরিচালনার পদ্ধতিও ছিল 'লিয়েন খু'-র মতই।

একইভাবে সামরিক-বাহিনীও বিভক্ত হল তিনটি অন্তর্খণ্ডিত পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে থাকল নিয়মিত সৈন্যদল, যারা উত্তর টং-কিনের মূল ভিয়েৎমিন শিবির থেকে রাইফেল, কামান ছোঁড়া, হাতবোমা ও বিস্ফোরকের ব্যবহার, নৈশ চলাফেরা, টহলদারি, অনুপ্রবেশের কৌশল, আক্রমণের কায়দা ইত্যাদি বিষয়ে কঠোর ট্রেনিং নিয়ে আসত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল আঞ্চলিক সৈন্য যারা বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সংগৃহীত হত এবং যাদের এক একটি বিশেষ আক্রমণের কাজে নিয়োগ করা হত। চলাফেরাকে সহজ এবং অপসারণকে দ্রুত করার জন্য এরা সব সময়েই ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে থাকত। তবে অপরাপর দলের সঙ্গে যোগসূত্র কখনই হারাত না। তার ফলে যদি বৃহত্তর প্রতিরোধের দরকার হত তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে তার আয়োজন করতে কোন অসুবিধা হত না।

তৃতীয় পর্যায়ে ছিল গ্রামরক্ষী বাহিনী, মিলিশিয়া। ভিয়েৎমিন-দের চেষ্টায় গ্রাম মিলিশিয়া দ্রুত গড়ে উঠতে লাগল। ফরাসীরা কোন এলাকায় হানা দিতে এলে তাদের ঠেকানোর প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল এদেরই ওপর। রাস্তা কেটে সৈন্য চলাচলে বাধা সৃষ্টি করত এরাই। এরাই 'বুবি ট্রাপ' পেতে রাখত। শত্রু সৈন্যের গতিবিধির ওপর নজর রাখা এবং সে সম্পর্কে খবরাখবর দেবারও দায়িত্ব ছিল এদের। অস্ত্রশস্ত্র ও মাল-মশলা লুকিয়ে রাখার জন্য গ্রামে গ্রামে খুঁড়ত সুড়ঙ্গ, বানাতো বাঙ্কার। সুড়ঙ্গ খোঁড়ার

রেওয়াজ ভিয়েৎনামে সেই সময়েই প্রথম দেখা দেয়। এভাবে অনেক সুড়ঙ্গ ওরা খুঁড়েছিল। এগুলিই এখন ভিয়েৎকংদের কাজে লাগছে। মাটির ওপর যখন ফরাসীরা দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিল তখন মাটির নিচে চলছিল ভিয়েৎমিনদের অলক্ষ্য যুদ্ধ প্রস্তুতি।

একদিকে যুদ্ধ প্রচেষ্টা যেমন বিস্তৃত হচ্ছিল মাটির নিচে, তেমনি অন্যদিকে শক্তি সঞ্চয় করছিল রাতের অন্ধকারে। প্রকৃতপক্ষে গোটা ব্যাপারটাই যেন ছিল অন্ধকারের অভিসার।

দিনের বেলা ফরাসীরা টহল দিত সড়কে সড়কে, নজর রাখত গ্রামে গ্রামে। ওই সব সড়ক বরাবর এবং নৌবহ সমস্ত নদীর ধারে ধারে ওরা তৈরি করেছিল বহু ওয়াচ-টাওয়ার। দুর্গের মতো করে তুলেছিল সেগুলিকে। সে-সব টাওয়ারের মাথায় দাঁড়িয়ে বহু দূর পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলের ওপর নজর রাখা চলত। ওরা দেখত, চারদিকে সব শান্ত। টোকা মাথায় ধানের খেতে কাজ করছে কৃষক। ধূলো পায়ে লোকেরা চলেছে হাটের পথে। জঙ্গলের মধ্যে শুধু পাখির কিচিরমিচির উচ্চকিত। সন্ধ্যায় ওরা ফিরে আসত শিবিরে, কিংবা শহর কাছে থাকলে শহরে।

অথচ প্রত্যেক দিন ভোরবেলায় ওদের শুনতে হত এখানে রাস্তা কাটা, ওখানে ব্রীজ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও ওয়াচ-টাওয়ার বেদখল, অস্ত্রশস্ত্র লোপাট, এক গাদা মৃতদেহ এধার-ওধার ছড়িয়ে আছে।

ফরাসীদের দুর্বলতাই ছিল এখানে। দিনের বেলা ওদের টহল ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। কিন্তু রাতকে ওরা ভয় করত। দেশের ভূগোলের সঙ্গে ওদের পরিচয় ছিল না অন্তরঙ্গ। তাছাড়া এই যুদ্ধও ছিল না মামুলী ধরণের। কোথায় কোন্ পথের বাঁকে জঙ্গলের আড়ালে গেরিলারা অপেক্ষা করছে কে জানে। সেক্ষেত্রে যত উন্নত অস্ত্রবলই থাকুক সুবিধে করে ওঠা কঠিন। তাই নিশ্চিত লোকক্ষয়ের দিকে তাদের আগ্রহ ছিল না।

অপরপক্ষে ভিয়েৎমিনদের শক্তির উৎসই ছিল রাতের অন্ধকার। সে সময় ওদের বাধা দেবার কেউ ছিল না। ওরা সেই সুযোগে চড়াও হত শত্রুর শিবিরে; মালপত্র বয়ে নিয়ে যেত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। এই ভাবেই মূল দপ্তরের নির্দেশ পৌঁছনো হত এক ঘাঁটি থেকে অন্য ঘাঁটিতে। রেডিও সংযোগ অবশ্য ছিল, কিন্তু রাত্রিবেলা পায়ে হেঁটে, দিনের বেলায় লুকিয়ে থেকেই প্রধানত কাজ করতে হত ভিয়েৎমিনদের। অসাধারণ ক্ষিপ্রতা ওরা অর্জন করেছিল। এই কাজে নিযুক্ত ছিল হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক। 'রিলে' পদ্ধতিতে লোক-পরম্পরায় অল্প সময়ের মধ্যেই নির্দেশ বা সরবরাহ পৌঁছে যেত যথাস্থানে।

আর যদি দিনের বেলায় চলাফেরা কখনও দরকার হয়ে পড়ত তাহলেও ফরাসীদের পক্ষে তার সন্ধান পাওয়া সহজ ছিল না। কারণ ওরা আত্মগোপন বা ক্যামোফ্লেজের কৌশল আয়ত্ত করেছিল নিখুঁতভাবে। প্রত্যেক মানুষের পিঠে লাগানো থাকত একটা করে জাল। তার পেছনের লোকের অন্যতম কাজই ছিল গাছের ডাল ও লতাপাতা ছিঁড়ে ওই জালে আটকে দেওয়া। কাজেই ক্যামোফ্লেজ নিখুঁত হল কিনা সেটা বোঝা যেত পরিষ্কার। শুধু তাই নয়। চারিদিকের দৃশ্যপটের ওপরেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হত ওদের। দৃশ্যপট যেই বদলে যেত অমনি আগের ক্যামোফ্লেজ ফেলে দিয়ে দৃশ্যপটের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন লতাপাতা লাগাতে হত সেখানে। সুতরাং ভুল ক্যামোফ্লেজের দরুণ ধরা পড়বার কোন উপায়ই ছিল না।

সেই সঙ্গে আরো নিখুঁত করে গড়ে তোলা হয়েছিল তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থাটিকে। কোন্ রাস্তায় কতজন ফরাসী পাহারা দিচ্ছে, কোন্ ওয়াচ-টাওয়ারের প্রতিরক্ষার অবস্থা কী রকম, কবে কখন কোথায় ফরাসী সৈন্যরা চড়াও হবে, ফরাসী সামরিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ধারা কোন্ দিকে বইছে, সে সব খবর সঙ্গে

সঙ্গে ভিয়েৎমিন শিবিরে পৌঁছে যেত। অপরপক্ষে পশ্চিমী সামরিক পর্যবেক্ষকরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ভিয়েৎমিন মহলের ছিঁটে-ফোঁটা খবরও ফরাসীরা পেত না। যেটুকু পেত তা-ও ছিল ভুল ও বিকৃত।

একবার শুধু ভিয়েৎনামের ফরাসী মহলই নন গোটা ফরাসী সরকার ভিয়েৎমিনদের এই নিখুঁত ব্যবস্থার কাছে বোকা বনেছিলেন।

১৯৪৯ সালের মে মাসে ফরাসী জেনারেল স্টাফের সর্বাধিনায়ক জেনারেল রেভার্সকে ভিয়েৎনামে পাঠানো হয়েছিল সেখানকার সামরিক পরিস্থিতি তদন্ত করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সুপারিশ করে একটা রিপোর্ট দেবার জন্যে। জেনারেল রেভার্স যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা ছিল অত্যন্ত গোপন এবং একান্তভাবেই ফরাসী সরকারের উচ্চতম মহলের ব্যক্তিগত পাঠের জন্যে। অথচ সকলকে এবং সবচেয়ে বেশি জেনারেল রেভার্সকে অবাক করে দিয়ে ভিয়েৎমিন বেতার থেকে তার সারাংশ প্রচার করা হয়েছিল।

এবং উদ্ভাবন করা হয়েছিল সরবরাহের একটি নিজস্ব সূত্র। ক্ষতিগ্রস্ত অস্ত্রশস্ত্র সারাবার জন্যে অজস্র ওয়ার্কশপ ওরা তৈরি করে ফেলেছিল বিভিন্ন স্থানে। পাহাড়ের গুহায় গুহায় বসিয়েছিল ছোট ছোট কারখানা, সেখানে তৈরি হত সাবান, কাগজ, কাপড়। ফরাসীর দৃষ্টি সেখানে পৌঁছবার কোন উপায়ই ছিল না, ফরাসীর বোমা সেখানে ছিল নিতান্ত নিরুপায়।

এইভাবে ভিয়েৎমিনরা যখন নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলছিল, তখন ফরাসীরা একটি উদ্ভট পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তারা প্রাক্তন সম্রাট বাও দাইকে আবার ফিরিয়ে এনে তাঁকে দিয়ে একটি পাল্টা ভিয়েৎনাম সরকার গঠনের তাল কষছিল।

বাও দাই, আমরা জানি, ১৯৪৫ সালে হো চি মিনের অনুকূলে ভিয়েৎনামের শাসন-গদী থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রতিদানে হো তাঁকে ভিয়েৎমিন সরকারের পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত করেছিলেন। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ওই পদাধিকারী হিসেবেই বাও দাই হো'র প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলেন চীনে। কিন্তু সেখান থেকে তিনি আর ফিরে আসেন নি।

ফরাসীরা যখন তাঁকে ব্যবহার করার কথা ভাবছিল তখন বাও দাই ছিলেন হংকংয়ে, মদির আলস্যে দিন কাটিয়ে, নাইট ক্লাবে ফুর্তি লুটে। ওই মজা ছেড়ে তিনি প্রথমে দেশে ফিরতে চান নি। পরে ইন্দোচীনে ফরাসী হাই কমিশনার মঁ বোলার-এর প্ররোচনায় এবং ১৯৪৭ সালের জুনে ফরাসীরা ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা স্বীকার করে একটি চুক্তি করলে ও আগস্টে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী আঁদ্রে মারি ওই চুক্তি অনুমোদন করলে তিনি প্রলুব্ধ হলেন। ১৯৪৯ সালের ২১ মে ফরাসী জাতীয় পরিষদ কোচিন-চীনের ঔপনিবেশিক মর্যাদার অবসান ঘটিয়ে বাকী ভিয়েৎনামের সঙ্গে যুক্ত করল।

১৪ জুন সায়গনে এক অনুষ্ঠানে বাও দাই নতুন হাই কমিশনার লেয়ঁ পিনোঁর কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিয়ে ভিয়েৎনামের স্ব-কল্পিত অধিপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত হলেন।

ফরাসীদের বিপর্যয় আরো এক ধাপ ত্বরান্বিত হল।

কারণ বাও দাই শুধু অপদার্থ ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন হাড়ে হাড়ে চরিত্রহীন এবং সেই কারণে ভিয়েৎনামের মানুষের কাছে গভীর অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার পাত্র। ১৯৩২ সালে ফরাসীদের হাতের পুতুল হিসেবে তিনি আন্নামের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তারপর থেকে মদ আর মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছুর চর্চা করেন নি। দালাতের শৈল শিখরে একটি কুঞ্জবন তাঁর ছিল। যতদিন রাজত্ব করেছিলেন রাজকার্য ছেড়ে সেখানেই

থাকতেন বেশির ভাগ সময়। স্বজন-পোষণ, দুর্নীতি, মোসাহেবী, মুনাফাবাজী এসব ছিল তাঁর রাজত্বের একমাত্র বৈশিষ্ট্য, প্রধান ভূষণ। দুর্বৃত্তেরা প্রকাশ্যে ও বিনা বাধায় হামলা করে বেড়াতো। অত্যাচারী জমিদারেরা এক-একটি বিকল্প সরকার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আইন ছিল না, শাসন ছিল না, শৃঙ্খলা ছিল না, শুধু ছিল শোষণ।

এর প্রতিকার করা দূরে থাক, বাও দাই নিজেই এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর প্রধান সাকরেদ ও পরামর্শদাতা ছিল লে ভান ভিয়েন (বে ভিয়েন) নামে কুখ্যাত বিন জুয়েন গুণ্ডা দলের কুখ্যাততর সর্দার। সায়গনের চীনা এলাকা চোলোন-এ বে ভিয়েনের একটি জুয়ার আড্ডা ছিল। ওই আড্ডার মুনাফা সে ভাগ করে নিত বাও দাইর সঙ্গে।

এইরকম একজন নীতিভ্রষ্ট লোককে ফরাসীরা এখন দাঁড় করাতে চাইল এমন একজন নেতার বিরুদ্ধে যাঁর ব্যক্তিগত আচরণ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত, কলঙ্ক যার চরিত্রে কোনদিন বিন্দুমাত্র ছাপ ফেলতে পারে নি, দুর্নীতির অপবাদ যাকে অতি বড় শত্রুও কোনদিন দিতে পারে নি।

অন্ধকার আর আলোর তফাতের মতো দুজনের মধ্যে পার্থক্যটা পাশাপাশি থাকায় লোকের চোখে এত স্পষ্টভাবে ধরা দিল যে ভুল করার আর কোন উপায়ই রইল না।

সুতরাং ওই পরীক্ষা সফল হবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। বাও দাই'র সাধ্য কি হো চি মিনের স্থান অধিকার করেন?

তার প্রমাণ পাওয়া গেল পরের বছর, ১৯৫০ সালে, যখন তিন বছর ধরে নিজেদের শক্তিশালী করে তোলার পর ভিয়েৎমিনরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ছয়

রুট নম্বর চার

"গুড গড! এবার বোধ হয় আমাদের আর নিস্তার নেই!"

মর্টারের গোলায় তাঁর পায়ের কাছের মাটি উপড়ে চোখে-মুখে ছিটিয়ে পড়তেই আতঙ্কে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন ডং খে গ্যারিসনের ফরাসী কম্যাণ্ডার।

ওদিকে কয়েকটি ব্যারাকে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। ব্যারাক বলে আর চেনা যায় না সেগুলিকে। দুমড়ে মুচড়ে আছড়ে পড়েছে মাটির বুকে। যেন কেউ শুকনো পাতাগুলি একসঙ্গে জড়ো করে রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

এতো নিখুঁত টিপ গেরিলাদের! কম্যাণ্ডিং অফিসার অবাক হয়ে ভাবলেন।

কিন্তু ভাববার সময় আর নেই। ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা এসে পড়ছে ক্যাম্পের ভেতর। অব্যর্থ গোলা। অব্যর্থ আর ভারী। ধোঁয়ায় ভরে গেছে চারদিক। তার ওপর কুয়াশা পড়েছে এত ঘন হয়ে যে মাটি পর্যন্ত প্রায় দেখা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে বর্ষা শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু তাতে কি। এত জঘন্য মাটি-কামড়ানো কুয়াশা যে ভালোভাবে কিছু ঠাহর করা যাচ্ছে না।

এর চাইতে বর্ষাই যেন ভালো ছিল। তবু গেরিলারা একটু চুপ ছিল। নিশ্চিন্তে একটু বিশ্রাম করার সুযোগ ছিল।

চার মাস আগে ভিয়েৎমিন গেরিলারা আরেকবার ডং খে দখল করবার চেষ্টা করেছিল। দখল করেও নিয়েছিল। কিন্তু মাত্র দু'দিনের জন্যে। দু'দিন পরে ফরাসী ছত্রী সৈন্যরা নেমেছিল আকাশ থেকে, আবার দখল করে নিয়েছিল ঘাঁটিটি।

তারপর থেকে সব চুপচাপ। ফরাসীরা ভাবল গেরিলাদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে, সুতরাং অন্তত কিছুকালের জন্যে নিরাপদ।

কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারে নি যে গেরিলারা আসলে বর্ষা শেষ হবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। যখন বুঝতে পারল তখন আর উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হবার সময়টুকুও নেই।

কম্যাণ্ডিং অফিসার আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশ একটানা সাদা। কোথাও এতটুকু ছিদ্র নেই যেখান দিয়ে সাহায্য আসতে পারে গতবারের মতো। আকাশ থেকে মাটিও দেখা যায় একটানা সাদা। এই অবস্থায় সাহায্যের কোন প্রত্যাশা করা বৃথা। নিচের দিকে তাকালেন তিনি। ডং খে জায়গাটা একটা পাহাড়ের পিঠের ওপর। দু'দিকে পাহাড়ের গা ঢালু হয়ে নেমে গেছে, তারপর আবার উঠে গেছে আরো দুটি সমান্তরাল পাহাড়ের পিঠ পর্যন্ত। যেখান থেকে কুয়াশার চাদর ভেদ করে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা এসে পড়ছে। গোলা আর গোলা।

এই আক্রমণের জন্যে ওরা প্রস্তুত ছিল না মোটেই। এত ব্যাপক আক্রমণের জন্যেও না। দেখতে দেখতে উঠোন ভরে উঠল হত আর আহতে। এত গোলাগুলী গেরিলারা পেল কোত্থেকে? গ্যারিসন কম্যাণ্ডার অবাক হয়ে ভাবলেন।

কিন্তু ভাববার সময় নেই। গোলা যেন আরও জোর হয়ে উঠেছে। গেরিলারা যেন আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। ডং খে রক্ষা করতেই হবে, যে করেই হোক।

"গুলি!" চিৎকার করে উঠলেন তিনি। "গুলি আরম্ভ কর!"

ফরাসী ফরেন লিজিয়নের দু' কম্পানী সৈন্য একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল লড়াইয়ে।

যে পাহাড়ের পিঠের ওপর ডং খে, তার ওপর দিয়ে একটি বাঁধানো সড়ক চলে গিয়েছে উত্তরে কাও বাং এবং দক্ষিণে লাং

সন পর্যন্ত। ফরাসীরা এই সড়কের নাম দিয়েছিল রুট কলোনিয়াল নাম্বার কোর। উত্তর-পূর্ব টংকিনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এই চার নম্বর রুট। চীনের সীমান্তের প্রায় পাশাপাশি বিছানো। ওই সীমান্তের ওপর পাহারা রাখার জন্যে সড়কটি ফরাসীদের হাতে থাকা একান্ত দরকার। আরো দরকার এই সড়কের ওপর অবস্থিত তিনটি ঘাঁটিকে রক্ষা করার। উত্তরে কাও বাং, মাঝে ডং খে ও দক্ষিণে লাং সন। তার মধ্যে মাঝখানে বলে ডং খের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। কারণ ডং খে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করছে। এই যোগসূত্র যদি ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে যেমন কাও বাং তেমনি লাং সন'ও বিপন্ন হয়ে পড়বে। কারো পক্ষেই তখন অপরের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

সেই ডং খেই এখন গেরিলারা আক্রমণ করেছে। ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০।

পেছনে আগুন আর আগুন। গর্তে গর্তে ছেয়ে গেছে মাটির বুক। গোলা ফাটছে ফট্ ফট্ শব্দে, আর সেই আওয়াজের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে আহতের আর্তনাদ। কুয়াশায় আর ধোঁয়ায় ভালো ঠাহর হয় না কিছু। মাটির চারপাশে যেখানে কাঁটাতারের বেড়া সেখানে ট্রেঞ্চের ভেতর ও বাঙ্কারের পেছনে আশ্রয় নিয়ে ফরেন লিজিয়নের দু' কম্পানী সৈন্য হাল্কা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রাণপণে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু গেরিলারা সংখ্যায় কত? গ্যারিসন কম্যাণ্ডার বিস্মিত-ভাবে দেখলেন পাহাড়ের গা বেয়ে ওরা উঠে আসছে সমুদ্রের জলে যেমন করে ঢেউ ওঠে একের পর এক। কত লোককে খতম করবে ফরেন লিজিয়নের গুলী? করতে পারে? যদি গুলি লেগে একজন পড়ে যায় তো কমসে কম আরো আটজন সামনে এগিয়ে আসে। এ স্রোতের যেন শেষ নেই, অন্ত নেই। এই স্রোতের সঙ্গে কতক্ষণ লড়াই করা সম্ভব?

তবু একদিন, একথা স্বীকার করতেই হবে, ঠেকিয়ে রেখেছিল ফরাসীরা গেরিলাদের। কিন্তু শুধু একদিনই। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত গেরিলারা যেভাবে আছড়ে পড়ছিল পাহাড়ের গায়ে
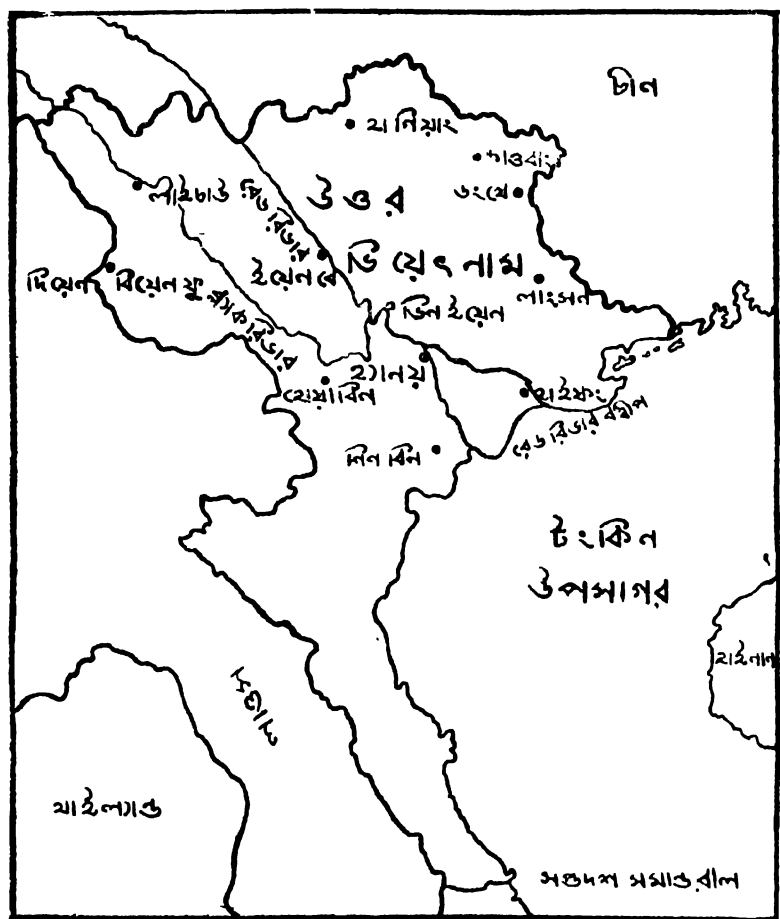
তাতে তাদের চূড়ান্তভাবে প্রতিহত করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ফরাসীদের গুলীর বেড়াজাল ভেদ করে গেরিলারা এগিয়ে এসেছিল অব্যর্থ গতিতে। ওদের সঙ্গে পারবে কেন তারা, যুদ্ধ

যাদের কাছে একটা অর্থকরী পেশা মাত্র? গেরিলাদের কাছে যুদ্ধ যে একটা নেশা, একটা উন্মাদনা! ওরা যে জাতীয় মুক্তির বেদীমূলে বলিপ্রদত্ত! হাত ভেঙে গেছে একজনের, ভাঙা হাত নিয়ে চলতে অসুবিধা হচ্ছে, তবু সে আহত বলে পড়ে থাকে নি পেছনে। হাতখানা কেটে ফেলে দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। তাকে ঠেকাবে তেমন সৈন্য ফরাসীরা কোথায় পাবে?

দ্বিতীয় দিন চলেছিল হাতাহাতি লড়াই। নিছক সংখ্যাবলের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে দু' কম্পানী ফরাসী সৈন্য প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। যে ক'জন বেঁচেছিল তারা পালিয়ে গিয়েছিল অন্যদিকে পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে।

মাত্র দু'দিনের লড়াইয়ে ডং খে ভিয়েৎমিনদের করায়ত্ত হয়েছিল।

তিন বছরের প্রস্তুতির পর হো চি মিন ফরাসীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারই সূত্রপাত হয়েছিল ডং খে'তে। এইখানেই প্রথম ভিয়েৎমিনরা 'জন-তরঙ্গের' পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল, যে পদ্ধতির সাহায্যে পরে তারা অনেক অসাধ্য সাধন করেছে। এবং এইখানেই প্রথম তারা ব্যাপকভাবে আধুনিক ও উন্নত সমরাস্ত্র ব্যবহার করে।

ডং খের পতন গোটা উত্তর-পূর্ব টংকিনে ফরাসী প্রতিপত্তিকে বিপন্ন করে তুলল। ভিয়েৎমিনরা যে এইভাবে প্রকাশ্যে সম্মুখ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে তা তাদের ধারণায় ছিল না। জেনারেল গিয়াপ হয়ত এইভাবে তাঁর সৈন্যদের নিযুক্ত করতেনও না। করেছিলেন কেবল ডং খের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। ডং খে দখল করতে পারলে এক ঢিলে তিনটি পাখি মারা যাবে।

হ'লও তাই। ফরাসী সামরিক কর্তৃপক্ষ কাও বাং থেকে তাদের বাহিনীকে সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত করলেন।

৩ অক্টোবর সামরিক ও অ-সামরিক ব্যক্তি মিলিয়ে কাও বাং

গ্যারিসনের প্রায় তিন হাজার লোক তাদের লট-বহর ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে চার নম্বর সড়ক ধরে রওনা হল লাং সনের পথে। সেই সঙ্গে ডং খের মাইল চোদ্দ দক্ষিণের তাট মে গ্যারিসন থেকেও সাড়ে তিন হাজারের মত সৈন্য রওনা হল কাও বাং সৈন্যদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে।

কিন্তু দু'টি দলই রাস্তায় অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েছিল গেরিলাদের দ্বারা। ওই আক্রমণের মুখে ওরা ভেসে গিয়েছিল বন্যার জলে খড়ের কুটোর মত, ছড়িয়ে পড়েছিল পাহাড়ে জঙ্গলে।

এই খবরে ফরাসীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। ১৭-১৮ অক্টোবরের রাত্রে গোপনে ও খুব অল্প সময়ের মধ্যে তারা লাং সন ঘাঁটি ফেলে পালিয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি যে, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, রসদ ও যানবাহন পর্যন্ত নিয়ে যাবারও ফুরসৎ ছিল না। বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, বিনা আয়াসে লাং সন ঘাঁটি ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ভিয়েৎমিনদের দখলে এসে গেল।

চার নম্বর সড়কের যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন দেখা গেল অন্তত ৭ হাজার ফরাসী সৈন্য ভিয়েৎমিনদের হাতে নিহত হয়েছে।

চার নম্বর রুটের যুদ্ধে ভিয়েৎমিনদের বিপুল জয় যেন বাঁধের দেয়ালে ফাটল ধরিয়ে দিল। আবদ্ধ জলরাশি বিপুল বিক্রমে ও গৌরবে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ভাসিয়ে নিয়ে গেল সামনের যা কিছু সব।

ভিয়েৎমিনরা যেন খুঁজে পেল নিজেদের। খুঁজে পেল নিজেদের শক্তিকে। জয়ের উন্মাদনায় তারা হয়ে উঠল দুর্বার, অপ্রতিরোধ্য।

লাং সন থেকে তারা রাস্তা নিল দক্ষিণ-পূর্বে রেড রিভারের ব-দ্বীপ এলাকার দিকে। ঘাঁটির পর ঘাঁটি হাতছাড়া হ'ল ফরাসীদের। পতন ঘটল গুরুত্বপূর্ণ দিন লাপ কেন্দ্রের। মাত্র

ছ'সপ্তাহের মধ্যে একশ' মাইল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সড়ক চলে গিয়েছিল ভিয়েৎমিনদের দখলে।

বন্যার স্রোতের মতোই তারা এগোতে লাগল সেই সব রাস্তা ধরে। এবং সমুদ্রের স্রোতের মতো গ্রামবাসীরা ভেঙে পড়ল পথের দুধারে তাদের স্বাগত জানাবার জন্যে। সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। উদ্দাম, উত্তাল। লাল জমিতে হলুদ তারা পতাকা উড়ল শত শত। দুলল রাস্তা-জোড়া লাল কাপড়ের ব্যানার। আকাশ যেন আগুন হয়ে জ্বলে উঠল। সেই আগুনে রঞ্জিত হল পথের ধূলোও। হাজার হাজার মানুষের পদভারে কেঁপে উঠল টংকিনের মাটি।

ঘর ছেড়ে দলে দলে ছুটে বেরিয়ে এলো মহিলারা, কি তরুণী কি বৃদ্ধা। যার যা ছিল তাই এনে তুলে দিল ভিয়েৎমিন সৈন্যদের হাতে। তাদের আনন্দিত, বিগলিত চিত্তের অকুণ্ঠ উপহার। কেউ আনল মালা, কেউ ছিটিয়ে দিল ফুল। মুক্তির অগ্রদূত ওরা, ওদের আজ সবকিছু উজার করে দেওয়া যায়। কেউ নিয়ে এলো এ্যাকর্ডিয়ান, কেউ গিটার, কেউ বা মাউথ-অর্গান। গানে, বাজনায়, নাচে উৎসবের ধুম লেগে গেল যেন।

"হো চু তিচ মুয়ন নাম!" ওরা আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল। হো চি মিন হাজার বছর বেঁচে থাকুন।

দরজায় দরজায় আজ সাজানো হো'র ছবি। বাড়ির মাথায় আজ টাঙানো লাল জমি হলুদ তারা ভিয়েৎমিন পতাকা। দেয়ালে দেয়ালে লাল অক্ষরে লেখা:

হো চি মিন জিন্দাবাদ!

প্রতিরোধের লড়াই জয়যুক্ত হবেই!

ফরাসীর তাঁবেদারেরা ওই সময় ঠাট্টা করে প্রায়ই বলত ভিয়েৎমিনদের সম্পর্কে: এ যেন হাতির সঙ্গে লড়াই করছে পঙ্গপাল।

উত্তরে বলেছিলেন হো চি মিন: "হ্যাঁ, আজ হাতির সঙ্গে লড়াই

করছে বটে পঙ্গপাল, কিন্তু আগামীকাল এরাই টেনে বার করে আনবে হাতির নাড়ীভুঁড়ি।"

সেই আগামীকালেরই সূচনা হয়েছিল চার নম্বর কলোনিয়াল রুটের ধারে, ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে।

গিয়াপের হাতে একমাত্র টংকিনেই তখন ছিল ২ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য। তার মধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার ছিল নিয়মিত, ঝানু।

চীন-ভিয়েৎনাম সীমান্ত এবং টংকিনের একটা বিরাট অঞ্চল ফরাসীদের কবল থেকে মুক্ত করার পর ভিয়েৎমিনরা এখন শ্লোগান দিল "টেট (বৌদ্ধ নববর্ষ) নাগাদ হ্যানয়!"

এদিকে পঞ্চাশ সালের নভেম্বরে ফরাসী জাতীয় পরিষদে সরকারের ভিয়েৎনাম নীতি—অর্থাৎ বাও দাইকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে দেশ শাসনের এবং ভিয়েৎমিনদের দমন করার জন্যে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নীতি—গৃহীত হল।

ডিসেম্বরে ভিয়েৎনামে নূতন হাইকমিশনার ও সুপ্রীম কম্যাণ্ডার হয়ে এলেন জেনারেল জঁা দ্য লাত্র দ্য তাসিনি।

কঠোর মানুষ হিসেবে জেনারেল দ্য তাসিনির সুনাম বা বদনাম যাই বলুন ছিল। তিনি এসেই যুদ্ধ পরিচালনার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করলেন।

তাঁকে এই কাজে মদত দেবার জন্যে এগিয়ে এল আমেরিকা।

আমেরিকার সাহায্য ছাড়া এই যুদ্ধ চালানো ফ্রান্সের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিল ক্রমেই। ক্ষয়-ক্ষতি বাড়ছিল বিপজ্জনকভাবে, বাড়ছিল আর্থিক বোঝা। ওই সময় ফরাসী সরকারই যে হিসাব পেশ করেন তাতে দেখা যায় ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত প্রায় ১৯ হাজার ফরাসী নিহত কিংবা নিখোঁজ হয়েছে। আর খরচা হয়েছে ১৪০ থেকে ২২০ কোটি ডলার। এই বিপুল বোঝা বইবার মত শক্তি তখন ফ্রান্সের ছিল না।

সুতরাং ফ্রান্সকে চাইতেই হল আমেরিকার সাহায্য। আর আমেরিকাও একটা সুযোগ পেয়ে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো।

কারণ একটি বিপন্ন পশ্চিমী সহরাষ্ট্রকে বাঁচানো ছাড়াও আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার। কম্যুনিজম ঠেকাবার তাগিদ। বছর তিনেক আগে কম্যুনিজম ঠেকাবার একটা নীতি সাধারণভাবে গ্রহণ করেছিল আমেরিকা।

হ্যারি এস, ট্রুম্যান তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ তিনি মার্কিন কংগ্রেসের কাছে এক প্রস্তাব পাঠিয়ে বললেনঃ "আমি বিশ্বাস করি, সশস্ত্র সংখ্যালঘুর ক্ষমতা দখলের কিংবা বাইরের চাপের বিরুদ্ধে যে সব মুক্ত জাতি প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের সমর্থন করাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি হওয়া উচিত।"

তিনি কংগ্রেসের কাছ থেকে গ্রীসে ও তুরস্কে কম্যুনিস্ট বিরোধিতারও জন্যে সাহায্য চেয়েছিলেন। কংগ্রেস ওই সাহায্যের অনুমোদন দিতে দেরি করেন নি।

আমেরিকার কম্যুনিজম ঠেকাবার পররাষ্ট্র নীতির এই হল সূত্রপাত।

১৯৪৯ সালে যখন চীনে কম্যুনিস্ট রাজত্ব কায়েম হল তখন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েৎনামকে অন্য চোখে দেখতে আরম্ভ করল। পঞ্চাশ সালে যখন পর পর কয়েকটি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র হো চি মিনের সরকারকে স্বীকৃতি দিল, তখন আমেরিকা ভাবল ভিয়েৎ-নাম বুঝি কম্যুনিস্ট হয়ে যায়। তারা বেমালুম ভুলে গেল যে, হো চি মিন ফরাসীদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্যে একাধিকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এমন কি এক সময় ফ্রেঞ্চ ইউনিয়নের মধ্যে থাকতেও রাজি হয়েছিলেন। আমেরিকা প্রভৃতি পশ্চিমী রাষ্ট্র-বর্গের কাছ থেকে সমর্থন তো চেয়েছিলেনই। ফ্রান্স ও আমেরিকা তাঁর ওই মনোভাবের প্রতি কোন মর্যাদা দেখায় নি, বরং পদে

পদে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। অথচ নিতান্ত বাঁচার তাগিদে হো চি মিন যখন কম্যুনিস্ট দুনিয়ার দিকে তাকালেন, তখন ডীন অ্যাচিসনের (সেই সময় আমেরিকার পররাষ্ট্রসচিব) বলতে বাধল না: "হো চি মিনের 'জাতীয়তাবাদী' লক্ষ্য সম্পর্কে যদি কোন রঙীন ধারণা কারো থেকে থাকে তবে এরপর তা দূর হওয়া উচিত। এর দ্বারা হো তাঁর আসল চেহারায় ইন্দোচীনের স্বাধীনতার শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হলেন।"

এর পর ওয়াশিংটন ফরাসীদের হাতের পুতুল বাও দাইকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানাতে আরম্ভ করল। মিঃ অ্যাচিসন এক বার্তা পাঠিয়ে বাও দাইকে জানালেন আমেরিকা তাঁর সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী।

৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাও দাই সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিল।

২৫ জুন কম্যুনিস্ট উত্তর কোরিয়া ৩৮ অক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করলে মার্কিন সরকার এই সঙ্কল্পে দৃঢ়তর হলেন। ২৭ জুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করলেন যে, আমেরিকা ভিয়েৎনামে দ্রুততর সাহায্য পাঠাবে।

সাহায্য অবশ্য এসেছিল ওই ঘোষণার আগেই। মার্চ মাসে দুটি মার্কিন জাহাজ ভিড়েছিল সায়গনের বন্দরে। তাতে এসেছিল অস্ত্রশস্ত্র, কিছু বিশেষজ্ঞ।

ফরাসী কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। কিন্তু ভিয়েৎনামীরা?

"ওরা (মার্কিনীরা) গোটা ইন্দোচীনকেই পুরো দখল করতে চায়," জনসাধারণকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন হো চি মিন। "সেই জন্যেই ওরা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে—কি সামরিক, কি রাজনীতিক, কি অর্থনৈতিক—প্রভাব বিস্তারের জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।...

"ইন্দোচীনের মানুষকে হত্যা করার জন্যে ওরা তাদের

তাঁবেদারদের হাতে তুলে দিচ্ছে অস্ত্র। স্থানীয় শিল্প যাতে বিকশিত হতে না পারে তার জন্যে ওরা নিজেদের মালপত্র এনে ঢেলে দিচ্ছে এখানে। যুবসমাজের মনকে বিষাক্ত করে তোলার জন্যে ছড়াচ্ছে যৌন-সাহিত্য। টাকা দিয়ে, প্রতারণা করে, ভেদ-বুদ্ধি ছড়িয়ে তারা দেশের মানুষকে করতে চাইছে দুর্বল।"

সুতরাং সায়গন নদীর জলে ঐ দুটি জাহাজকে ভাসতে দেখে প্রসন্ন বোধ করার কোন কারণই ছিল না ভিয়েৎনামীদের। তাদের কাছে ওগুলি সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। জাহাজ দুটি আসেও নি অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। একটি অত্যাচারী ও কলঙ্কিত ঔপনিবেশিক শক্তিকে আরো ভালো-ভাবে অত্যাচার চালাতে ও শোষণ করতে সাহায্য করার জন্যেই এরা এসেছিল। একটি স্বাধীনতাকামী জাতির সংগ্রামের কণ্ঠরোধ করবার জন্যে এগিয়ে এসেছিল সেই দেশ যার নিজের জন্ম হয়েছিল প্রতিরোধের ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে, যে নিজেকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পূজারী বলে প্রচার করে থাকে, স্বাধীনতার নামে যে দেশ মূর্তি গড়িয়ে দুনিয়ার দেখবার জন্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছে তার প্রবেশ-পথের সামনে। কী চমৎকার!

হাজার হাজার মানুষ সেদিন জমায়েত হয়েছিল সায়গন নদীর ধারে। তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। হাতে হো চি মিনের ছবি, মাথার ওপর ভিয়েৎমিনদের লাল পতাকা, ওরা চিৎকারে চিৎকারে আকাশ ভরাট করে বলে উঠছিল :

'ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যবাদ ফিরে যাও!'

'আমরা আর কারো পরাধীন হব না!'

'প্রতিরোধকে আমরা জয়যুক্ত করবই!'

বন্দরের কাজ অচল হয়ে গিয়েছিল। অচল হয়েছিল যান-বাহনের চলাচল। এক ক্রুদ্ধ জনতা কেবলই দুলে দুলে ফুঁসে ফুঁসে উঠছিল এই নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত

হয়েছিল দোকানপাট, বিশেষ করে যেগুলি ছিল ফরাসী। আক্রান্ত হয়েছিল ফরাসী অফিস, বাড়ি। জনতাকে সামলাবার জন্যে হাজির ছিল ফরাসী ও বাও দাই সরকারের পুলিশ। কিন্তু ভিয়েৎনামী পুলিশ সেদিন ফরাসীদের সাহায্যে এগিয়ে আসে নি। ওরা ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল জনতার ক্রোধ কিভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল ক্রমে।

সেদিন বিক্ষোভ দমন করতে হয়েছিল কেবল ফরাসী পুলিশকেই, একা।

ওদিকে জয়ের পর জয় করায়ত্ত করে গিয়াপের বাহিনী তখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে রেড রিভারের ব-দ্বীপের দিকে। ওদের সঙ্কল্প 'টেট' উৎসবের আগেই স্থানয় দখল করতে হবে।

ছোট ছোট ইউনিটে গিয়াপ ভাগ করে দিলেন তাঁর বাহিনীকে। যাতে ওরা তাড়াতাড়ি চলাফেরা করতে পারে। যাতে দরকার হলে জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করতে সুবিধে হয়। তারা ছড়িয়ে পড়ল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। তারপর বিভিন্ন গোপন পথে, অনেকটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে, এগিয়ে আসতে লাগল ব-দ্বীপ এলাকার দিকে।

ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে গেরিলারা ব-দ্বীপের প্রান্তদেশে এসে উপস্থিত হল। গিয়াপ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কোন ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করলেন না। তিনি নির্দেশ দিলেন, আশেপাশে ছোটখাটো যেসব ফরাসী ঘাঁটি আছে সেগুলিতে হঠাৎ হঠাৎ হানা দিয়ে ফরাসীদের উত্যক্ত করতে ও ব্যস্ত রাখতে হবে। সেই সুযোগে মূল ডিভিসনগুলি আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হবে।

গিয়াপের এই স্ট্র্যাটিজিতে কাজ হয়েছিল চমৎকার। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে হামলার খবর পেয়ে ফরাসীরা বুঝতেই পারছিল না আক্রমণ কোন্ দিক দিয়ে আসবে। বিভ্রান্ত হয়ে

কেবল হাতড়ে বেড়াচ্ছিল ওরা। আনল প্লেন। ফরাসী বিমান বহর ক্রমশ বেশি মাত্রায় অংশ নিতে শুরু করল যুদ্ধ-প্রচেষ্টায়। আকাশ থেকে খুঁজতে লাগল কোথায় আছে গেরিলারা। কিন্তু সাধ্য কি খুঁজে পায়। বর্ষা ছিল না, আকাশও পরিষ্কার। কিন্তু তাতে কি। কুয়াশা তো রয়েছেই। সেই মাটি-কামড়ানো কুয়াশা। আকাশ থেকে যা ভেদ করে দৃষ্টি সহজে চলে না।

গেরিলারা ওই কুয়াশার আবরণে ঢেকে রাখত নিজেদের। তার ওপর ছিল ক্যামোফ্লেজ। তারও ওপর ছিল সতর্কতা, সাবধানতা, কৌশল। কুয়াশার আবরণ যদিও ছিল, তবু গেরিলারা দিনের আলোকে ব্যবহার করত না সাধারণত। ওদের চলাফেরা, ওদের রসদের সরবরাহ, ওদের জমায়েত, ওদের আক্রমণ বেশির ভাগই হত রাত্রে। যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, মাল-মশলা সরবরাহও হ'ত না ভারী ভারী ট্রাকে, লরীতে। হ'ত মানুষের কাঁধে, মাথায়, কিংবা সাইকেলের পেছনে। আর সেসব রসদ জমা থাকত না মাটির ওপর। থাকত যেখানে পাহাড় সেখানে পাহাড়ের গুহায়, যেখানে জঙ্গল সেখানে মাটির নিচে।

ফরাসীদের সাধ্য কি ওরা গেরিলাদের খুঁজে পায়।

অবশ্য ফরাসীদের বোমায় গেরিলারা যে কয়েকবার আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েছে তা নয়। যেমন একবার হয়েছিল তিন ইয়েন-এ। ১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর।

আলং উপসাগরের উত্তরে উপকূলের কাছে তিন ইয়েন একটি ছোট আধা-শহর। ব-দ্বীপে অনুপ্রবেশের অসংখ্য পথের মধ্যে তিন ইয়েনও ছিল একটি। গেরিলারা সেখানে জড় হয়েছিল বেশ কিছু সংখ্যায়।

ফরাসীরা জানতে পারল এই জমায়েতের কথা। ওরা ভাবল গিয়াপ বুঝি এই পথেই তাঁর প্রধান আক্রমণ আরম্ভ করবেন। জেনারেল দ্য তাসিনি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটি ছত্রী ইউনিট

পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। পেছনে পেছনে গেল জঙ্গী বিমানের বহর।

জাঁদরেল জেনারেল দ্য তাসিনি। ভিয়েৎনামে আসার পর এই প্রথম তিনি প্রকাশ্যে ভিয়েৎমিন প্রতিরোধের সম্মুখীন। এ প্রতিরোধ ভাঙতেই হবে, তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন।

প্রতিজ্ঞা তিনি রেখেছিলেন, কিন্তু এক জঘন্য ধরণের বর্বরতার আশ্রয় নিয়ে।

আকাশ থেকে নামল ছত্রীরা। কিন্তু তাদের একার সাধ্য ছিল না ভিয়েৎমিনদের ছত্রভঙ্গ করা। মাটি স্পর্শ করার আগেই ওদের বেশ কিছু প্রাণ হারাত গেরিলাদের গুলীতে। যারা শেষ পর্যন্ত মাটিতে এসে নামত তারা সহজেই ভেসে যেত গেরিলাদের সংখ্যাবলের মুখে।

তাই কোন ঝুঁকি নেয় নি ফরাসীরা। যে মুহূর্তে ছত্রীরা ঝাঁপ দিল প্যারাসুট নিয়ে সেই মুহূর্তে সঙ্গের জঙ্গী বিমান থেকে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল—নেপাম।

নেপাম হচ্ছে এক ধরণের পেট্রোলিয়াম জেলি। তরলও নয়, ঘনও নয়, থকথকে। মাটির সঙ্গে যেই সংস্পর্শে আসে অমনি তাতে আগুন জ্বলে ওঠে। ভয়ঙ্কর আগুন। নেপামের ছিটকে-পড়া প্রতিটি কণার সঙ্গে সঙ্গে সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

জীবন্ত নরক সৃষ্টি করে নেপাম।

সেই নেপাম ফরাসীরা ব্যবহার করেছিল তিন ইয়েনে। প্লেনের ডানার ট্যাঙ্ক ভর্তি করে ওরা নিয়ে গিয়েছিল ওই ভয়ঙ্কর পদার্থ। ঢেলে দিয়েছিল তিন ইয়েনের ওপর বৃষ্টির ধারার মতো।

ভিয়েৎনামে সেই প্রথম নেপামের ব্যবহার।

ভিয়েৎমিনরা পরিচিত ছিল না এই বর্বরতার সঙ্গে। মানুষ যে এত উন্মত্তভাবে বর্বর হতে পারে তা তারা ভাবতে পারে নি। নেপাম হচ্ছে গণহত্যার অস্ত্র। সেই অস্ত্র এখন তাদের ওপর

প্রয়োগ করা হল। সেই হু-হু করা আগুনের সামনে তাদের করবার কিছু ছিল না। করতে যাওয়াটাই হ'ত বোকামী।

তারা ছত্রভঙ্গ হল।

জেনারেল দ্য তাসিনি ভাবলেন তিনি গেরিলাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন। কিন্তু তিন ইয়েনে গেরিলাদের একটা সামান্য অংশই ছিল! প্রধান অংশ ছিল অন্যত্র, প্রস্তুত হচ্ছিল একটা বড় রকমের আক্রমণের জন্যে।

এই আক্রমণ এল ১৯৫১ সালের ১৩ জানুয়ারি ভিন ইয়েনে।

গিয়াপ আক্রমণের জায়গা আর সময়টা বেছেছিলেন অনেক চিন্তা করে। ফরাসীরা ভেবেছিল লাং সন দখল করার পর গেরিলারা সোজা দক্ষিণে ব-দ্বীপ এলাকা পর্যন্ত নেমে আসবে। কিছু কিছু অংশ সেভাবে নেমে এসেওছিল। সুতরাং ফরাসীরা এই দক্ষিণমুখী অনুপ্রবেশ রোধ করার জন্যেই প্রধানত তৎপর হয়েছিল এবং তাদের সামরিক শক্তিকে সেইভাবেই মোতায়েন করেছিল।

সেই ফাঁকে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হওয়াই ছিল গিয়াপের পক্ষে অনেক সুবিধাজনক।

কিন্তু কেবল পশ্চিমদিকে অবস্থিত বলেই নয়, ভিন ইয়েনকে লক্ষ্যবস্তু করার পেছনে আরো কারণ ছিল। এই শহর হ্যানয় থেকে মাত্র মাইল চল্লিশেক উত্তর-পশ্চিমে। তা ছাড়া এই শহর ছিল রেড রিভারের কাছাকাছি এবং শহর ও নদীর মাঝখানে ছিল বেশ কিছু গভীর জঙ্গলে ঢাকা ছোট-বড় পাহাড় যা শহরকে অনেকটা ঘিরে রেখেছিল। কাজেই আক্রমণের পক্ষে এই জায়গার সুবিধা অনেক এবং ফরাসীরা যেহেতু ভিন ইয়েনকে হ্যানয়ের অন্যতম প্রধান প্রতিরক্ষা-ঘাঁটি বলে মনে করে সেজন্যে এই শহর দখল করে নিতে পারলে হ্যানয় পর্যন্ত পৌঁছে যেতে কোন অসুবিধাই হবে না।

গিয়াপের পরিকল্পনায় কোন ত্রুটি ছিল না। ভিন ইয়েন আগলে ছিল যে হাজার তিনেক ফরাসী সৈন্য, তাদের বিরুদ্ধে তিনি পুরো দু' ডিভিসন সৈন্য (সংখ্যায় প্রায় বাইশ হাজার) মাঠে নামিয়ে দিলেন। ১৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় তারা আক্রমণ আরম্ভ করেছিল। একটি ডিভিসন রেড রিভারের পূর্ব তীরের পাহাড় থেকে নেমে এসে নদী পার হয়ে পশ্চিম তীরের পাহাড়গুলি দখল করে নিয়েছিল। আরেকটি ডিভিসন এগিয়ে এসেছিল শহরের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে।

এই সাঁড়াশীর চাপের মুখে ফরাসীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত প্রথম ধাক্কাতেই। কিন্তু জেনারেল দ্য তাসিনি তখন নতুন অস্ত্রের সন্ধান পেয়ে গেছেন। এবং ওই অস্ত্র প্রয়োগ করে তিনি একবার জয়ীও হয়েছেন। সুতরাং···

সুতরাং ভিন ইয়েন যুদ্ধের পরিচালনার দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করলেন জেনারেল দ্য তাসিনি। ভিয়েৎনামে যেখানে যত প্লেন ওই মুহূর্তে ছিল সব—হ্যাঁ, গুণে গুণে প্রত্যেকটি—তিনি আনালেন ভিন ইয়েনে। তাদের ট্যাঙ্কগুলি কানায় কানায় ভরে দিলেন নেপামে। বন্যার ধারার মত উজাড় করে ঢেলে দিলেন সেই তরল আগুন ভিন ইয়েনের পাহাড়ে-জঙ্গলে। নির্বিচারে। আগুনের বেড়াজালে ঘিরে ফেললেন ভিন ইয়েন।

ভিয়েৎমিন মুক্তি যোদ্ধারা তবু উপেক্ষা করতে চেয়েছিল ওই আগুনকে। এ প্রমাণ আছে আগুন ভেদ করে ওরা এগিয়ে গিয়েছিল আক্রমণের জন্যে। অগ্নিশুদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়ী ওই বীরেরা। আরো বড় আগুনের জ্বালা—পরাধীনতার জ্বালা—জ্বলছিল তাদের বুকে। দ্য তাসিনির নেপামে তারা ভয় পাবে কেন?

কিন্তু নিরস্ত করলেন গিয়াপ। মরতে তাঁদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে এত ব্যাপক লোকক্ষয় হতে দেবার মত অবস্থা তাঁদের ছিল না।

পাঁচ দিনের যুদ্ধে অন্তত ছয় হাজার গেরিলা নিহত হয়েছিল। এর আগে আর কখনো ভিয়েৎমিনদের কোন একটি যুদ্ধে এত বেশি লোকক্ষয় হয় নি।

গিয়াপ তাই কোন ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। তিনি সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন ছত্রভঙ্গ হবার জন্যে।

সাত

"হ্যাঁ, এই শেষ!"

আগুন আর আগুন!

পাহাড়ের গায়ে গায়ে কিংবা সমতলের বুকে কিংবা জঙ্গলের ধারে ধারে শুধু আগুন জ্বলছে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

যেন দিকে দিকে এক বিরাট শ্মশানে চিতার আগুন জ্বলছে সংখ্যাহীন।

জেনারেল দ্য তাসিনি, জাঁদরেল ফরাসী কম্যাণ্ডার, ভিন ইয়েনের যুদ্ধ জয় করে উৎসাহে দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। মাথার ঠিক থাকল না তাঁর অফিসারদেরও। মায় সাধারণ ফরাসী সৈন্যটি পর্যন্ত অতি আনন্দে বর্বর হয়ে উঠল।

ট্রাক চালাচ্ছে কোন ফরাসী ড্রাইভার, গাড়ি চালিয়ে দিল পথচারীদের তোয়াক্কা না করেই তাদের ওপর দিয়ে।

বাজারে ঢুকেছে কোন ফরাসী সৈন্য, দাম চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাইফেলের কুঁদো দিয়ে দোকানীর মাথা ফাটিয়ে দিয়ে বীর পুঙ্গব ধীরে ধীরে হেঁটে এগিয়ে গেল আর একটা দোকানে, যেন কিছুই হয়নি।

ভিয়েৎমিনদের খোঁজ করতে কোন গ্রামে ঢুকেছে একদল ফরাসী সৈন্য, সাধারণ মানুষের থেকে গেরিলাদের আলাদা করে খুঁজে বার করতে না পেরে লাথি, কুঁদো, গুলি, বেয়োনেট দিয়ে মেরে 'ঠাণ্ডা' করতে লাগল যাকে সামনে পেল তাকেই। তারপর গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিল আগুন ধরিয়ে। দস্যুরা চলে যাবার

পর দেখা গেল শত শত মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে চারদিকে—ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ ও শিশুর মৃতদেহ।

আকাশ থেকে গেরিলাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে কোন ফরাসী বিমান, খুঁজে না পেয়ে গ্রামাঞ্চল আর বনাঞ্চল ভিজিয়ে বৃষ্টিধারার মতো ছিটিয়ে দিল নেপাম। আগুনের ঝড় উঠল শান্ত, স্নিগ্ধ, মাটির বুকে। মানুষ ঘর-ছাড়া হল, নিহত হল ঝাঁকে ঝাঁকে।

জেনারেল দ্য তাসিনি ভাবলেন তিনি দেশবাসীর আনুগত্য লাভ করছেন।

গোয়েন্দা রিপোর্ট এসেছিল দ্য তাসিনির কাছে। সেই রিপোর্ট তাঁকে জানিয়েছিল ভিন ইয়েনের যুদ্ধ জেতার কোন ক্ষমতাই ছিল না তাঁর যদি না আকাশ থেকে নেপামের তরল আগুন বর্ষিত হ'ত। নেপামই ওই যুদ্ধে তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

সুতরাং ভবিষ্যতেও যদি বাঁচতে হয় তাহলে নেপামের আশ্রয়ই নিতে হবে।

বিমান বহরের কাছে নির্দেশ গেল তারা যেন এরপর থেকে যে কোন আক্রমণেই, কিংবা আক্রমণ না হলেও, অকুণ্ঠিত ভাবে নেপাম ব্যবহার করে।

কিন্তু দ্য তাসিনি জানতেন না যে, ওই নেপামের আগুনে তিনি ফরাসীদেরই চিতা জ্বালিয়ে যাচ্ছেন।

একদিকে নেপাম বর্ষণ করে গেরিলাদের ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করে অন্যদিকে দ্য তাসিনি হ্যানয় ও হাইফংকে ঘিরে একটা বেড়াজাল তৈরীর দিকে নজর দিলেন।

আলং উপসাগর থেকে পশ্চিমে ভিন ইয়েন পর্যন্ত, তারপর সেখান থেকে আবার দক্ষিণ-পূর্ব মুখে ফাট জিয়েমের কাছে সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত একটি রেখা টানলেন তিনি। তারপর ওই রেখা বরাবর কাঁটাতার দিয়ে দুর্গের মত সুরক্ষিত করে অল্প দূরে দূরে বানালেন কতকগুলি ব্লকহাউস। কমসে কম বারো শ'

ব্লকহাউস তিনি বানিয়ে ফেলেছিলেন ১৯৫১ সাল শেষ হবার আগেই।

ভেবেছিলেন এইভাবে হ্যানয়, হাইফং এবং ব-দ্বীপ এলাকাকে নিরাপদ করতে পারবেন গেরিলাদের হাত থেকে।

কিন্তু কি আগুনের বেড়াজাল কি কংক্রীটের 'দ্য তাসিনি লাইন' পারেনি ভিয়েৎমিন মুক্তি ফৌজের গতিরোধ করতে। পারা সম্ভবও ছিল না। আগুনে শুদ্ধ হয়ে আরো দুর্বার হয়ে উঠেছিল ওরা। আগুনকে জয় করতে শিখেছিল। তাছাড়া ওদের সহায় ছিল রাত। ফরাসীরা যদি ছিল দিনের অধিপতি, ওরা ছিল অন্ধকারের অধীশ্বর। দিনের আলো নিভে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফেরা পাখিদের মতো ফরাসী সৈন্যরাও একে একে ফিরে আসত তাদের ব্লকহাউসে কিংবা শহরের শিবিরে। ওদের গুলি, ওদের বোমা, ওদের নেপাম ওই অন্ধকারের দেওয়ালের নিচে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকত। দিগঞ্চল অবারিত হত ভিয়েৎমিন মুক্তি-বাহিনীর জন্যে।

অন্ধকারের রোমকূপ থেকে ওরা বেরিয়ে আসত দলে দলে। মাটির বুক থেকে জেগে উঠত ঘাসের মতো। পাতার গা থেকে আলাদা হয়ে ওরা হেঁটে চলত। জঙ্গলের পর জঙ্গল পার হয়ে ওরা এগিয়ে যেত। পার হত খেতের পর খেত, নদীর পর নদী, খালের পর খাল। কখনো সোজা দাঁড়িয়ে, কখনো দৌড়ে, কখনো পিঁপড়ের মত বুকে হেঁটে মাইলের পর মাইল, অনেক ঘুরপথে। এক বাঙ্কার থেকে অন্য বাঙ্কারে। এক সুড়ঙ্গ থেকে অন্য সুড়ঙ্গে।

যেত ফরাসীর চলার রাস্তা কাটতে কাটতে, যাতে ওদের গাড়ি গেরিলাদের ধাওয়া করে চলতে চলতে মুখ থুবড়ে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। উড়িয়ে দিত ব্রীজ। কিন্তু কখনও তারা এমন রাস্তা কাটত না কিংবা এমন ব্রীজ ওড়াতো না যাতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হতে পারে। আর কোন ব্রীজ বা

রাস্তা কিংবা স্যাবোটাজের অন্য কোন লক্ষ্যবস্তু যদি থাকত কোন গ্রামের কাছাকাছি তাহলেও সেগুলি ছিল একেবারে নিষিদ্ধ। কারণ এগুলি ভাঙলে বা কাটলে পরে ফরাসীর অত্যাচারের শক্ত হাত এসে পড়বে গ্রামবাসীদেরই ওপর। তা তাদের কখনই কাম্য ছিল না। তাই কোন কিছু স্যাবোটাজ করার আগে কিংবা কী কী লক্ষ্যবস্তু স্যাবোটাজ করা হবে সে সম্পর্কে ওরা গ্রামবাসীদেরই পরামর্শ নিত।

ধার্মিকরা তাদের ধর্মকে যেভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে, গেরিলারা সেইভাবেই রক্ষা করত গ্রামবাসীদের সম্পত্তি। ওদের ট্রেনিংয়ের প্রথম কথাই ছিল তাই। যখন কোন গ্রামে থাকতে হ'ত ওদের, গ্রামবাসীদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়েই থাকতে হ'ত। মাঠে কিংবা ঘাটে দিনের বেলা ওদের কাজ ছিল মানুষের কাজে সাহায্য করা। তখন কারো সাধ্য ছিল না ওদের গ্রামবাসীদের থেকে আলাদা করে চিনতে পারে।

দ্য তাসিনি যখন ব্লকহাউসের বেড়াজাল দিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত করে তুলছিলেন, তখন ভিয়েৎমিন গেরিলারা একাধিক ধারায় এগিয়ে আসছিল ব-দ্বীপ এলাকায়।

অনুপ্রবেশের প্রধান রাস্তা ছিল ব-দ্বীপের পশ্চিম প্রান্ত ধরে হোয়া বিন নামে একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে। এই পথেই ১৯৫১ সালের মে মাসে গেরিলারা রেড রিভারের দক্ষিণ তীরে, রাজধানী হ্যানয় থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে ক্যাথলিক শহর নিন বিনের ওপর চড়াও হয়েছিল। কিছু কালের জন্যে শহরটি দখলও করে নিয়েছিল তারা।

নিন বিনের যুদ্ধে ফরাসীদের অন্যতম কম্যাণ্ডার ছিলেন লেফটেন্যান্ট বার্ণার দ্য লাত্র্। জেনারেল দ্য তাসিনির ছেলে। ওই যুদ্ধে সে নিহত হয়েছিল গেরিলাদের গোলায়।

দ্য তাসিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। কিন্তু অবাক হয়েছিলেন তার চাইতেও বেশি। ভিন ইয়েনের পর তিনি ভেবেছিলেন

ভিয়েৎমিনদের মেরুদণ্ড তিনি ভেঙে দিয়েছেন। ব্লকহাউসের বেড়াজাল তৈরী করার পর তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে, ওই ব্যূহ ভেদ করে গেরিলাদের পক্ষে আসা অসম্ভব।

কিন্তু নিন বিন? নিন বিন তো তাঁর বেড়াজালের বাইরে নয়। দূরেও নয় খুব একটা হ্যানয় থেকে। গেরিলারা সেখান পর্যন্ত এলো কী করে? আর এসে এত বড় রকমের আক্রমণ চালাবার মতো ক্ষমতাই বা যোগাড় করল কোত্থেকে?

জেনারেল দ্য তাসিনি উদ্বিগ্ন হলেন। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, যত শক্ত ব্যূহই তিনি রচনা করে থাকুন, ব-দ্বীপ এখনো কী রকম অসহায়। এই অসহায়তা দূর করা যাবে না যদি না গেরিলাদের সরবরাহের রাস্তা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায়।

ম্যাপের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে তাঁর নজর পড়ল হোয়া বিনের ওপর।

দ্য তাসিনি জানতেন না, হোয়া বিন গেরিলাদের সরবরাহের প্রধান রাস্তা হতে পারে কিন্তু একমাত্র রাস্তা কখনই ছিল না।

তবু হোয়া বিন তাঁর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রইল।

চারদিকে পাহাড়, মাঝখানে একটুখানি সমতলভূমি। তারই মধ্যে ছোট্ট একটুখানি শহর হোয়া বিন। হ্যানয়ের পশ্চিমে। দ্য তাসিনির বেড়াজাল থেকেও মাইল পঁচিশেক দূরে। ব-দ্বীপের উত্তরে ও দক্ষিণে এবং ব-দ্বীপের মধ্যে গেরিলাদের যে বাহিনী ছিল, তাদের সরবরাহ যেত এই হোয়া বিন হয়েই। গেরিলারা জড়ো হ'ত এখানে, তারপর এখান থেকেই আবার ছড়িয়ে যেত নতুন নতুন দিকে।

দ্য তাসিনি ভাবলেন, হোয়া বিন যদি দখল করে নেওয়া যায় তাহলে ব-দ্বীপ সত্যি সত্যিই নিরাপদ হবে।

কিন্তু দ্য তাসিনি জানতেন না, ভিন ইয়েনের পর রেড রিভার দিয়ে বেশ কিছু জল গড়িয়ে গেছে।

ভিন ইয়েন বিপর্যয়ের রিপোর্ট পৌঁছেছিল গিয়াপের কাছেও। তিনি জেনেছিলেন পরাজয়ের আগে জয়ের কত কাছাকাছি তাঁরা পৌঁছেছিলেন। সুতরাং দ্য তাসিনির সৈন্যবলকে আর ভয় করবার কিছু ছিল না তাঁদের।

সেই সঙ্গে সামরিক দৃষ্টিভঙ্গীরও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুকে সরাসরি পরাজিত করার চাইতে শত্রু সৈন্যকে কোন একটি জায়গায় যত বেশী সময় সম্ভব আটকে রেখে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ার দিকে গিয়াপ বেশি নজর দিলেন। নিছক সংখ্যাবলের চাইতে কৌশল এখন ভিয়েৎমিনদের বড় অস্ত্র হয়ে দাঁড়াল।

সুতরাং সামনা-সামনি মোকাবিলার উদ্দেশ্য নিয়ে জেনারেল দ্য তাসিনি যখন ১৯৫১ সালের ১৪ নভেম্বর একদল ছত্রী সৈন্যকে হোয়া বিনে নামিয়ে দিলেন, তখন তাঁকে নিরাশ হ'তে হয়েছিল।

কোন বাধাই আসেনি গেরিলাদের তরফ থেকে।

তার বদলে গেরিলারা তাদের ভারী ভারী মেশিনগান টেনে তুলে এনেছিল চারদিকের পাহাড়ের ওপর। বসিয়েছিল নিচের দিকে তাক করে। বসিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

অপেক্ষা করতে কোন বাধা ছিল না। কারণ হোয়া বিন তখন তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে। এই ভৌগোলিক সুবিধা আদায় করতে পারেনি ফরাসীরা। তাদের ছত্রীরা যখন এসে নামল তখন চারদিকের পাহাড়ে কঠিন ভিয়েৎমিন ব্যূহ রচিত হয়ে গেছে।

ফরাসীদের জমায়েৎ হবার প্রচুর সুযোগ দিল গেরিলারা। জেনারেল দ্য তাসিনি একে একে যতগুলি সম্ভব রিজার্ভ বাহিনীকে নিয়ে এলেন হোয়া বিনে। ব-দ্বীপ প্রায় অরক্ষিত পড়ে রইল। সেই সুযোগে ভিয়েৎমিনরা ছড়িয়ে পড়ল দক্ষিণ ব-দ্বীপ এলাকায়।

তারপর ওরা আক্রমণ আরম্ভ করল।

ফরাসীরা ছিল সম্পূর্ণ তাদের দয়ার ওপর। এইবার ওরা এক এক করে ভিন ইয়েনের প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করল।

মর্টারের প্রচণ্ড গোলায় প্রথমে বিধ্বস্ত হল হোয়া বিনের বিমানঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে থাকা প্লেনগুলি।

সৈন্য ও রসদ নিয়ে আরো প্লেন এলো। পাহাড়ের খাঁজ দিয়ে নিচু হয়ে নামতে গিয়ে সেগুলি জখম হল অত্যন্ত সহজে গেরিলাদের অব্যর্থ গুলিতে।

পাশেই ছিল ব্ল্যাক রিভার। জেনারেল দ্য তাসিনি চেষ্টা করলেন ওই নদীপথে সৈন্য পাঠিয়ে গেরিলাদের পেছন থেকে আক্রমণ করবার।

তাদের রক্তে ব্ল্যাক রিভারের কালো জল লাল হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

ভিন ইয়েনের পুনরাবৃত্তি ঘটাতেও কসুর করেননি দ্য তাসিনি। নেপাম বর্ষিত হয়েছিল হোয়া বিনের পাহাড়েও। কিন্তু আগুন স্পর্শ করতে পারেনি গেরিলাদের। কারণ ওরা এবার সুরক্ষিত ছিল মাটির নিচে। ওদের তাগিদ ছিল না বেরিয়ে আসার। ওরা ছিল পাহাড়ের অনেক ওপরে। লক্ষ্যবস্তুকে ওরা খতম করতে পারত যখন খুশি এবং যেখানে খুশি।

তিন মাস এমনি ভাবে লড়াই চলেছিল হোয়া বিনে। তিন মাস ওরা আটকে রেখেছিল দ্য তাসিনির বাহিনীকে। তিন মাস ধরে দ্য তাসিনি কেবলই অপেক্ষা করছিলেন সরাসরি বড় রকমের একটা আক্রমণের জন্যে। কিন্তু সে আক্রমণ আসেনি।

শেষে ফরাসী শিবিরে যখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবার উপক্রম হল তখন বিস্ময়ে বিস্ফারিত দ্য তাসিনি দেখলেন পাঁচ হাজারেরও বেশী ফরাসী হোয়া বিনে নিহত হয়ে গেছে।

উদ্বিগ্ন হল ফরাসীরা। ফ্রান্সের সরকারী কর্তৃপক্ষ রীতিমত

ঘাবড়ে গেলেন। ব্যস্ত হয়ে তাঁরা সরিয়ে নিলেন জেনারেল দ্য তাসিনিকে। সে জায়গায় এলেন জেনারেল রাউল সাঁলা।

এসেই সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল সাঁলা নির্দেশ দিলেন হোয়া বিন থেকে ফরাসীদের সরে আসবার জন্যে। হোয়া বিনের যুদ্ধে সেটাই ছিল তাঁর একমাত্র অবদান।

সময় হয়ত লেগেছিল বেশী, কিন্তু প্রায় বিনা ক্ষতিতে হোয়া বিন গেরিলারা আবার দখল করে নিয়েছিল।

ভিন ইয়েনে গিয়াপ যে ভুল করেছিলেন, হোয়া বিনে এসে তিনি সে ভুল সম্পূর্ণ শুধরে নিলেন। একটি মূল্যবান শিক্ষাও তিনি পেয়েছিলেন এই যুদ্ধ থেকে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দীর্ঘায়িত গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে কী চমৎকার ফল লাভ করা যায়।

হোয়া বিনের যুদ্ধ জয় করে গেরিলারা নতুন করে নিজেদের খুঁজে পেয়েছিল যেন। নতুন উদ্যমে ও টাটকা মনোবল নিয়ে ওরা জয়ের পর জয় অর্জন করে এগিয়ে চলল। আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মেঘের গর্জন যেমন গড়িয়ে গড়িয়ে চলে, ঠিক তেমনি ভাবে। কিংবা বন্যার স্রোতের মতো যেন। গ্রাম-গ্রামান্তর যেমন ভাবে ভেসে যায়, শুধু মাঝে মাঝে কয়েকটি উঁচু গাছ কিংবা উঁচু বাড়ি কিংবা উঁচু টিলা জেগে থাকে, তেমনি ভাবেই হোয়া বিনের যুদ্ধের পর, ১৯৫১ সালের বাকি সময়ে ও ১৯৫২ সালে, ভিয়েৎমিন বাহিনী ছড়িয়ে গিয়েছিল ব-দ্বীপের সমগ্র সমতল-ভূমিতে। উত্তরে, দক্ষিণে, পশ্চিমে, পূর্বে। কেবল মাঝে মাঝে কয়েকটি শহর, কিংবা কয়েকটি সুদৃঢ় ফরাসী ঘাঁটি কোন মতে মাথা জাগিয়ে ভেসে ছিল। ভিয়েৎমিনের জলরাশি তাদের গায়ে গিয়ে যে ঢেউ তোলেনি তা নয়। ঢেউ উঠেছিল, ঢেউ প্রতিহতও হয়েছিল। কিন্তু তাদের ডুবিয়ে দেবার জন্যে জলরাশি অপেক্ষা করেনি। পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল আরো বিস্তীর্ণতায় ছড়িয়ে পড়বার জন্যে।

ওই বিপুল, সর্বব্যাপী জলরাশির মাঝখানে ফরাসীদের গুটিকয় সুরক্ষিত ঘাঁটি ছিল নিতান্তই অসহায়। সেগুলি দখল করতে না পারলেও কোন ক্ষতি ছিল না ভিয়েৎমিনদের। গ্রামাঞ্চল ছিল সম্পূর্ণ ওদের দখলে।

নিজেদের ব্লকহাউসে বসে বন্যার এই অগ্রগতি লক্ষ্য করা ছাড়া ফরাসীদের আর কিছু করার ছিল না।

এইভাবে ব-দ্বীপকে করায়ত্ত করার পর জেনারেল গিয়াপ দৃষ্টি দিলেন পশ্চিমে, লিয়া লো রিজের দিকে।

রিজ, অর্থাৎ পাহাড়ের পিঠ। চার নম্বর রুটের পাহাড়ের পিঠ যেরকম ছিল, লিয়া লো'ও ছিল তেমনি। ব্ল্যাক আর রেড রিভারের মাঝখানে অনেকটা উত্তরে দক্ষিণে বিছিয়ে ছিল লিয়া লো পাহাড়ের পিঠ। এই পাহাড়টা পেরিয়ে যেতে পারলেই সোজা লাওসের সীমান্তে পেঁাছে যাওয়া যায়। সেখানে পাহাড় এদিককার চাইতে আরো বেশি উঁচু, কাজেই ওইখানে পেঁাছতে পারলে ফরাসীদের ওপর প্রচণ্ড সামরিক সুবিধা আদায় করা যায়।

কিন্তু ওইখানে পেঁাছনোর পথে বাধা ছিল বিরাট। লিয়া লো পাহাড়ের ওপর ফরাসীদের কয়েকটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। ওই সব ঘাঁটির ফাঁক দিয়ে যে গেরিলারা গলে যেতে পারত না তা নয়। কিন্তু গিয়াপ চেয়েছিলেন লাওস সীমান্ত পর্যন্ত একটা অবাধ যাতায়াতের রাস্তা। সেটা সম্ভব হবে না যদি না ওই ঘাঁটিগুলি দখল করে নেওয়া যায়।

গিয়াপ তাই এবার লিয়া লো'র ঘাঁটিগুলি দখলের জন্যে তৎপর হলেন।

তিনটি পুরো ভিয়েৎমিন ডিভিশনকে (প্রায় ৩৩ হাজার সৈন্য) তিনি নিয়োগ করলেন এই কাজে। যদিও এত সৈন্যের কোন দরকার ছিল না, কিন্তু গিয়াপ কোন ঝুঁকি নিতে চাননি। আর কোন পরাজয়ের জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

এবং পরের ঘটনায় প্রমাণ হয় যে, গিয়াপ ভুল করেননি।

ভিয়েৎমিনরা ব-দ্বীপ এলাকাতেই তৎপর এটাই জেনারেল সালাঁ জানতেন। তারা যে পশ্চিমের দিকে নজর দেবে এবং এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য ব-দ্বীপ থেকে সরিয়ে নেবে সেটা তাঁর মাথায় আসেনি। কাজেই লিয়া লো'র ঘাঁটিগুলি রক্ষার জন্যে বিশেষভাবে কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ওই অঞ্চলে আক্রমণের জন্যে ফরাসীরা আদৌ প্রস্তুতই ছিল না।

কাজেই ১৯৫২ সালের অক্টোবরে গেরিলারা যখন লিয়া লো'র পাহাড়ের পিঠে উদয় হল, তখন একটা মস্ত বিষয় ছিল তাদের অনুকূলে। তারা ফরাসীদের অবাক করেছিল। বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই অর্ধেক যুদ্ধ জয় করেছিল তারা। বাকি অর্ধেক যুদ্ধ জয় করেছিল নিছক সংখ্যাবল দিয়ে।

ওই বিপুল আক্রমণের সামনে ফরাসীরা ভেসে গিয়েছিল বন্যার মুখে কুটোর মতো। সাহায্য আসবার কোন সময়ই ছিল না।

চার নম্বর রুটের জয় যেমন একবার বাঁধ ভেঙে দিয়েছিল, তেমনি লিয়া লো'র বিজয় আরেকবার এবং আরো বিরাট ফাটল ধরালো ফরাসী প্রতিরক্ষার দেয়ালে। এই ফাটল দিয়ে গেরিলারা এখন আরো সহজে, আরো অবাধে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। গুরুত্বপূর্ণ লাওস সীমান্ত এখন তাদের জন্যে উন্মুক্ত। গোটা টংকিনেই এখন তাদের কার্যকর প্রভাব বিস্তীর্ণ।

বিভ্রান্ত সালাঁ দেখলেন, শ্যাওলা তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। তিনি দু'হাতে শ্যাওলা সরিয়ে ইতস্তত এগিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার পেছনে ফাঁকটুকু ভরে যেতে লাগল।

জেনারেল সালাঁর মামুলী মাথা ভেবে পাচ্ছিল না কী করে এটা সম্ভব।

১৯৫৩ সালের গোড়ায় এই যখন ছিল অবস্থা—টংকিনের অধিকাংশ গেরিলাদের দখলে, অধিকাংশ ফরাসী সৈন্য কতগুলি বিচ্ছিন্ন শহর আর ঘাঁটি রক্ষার কাজে আটকে আছে, আর যে অংশ গতিশীল আছে তারাও গেরিলাদের পেছন পেছন ধাওয়া করতে করতেই ক্লান্ত, জেনারেল সালাঁর অসহায়তা যখন ক্রমেই ফুটে উঠছে, ফ্রান্সের ভেতর যখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়ে উঠছে, —তখন জেনারেল গিয়াপ চূড়ান্ত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু তিনি সামনা-সামনি কোন ফরাসী ঘাঁটিতে গিয়ে চড়াও হলেন না। তাতে লোকক্ষয়ের সম্ভাবনা খুব বেশি। গেরিলা যুদ্ধে এইভাবে লোকক্ষয় হ'তে দেবার কোন দরকার নেই।

তার বদলে তিনি লাওসে অনুপ্রবেশের সিদ্ধান্ত নিলেন।

লাওসে তখন ভিয়েৎনামের সীমান্তবর্তী এলাকায় পাথেট লাও বিদ্রোহীরা সক্রিয় ছিল। সেখান থেকে ওরা লড়াই চালাচ্ছিল রাজার বিরুদ্ধে। বিদ্রোহীদের নেতা প্রিন্স সুফানুভং সে সময় ছিলেন ভিয়েৎমিনদের হেড কোয়ার্টারে।

লাওস অভিযানের পেছনে হো চি মিন ও গিয়াপের একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল পাথেট লাও বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করা। কিন্তু আরেকটি উদ্দেশ্যও ছিল: জেনারেল সালাঁর বাহিনীকে টংকিন থেকে যতটা সম্ভব টেনে বার করে এনে লাওসের পাহাড়ে জঙ্গলে ছড়িয়ে দেওয়া। সেইটাই ছিল প্রধান।

এই অভিযান ছিল একটা চমৎকার ওস্তাদের মার। ফাঁদে পা দিয়েছিলেন সালাঁ। না দিয়ে উপায় ছিল না। কারণ তাহলে লাওস অবাধ হয় গেরিলাদের জন্যে।

সুতরাং ৯ এপ্রিল যখন তিনটি ভিয়েৎমিন ডিভিসন মক চাউ নামক একটি জায়গা থেকে তিন দিক দিয়ে লাওসে প্রবেশ করল, তখন লাওসের নিরাপত্তার জন্যে উৎকণ্ঠিত জেনারেল সালাঁকেও বাধ্য হয়েই যেতে হয়েছিল তাদের পিছু পিছু।

গিয়াপ মনে মনে হাসছিলেন ফ্রান্সের এই কেতাবী জেনারেলের বুদ্ধি দেখে। তাঁর কৌশল এত ভালভাবে খেটে যাবে তা তিনি নিজেও হয়ত ভাবতে পারেননি। লাওসে যে ফরাসী সৈন্যরা ছিল, আগুয়ান ভিয়েৎমিনদের সামনে থেকে তারা ক্রমেই আরো ভেতরে সরে যেতে লাগল। আর যত তারা পেছনে সরতে লাগল জেনারেল সালাঁকে ততই বাধ্য হয়ে আরো আরো সৈন্য পাঠাতে হল টংকিন থেকে। পাঠাতে হল বিমান। তাদের হাতে যত ছিল প্রায় সব।

কারণ ভিয়েৎমিনরা লুয়াং প্রবাং ও ভিয়েন্তিয়েনের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। জেনারেল সালাঁ ভাবলেন গেরিলারা বুঝি লাওস দখল করে নিতে চায়।

কিন্তু লাওস দখল করার ইচ্ছা গিয়াপের ছিল না। এই উদ্দেশ্য তাঁর ওপর আরোপ করার অর্থ হল ইতিহাসের অপব্যাখ্যা করা। গিয়াপ যা চেয়েছিলেন তা হল ফরাসী-বাহিনীকে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে বার করে এনে তাদের মূল সরবরাহ ঘাঁটি হ্যানয় থেকে যত দূরে সম্ভব নিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া।

এই উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হল, সালাঁর বাহিনী যখন হ্যানয় থেকে শ তিনেক মাইল দূরে গিয়ে পৌঁছেছে এবং যখন তার পরেও সালাঁ আরো সৈন্য পাঠিয়ে চলেছেন, তখন সালাঁকে তাঁর দুঃস্বপ্নে ভুলিয়ে রাখার জন্যে একটি ডিভিসন সেখানে রেখে গিয়াপ দুটি ডিভিসনকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন টংকিনে।

ফরাসীরা এই চাল মোটেই বুঝতে পারেনি। তারা ভেবেছিল তিনটি ডিভিসনই লাওসে রয়েছে এবং লাওস দখল করে নেওয়াই গেরিলাদের উদ্দেশ্য।

এই ভেবে তারা সেখানেই ঘুরে মরতে লাগল।

তখন মে মাস।

এই খবর যখন ফ্রান্সে পৌঁছল তখন রব উঠল সামাল সামাল।

ফরাসী সরকার দেখলেন টংকিন সম্পূর্ণ অরক্ষিত এবং হ্যানয়-হাইফং বেড়াজালের মধ্যেও অধিকাংশ স্থানই তাদের হাতছাড়া।

ওদিকে আন্নামে উয়ে, দানাং ও না ত্রাংয়ের আশেপাশে কিছু এলাকা ছাড়া আর সবই গেরিলাদের দখলে।

কোচিন চীনের অবস্থা যদিও একটু ভালো, তবু সেখানেও, বিশেষ করে মেকং ব-দ্বীপ এলাকায়, ভিয়েৎমিনরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

এই যেখানে অবস্থা সেখানে জেনারেল সালাঁ তাঁর অধিকাংশ বাহিনীকে লাওসে ঢুকিয়ে দিয়ে বসে আছেন।

জেনারেল সালাঁ যে ফরাসী সামরিক শক্তিকে কতখানি অসহায় ও বিপন্ন করে তুলেছেন সেটা এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল।

ফরাসী সরকার ভাবলেন, তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা সালাঁকে দিয়ে হবে না। সালাঁর মস্তিষ্ক অনেক আগেই দেউলে হয়ে গিয়েছিল।

অতএব মার্কিনী বাগ্বিধি অনুসারে জেনারেল সালাঁকে 'গুলি' করা হল। অর্থাৎ ছাঁটাই।

তাঁর জায়গায় নতুন নায়ক এলেন জেনারেল অঁরি নাভার। ১৯৫৩ সালের ৮ মে।

কিন্তু পরিবর্তন হল শুধু ব্যক্তির, দৃষ্টিভঙ্গীর মোটেই নয়। দেখা গেল, সালাঁ যে ভুল করেছিলেন নাভার-ও ঠিক সেই ভুলই করতে যাচ্ছেন। ভিয়েৎমিনদের উদ্দেশ্য ও কৌশল দুজনের কেউই বুঝতে পারেননি।

ফ্রান্স তখন যুদ্ধ করে করে এত ক্লান্ত, তার মনোবল তখন এত নিচু যে, এই ভুল দেখিয়ে দেবার মতো বুদ্ধি অবশিষ্ট ছিল না আর কারো মস্তিষ্কেও।

নাভার সঙ্গে করে এনেছিলেন একটি পরিকল্পনা। সামরিক

বিপর্যয় রোধ করবার পরিকল্পনা, যা শুধু ফরাসীদের চূড়ান্ত পরাজয় থেকে রক্ষা করবে না, বছর তিনেকের মধ্যে ভিয়েৎমিনদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করবে।

দুটি ভাগ ছিল নাভারের পরিকল্পনায়। প্রথমত, তিনি চেয়েছিলেন অন্তত বছর দেড়েক দুয়েক টংকিনে ভিয়েৎমিনদের সঙ্গে কোন বড় রকমের লড়াইয়ে তিনি নামবেন না। যতটা সম্ভব লড়াই এড়িয়ে এড়িয়েই চলবেন। দ্বিতীয়ত, এইভাবে হাঁফ ছাড়ার যে সুযোগটুকু পাওয়া যাবে সেই সুযোগে বাও দাই'র সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী ও সুশিক্ষিত করে তোলা হবে। এতে লাভ হবে এই ঃ আন্নাম ও কোচিন চীনের দায়িত্ব বাও দাই'র বাহিনীকে দিয়ে সেখান থেকে ফরাসীদের নিয়ে আসা হবে টংকিনে। তারপর বর্ধিত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া হবে ভিয়েৎমিনদের ওপর।

কিন্তু আশা যেমন ছিল, তেমনি আশার ছলনাও ছিল। ভিয়েৎনামে পোঁছেই জেনারেল নাভারেরও বুদ্ধি গেল বিগড়ে। সালাঁর মতো তিনিও ধরে নিলেন—কী অদ্ভুত ধারণা—টংকিন ছেড়ে দিয়ে ভিয়েৎমিনরা এখনও লাওস দখল করতেই চায় এবং সেই দিকেই তারা গেরিলা বাহিনীকে পরিচালিত করছে!

নাভার ভাবলেন, বাঃ! মেঘ না চাইতেই জল! ভিয়েৎমিনদের অধিকাংশ বাহিনী রয়েছে লাওসে। কাজেই যদি ওই বাহিনী এবং ভিয়েৎমিন মূল ঘাঁটির মধ্যে যোগাযোগের রাস্তা সর্ব শক্তি দিয়ে আটকে দেওয়া যায়, তাহলেই তো কেল্লা ফতে। গিয়াপের বাহিনী আর মূল ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবে না, আর সেই সুযোগে তাদের ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করা যাবে।

আনন্দের চোটে নাভার সেদিন লাফিয়ে উঠেছিলেন কিনা আমি জানি না, কিন্তু তাঁর মূল পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

খোঁজ নিয়ে জানলেন নাভার, টুয়াম ইয়াও নামে একটা

জায়গায় ভিয়েৎমিনদের একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি আছে। তিনি ভাবলেন, সেখান থেকেই হয়ত লাওসের অভিযান আরম্ভ করবে গেরিলারা।

এবং টুয়াম ইয়াও থেকে লাওসের রাস্তা কোথা দিয়ে গিয়েছে?

ম্যাপ দেখলেন নাভার। টুয়াম ইয়াও থেকে একটি রাস্তাই গিয়েছে লাওসের দিকে, আর সেই রাস্তা গিয়েছে দিয়েন বিয়েন ফু'র ওপর দিয়ে।

সুতরাং রাস্তা যদি আটকাতে হয় তো দিয়েন বিয়েন ফু'তে।

দিয়েন বিয়েন ফু! ভিয়েৎনামের ইতিহাসে যা একটি জল-বিভাজিকার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দিয়েন বিয়েন ফু! যেখানে ইতিহাস মোড় নিয়েছে সম্পূর্ণ নতুন এক পথে।

কিন্তু জেনারেল নাভার অত্যন্ত সাধারণ একটা কথা ভুলে গিয়েছিলেন। দিয়েন বিয়েন ফু দিয়ে যে গেরিলাদের যেতেই হবে তেমন কোন কথা নেই। জঙ্গল যাদের আশ্রয়, পাহাড় ডিঙিয়ে যাদের নিত্য চলাফেরা, জল-কাদায় কিংবা ঘাসের বনের ভেতর দিয়ে যারা বুকে হেঁটে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে যায়, শহর-গঞ্জ কিংবা বাঁধানো সড়ক দিয়ে তাদের না গেলেও চলে।

এমন অনেকবার হয়েছে ফরাসীরা কোন গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটির পত্তন করেছে গেরিলাদের পথরোধ করবার জন্যে। খোঁজ পেয়ে ওরা অনেকটা ঘুরে ঠিক তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছে।

হোয়া বিনের যুদ্ধের সময় এইরকম হয়েছিল। গেরিলাদের দরকার ছিল লো নামে একটা নদী পার হবার। কিন্তু নদীর দক্ষিণ তীরে ফরাসীদের কড়া পাহারা। নদীতে ফরাসী নৌকা

সব সময় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থায় কী করে পার হওয়া যায়?

সমস্যা বটে। কিন্তু সমস্যার সমাধানও পাওয়া গেল সঙ্গে-সঙ্গে। নদী থেকে মাইল দশেক দূরে একটা জায়গায় জড়ো হ'ল গেরিলারা। ডাকল গ্রামবাসীদের। চটপট বানিয়ে ফেলল কয়েকটা নৌকা। তারপর গ্রামবাসীদের সহায়তায় সেগুলি কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেল বেশ কিছু দূরে নদীর তীরের একটা নিভৃত জায়গায়। হোয়া বিন থেকে অনেকখানি নিচে। ফরাসী টহল ওই পর্যন্ত পৌঁছয়নি। কারণ, তারা ভাবতেই পারেনি যারা হোয়া বিনে আসতে চায় তারা এত দূরে গিয়ে নদী পার হবে।

হ্যাঁ, এত দূরে গিয়েই নদী পার হয়েছিল গেরিলারা। রাতের অন্ধকারে। তারপর গ্রামবাসীরা আবার সেই নৌকাগুলি কাঁধে করে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল যেখান থেকে এসেছিল সেখানে, যাতে ফরাসীরা ঘুণাক্ষরেও কিছু বুঝতে না পারে।

কাজেই দিয়েন বিয়েন ফু দিয়ে ওদের যেতেই হবে এমন কি কথা আছে?

কিন্তু বুদ্ধি যখন লোপ পায় তখন আর আগুপিছু বিবেচনা করার মত অবস্থা থাকে না। জেনারেল নাভারেরও ছিল না। অতএব তিনি দিয়েন বিয়েন ফু'তে সর্বশক্তি নিয়োগ করে গেরিলাদের পথরোধ করবার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

এবং এই উদ্দেশ্যে সাহায্য চাইলেন আমেরিকার।

আমেরিকা, আমি আগেই বলেছি, ফ্রান্সকে সামরিক সাহায্য কয়েক বছর ধরেই দিয়ে আসছিল। ১৯৫০ থেকে কোন না কোন ভাবে বছরে গড়পড়তা ৫০ কোটি ডলারের মতো। কিন্তু তাতে কুলোচ্ছিল না। নাভার দেখলেন, ফরাসীদের অস্ত্রশস্ত্র যা আছে সব পুরনো হয়ে গেছে, নতুন অস্ত্রশস্ত্র দরকার। দরকার

বিমানেরও। সামরিক বাহিনীর সম্প্রসারণ করাও একান্ত আবশ্যক। কারণ ভিয়েৎমিনদের তখন ছিল সোয়া লক্ষেরও বেশী নিয়মিত সৈন্য, ৭৫ হাজার আঞ্চলিক সৈন্য, আর দুই থেকে সাড়ে তিন লাখ গ্রামরক্ষী বাহিনী। সে তুলনায় ফরাসীদের হাতে মাত্র ১ লক্ষ ৯০ হাজার সৈন্য, যার মধ্যে লাখ খানেকেরও বেশী পাহারাদারীর কাজে আটকে ছিল। আর ছিল বাও দাই সরকারের লাখ খানেকের মতো সৈন্য। সুতরাং সৈন্য সংখ্যা না বাড়াতে পারলে গেরিলাদের সঙ্গে পেরে ওঠার আশা নেই।

জেনারেল নাভার তাঁর ফর্দ নিয়ে গেলেন প্যারিসে, প্যারিস থেকে দূত গেল ওয়াশিংটনে। ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরে মার্কিন সরকার ঘোষণা করলেন, ইন্দোচীনের যুদ্ধের জন্যে ফ্রান্সের যা খরচা হবে তার শতকরা ৭০ ভাগ পর্যন্ত তাঁরা বহন করবেন।

প্রকৃতপক্ষে দিয়েন বিয়েন ফু'তে ভিয়েৎমিনদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্যে নাভারের পরিকল্পনায় আমেরিকার উৎসাহই ছিল সবচেয়ে বেশী। ফরাসী সরকার বরং চটেই ছিলেন নাভারের ওপর তাঁর মূল পরিকল্পনা বাতিল করে দেওয়াতে। কিন্তু মার্কিন সরকার যখন যুদ্ধের অধিকাংশ ব্যয় বহন করতে রাজী হলেন এবং প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার যখন ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখালেন এই ব্যাপারে, তখন আপত্তি টিকল না।

অতএব নাভার পূর্ণ উদ্যমে দিয়েন বিয়েন ফু দখল করে নিয়ে একটি দুর্ভেদ্য ফরাসী শিবির পত্তনের জন্যে অগ্রসর হলেন। দখল করে, কারণ দিয়েন বিয়েন ফু সেই সময় ছিল ভিয়েৎমিনদের হাতে।

হ্যানয়ের ২০০ মাইল পশ্চিমে একটি বড় গ্রামের নাম দিয়েন বিয়েন ফু। মাইল বারো লম্বা আর মাইল আটেক চওড়া একখণ্ড

সমতলভূমি। সমতল বললে অবশ্য পুরো ঠিক বলা হয় না। কারণ, ধান ক্ষেতের মাঝে মাঝে এধার-ওধার কয়েকটা টিলা। ন্যাড়া। বেশি উঁচুও নয়।

একটি ছোট নদী বয়ে গেছে সমতলের মাঝখান দিয়ে, উত্তর থেকে দক্ষিণে। নদীর নাম 'নাম নন'। কয়েকটা উপনদী এসে মিশেছে তার সঙ্গে।

হৃৎপিণ্ডের আকারের এই সমতলভূমির চারদিকে রয়েছে পাহাড়। খুব একটা উঁচু পাহাড় নয়, কিন্তু খাড়া। সমতলের দিক থেকে সে পাহাড় বেয়ে ওঠা একরকম দুঃসাধ্য। আর নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা। উঁচু উঁচু গাছের ওই ভিড় ছিল দুর্ভেদ্য।

সব মিলিয়ে চেহারাটা একটা দেয়াল-ঘেরা উঠোনের মতো। কিংবা ঠিক যেন একটি অ্যামফিথিয়েটার, চারদিক ঘিরে দর্শকদের আসন, মাঝখানে নাটকের রঙ্গমঞ্চ।

তিন দিক থেকে তিনটি রাস্তা এসে মিলেছে দিয়েন বিয়েন ফু'তে। একটি রাস্তা গেছে উত্তরে, লাই চাউ হয়ে চীনের দিকে। আরেকটি তুয়াম ইয়াও হয়ে উত্তর-পশ্চিমে। তৃতীয়টি গেছে দক্ষিণে, লাওসে। লাওসের সীমান্ত এখান থেকে মাত্র দশ মাইল।

এছাড়া ছিল দুটি এয়ারস্ট্রিপ। ফরাসীরাই একসময় বানিয়েছিল। একটি বড়, দিয়েন বিয়েন ফু গ্রামের কাছাকাছি। আরেকটি ছোট, মাইল তিনেক দক্ষিণে।

১৯৫৩ সালের ২০ নভেম্বর জেনারেল নাভার তিন ব্যাটেলিয়ন ছত্রী সৈন্য নামিয়ে দিলেন দিয়েন বিয়েন ফু'র মাটিতে। এই পাহাড়-ঘেরা অ্যামফিথিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে যে নাটকের দৃশ্য উন্মোচিত হ'তে চলেছিল আর কয়েক মাসের মধ্যে, এরাই ছিল তার প্রথম অভিনেতা।

সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে গেল একটি সুরক্ষিত গ্যারিসন তৈরী করার

কাজ। 'নাম নন' নদীর ধারে গ্রাম ও বড় এয়ারস্ট্রিপের মাঝামাঝি স্থাপিত হল কম্যাণ্ড হেডকোয়ার্টার। তাকে ঘিরে উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে চারটি শক্তিশালী শিবির: ডমিনিক, ক্লোদিন, ইলেন ও উগুয়েত। এই মূল ঝাঁকের চারপাশেও একটু দূরে দূরে আবার চারটি সশস্ত্র শিবিরের পত্তন হল: তিনটি টিলার ওপর বেয়াত্রিস, গাব্রিয়েল ও ইসাবেল এবং ফাঁকা ধানক্ষেতের ওপর আন মেরি। বেয়াত্রিস, গাব্রিয়েল ও ইসাবেল ছিল প্রায় পাহাড়ের দেয়ালের কাছাকাছি।

শিবিরগুলি এমনভাবে সাজিয়েছিলেন নাভার যাতে কোন একটি শিবির আক্রান্ত হলে অন্য শিবির থেকে গোলাবর্ষণ করে তাকে রক্ষা করা যায়। পরিকল্পনা ছিল এই রকম: দূরের শিবিরগুলি ভিয়েৎমিনদের প্রথম আক্রমণ ঠেকাবে এবং ইতিমধ্যে মূল ঝাঁকের শিবিরগুলি তৈরী হয়ে নিতে পারবে পাল্টা আক্রমণের জন্যে।

ফেব্রুয়ারিতে ফরাসী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মঁ প্লভাঁ দিয়েন বিয়েন ফু'তে এসে ব্যবস্থাপনা দেখে গিয়ে বললেন সব ঠিক আছে।

মার্চের গোড়ায় গ্যারিসনের শক্তি বাড়িয়ে করা হল ১২ ব্যাটেলিয়ন। এছাড়া এলো অজস্র বন্দুক, ভারী ভারী কামান, ট্যাঙ্ক। এলো অন্তত আধ ডজন জঙ্গী বিমান।

কিন্তু নাভারের পরিকল্পনা বিগড়ে গেল প্রথম থেকেই। দিয়েন বিয়েন ফু'তে তিনি এসেছিলেন এখানে থেকে গেরিলাদের চলার পথে বাধা দেবেন বলে। তার জন্যে দরকার ছিল টহলদারীর। কিন্তু নাভারের বাহিনী এসেই একেবারে আটকে গেল বারো মাইল লম্বা আট মাইল চওড়া ওই সমতলভূমির মধ্যেই। সেখান থেকে কোন দিকেই তার বেরোবার উপায় ছিল না। বেরোলেই গেরিলাদের চোরাগোপ্তা আক্রমণ।

নাভার নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা দিয়েছিলেন।

গিয়াপ এর চাইতে ভালো কিছু আশা করতে পারতেন না। নাভার তাঁর প্রধান শক্তিকে জড়ো করেছিলেন ফাঁকা মাঠে। চারদিকের পাহাড় ছিল গেরিলাদের জন্যে ফাঁকা। ওই পাহাড় থেকে নিচের বাহিনীকে শেষ করে দেওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার।

ধীরে ধীরে, অলক্ষ্যে কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে গিয়াপের বাহিনী পাহাড়ের গায়ে এসে জমতে লাগল।

ফরাসী বিমান অবশ্য টহল দিত আকাশে। কিন্তু নীরব বনাঞ্চল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ত না তাদের।

পড়ার উপায় ছিল না। কেননা ওই সব গাছ শ' খানেক ফুট কি তারও বেশী উঁচু। শ'খানেক ফুট নিচে দিয়ে পাতার আচ্ছাদনে নিজেদের সম্পুর্ণ আচ্ছাদিত করে বুকে হেঁটে পাহাড়ে উঠত গেরিলারা। তা-ও বেশীর ভাগই রাতের অন্ধকারে।

ওদের অস্ত্রশস্ত্র, ওদের গোলাবারুদ, ওদের রসদ আসত অগণিত লোকের পিঠে পিঠে, কিংবা হাতে টেনে আনা সাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে। হাজার হাজার সাইকেল ওরা লাগিয়ে দিয়েছিল এই কাজে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন গ্রামের হাটে কাঁচা তরি-তরকারী নিয়ে যাচ্ছে কোন কৃষক। কিন্তু তরি-তরকারীর ওই ক্যামোফ্লেজের নিচে ছিল অস্ত্রশস্ত্র। বড়ো অস্ত্র নয়, অস্ত্রের অংশ। এইভাবে নিতেও সুবিধা, চোখেও পড়ে না। সেই অংশ যেত পাহাড়ে, সেখানে জোড়া লাগানো হ'ত সেগুলি। বসানো হ'ত জায়গা বুঝে পাহাড়ের গায়ে নিচের ফরাসী শিবিরের দিকে তাক করে। একটা অদৃশ্য কনভেয়ার বেল্টের মতো সমস্ত ব্যাপারটা চলত, ধীরে ধীরে কিন্তু অব্যর্থ গতিতে।

ফরাসীরা আরো টের পেত না, কারণ গেরিলারা বিমানগুলিকে টহল দিতে দিত বিনা বাধায়। কারণ ওই টহলে তাদের কোন ক্ষতি নেই। অপর পক্ষে বাধা দিলে তাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে ফরাসীদের কেবল সতর্কই করে দেওয়া হবে।

টের পেত না এই জন্যেও যে, নাভারের নজর বিক্ষিপ্ত করে দেবার জন্যে গিয়াপ টংকিনে ও আন্নামে কিছু কিছু জায়গায় অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। নাভার ভাবলেন ভিয়েৎমিনরা বুঝি অন্য মতলব করছে। তাই ওই সব বিক্ষিপ্ত হামলার মোকাবিলা করার জন্যে তাঁকে কিছু কিছু সৈন্য সেখানে পাঠাতেই হল।

এইভাবে ফরাসী সামরিক শক্তিকে বিকেন্দ্রিত করে গিয়াপ দিয়েন বিয়েন ফু'তে নিজের শক্তিকে কেন্দ্রায়িত করবার জন্যে তৎপর হলেন।

তিন মাস ধরে চলল তাঁর প্রস্তুতি। হাজার হাজার মানুষ, হাজার হাজার সাইকেল নদী পার হয়ে, নালা ডিঙিয়ে, শত শত জঙ্গলের পথ ধরে দিন-রাত্রি চলতে লাগল শুধু একই লক্ষ্যের দিকে : দিয়েন বিয়েন ফু। চারটি পুরো ডিভিশন এবং একটি ডিভিশনের অংশ এই তিন মাস ধরে জমায়েত হয়েছিল এক এক করে। এসেছিল চীন থেকে মলোটভা ট্রাক গোলাবারুদের বাক্স নিয়ে। অন্তত ২০০টি কামান ওরা জড়ো করেছিল; বেশ কিছু বিমানধ্বংসী কামান, এবং কিছু রুশীয় রকেট লঞ্চার।

দিয়েন বিয়েন ফু'র ফরাসী কম্যাণ্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল ক্রিস্তিয়াঁ দ্য লা ক্রোয়া দ্য কাস্ত্রিস। বাইনোকুলার লাগিয়ে তিনি প্রত্যেক দিন ঘুরে ফিরে দেখতেন চারপাশের পাহাড়। বুঝতে চাইতেন গেরিলারা কোথায়, কতদূর।

একটা অজানা আশঙ্কায় তাঁর মন চিন্তিত হয়ে উঠত। পুরোপুরি ভিয়েৎমিন-অধ্যুষিত একটি জায়গায় এই ঘাঁটি তিনি আগলে বসে আছেন, এবং দিনের পর দিন অপেক্ষা করছেন কখন আক্রমণ আসবে।

আক্রমণ আসত না।

নিষ্ফল প্রতীক্ষায় দ্য কাস্ত্রিস শুধু মাঝে মাঝে খবর পেতেন কোন্ টহলদার দল গ্রামের পথে টহল দিতে গিয়ে আর ফেরেনি।

কোথায় ভিয়েৎমিনদের একটা দলকে চলাফেরা করতে দেখা গেছে।

এবং লক্ষ্য করতেন দ্য কাস্ত্রিস, টহলদার বাহিনীর গতিবিধির সীমারেখা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। যুদ্ধ তখনও আরম্ভ হয়নি অথচ এরই মধ্যে কমপক্ষে ১,০৩৭ জন ফরাসী সৈন্য হতাহত।

শেষে ফরাসী বাহিনী কেবল দিয়েন বিয়েন ফু'র বারো মাইল লম্বা আট মাইল চওড়া সমতলের মধ্যেই পাহারা দিয়ে বেড়াতে লাগল।

দ্য কাস্ত্রিস দেখলেন তারপরেও গণ্ডী সঙ্কুচিত হচ্ছে। কারণ টহলদারদের আর পাহাড়ের কাছ পর্যন্ত যাবার উপায় ছিল না। গেলেই পাহাড় থেকে ছুটে আসত গুলি।

তখন ফেব্রুয়ারির শেষ। দ্য কাস্ত্রিস বেশ বুঝতে পারলেন একটা শক্ত ফাঁস ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে।

কিছুই করবার ছিল না তাঁর। মাঝে মাঝে কামান অবশ্য দাগতেন পাহাড়ের দিকে। কিন্তু ওই জঙ্গলের মধ্যে গোলাগুলি হারিয়ে যেত খড়ের গাদায় ছুঁচের মতো। মাত্র ক'টি প্লেন তাঁর হাতে। তখন পর্যন্ত গুটি ছয়েক বোমারু বিমান বড়জোর। তাতে ওই বিরাট পাহাড়ী এলাকার কতটুকু ধ্বংস দূরের কথা স্পর্শ করা সম্ভব?

অথচ হ্যানয় বা সায়গনেরও তখন এমন অবস্থা নয় যে আরও বেশী প্লেন পাঠায়। গোটা ইন্দোচীনে তখন প্লেন ছিল মাত্র চারশ'র কিছু বেশী। গিয়াপের কৌশলে সেগুলি আটকে ছিল অন্যত্র, অনেক দূর দূর অঞ্চলে। বেশ কিছু ছিল লাওসে।

১০ মার্চ ভিয়েৎমিন গেরিলারা, অনেকটা নেট প্র্যাকটিশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে, বড় রাণওয়ের ওপর এক ঝাঁক গোলা ছিটিয়ে দিল। লেলিহান আগুনের চিতা জ্বলে উঠল একটি প্লেনের গায়ে।

আতঙ্কিত হলেন দ্য কাস্ত্রিস। রাণওয়ের ক্ষতি হওয়ার অর্থ হল বাইরে থেকে সাহায্য আসা বন্ধ হওয়া। এবং এর ফল: পাহাড়ের দেওয়াল ঘেরা এই উঠোনে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করা।

১১ই মার্চ তখনো সকাল হয়নি, বারুদ ফাটিয়ে গাব্রিয়েলের কাঁটাতারের বেড়া ছিঁড়ে একটি ভিয়েৎমিন সুইসাইড স্কোয়াড ঢুকে পড়ল শিবির এলাকার মধ্যে। সকালে ফরাসী ট্যাঙ্ক যখন এসেছিল তাদের সরাবার জন্যে, তারা প্রাণ দিয়েছিল লড়াই করতে করতে।

পরের দিন একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এসেছিল দিয়েন বিয়েন ফু'র বুকে। গেরিলারা ওই দু'দিন আর কোন আক্রমণ করেনি। কেবল নাভারের বিমান বাইরে থেকে উড়ে এসে নেপাম আর বোমা ছিটিয়ে দিয়ে আবার ফিরে গিয়েছিল লাওসে ও মধ্য ভিয়েৎনামে যেখানে নাভার ভাবছিলেন তিনি আসল লড়াই করছেন।

১৩ মার্চও সারাদিন বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেনি। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো। দ্য কাস্ত্রিস ভাবলেন বুঝি আরেকটা দিন নির্বিঘ্নে পার হবে।

হঠাৎ চারদিক থেকে সমস্ত কামান যেন গর্জে উঠল একসঙ্গে। ওরকম গর্জন ইন্দোচীনে আগে আর কেউ কখনো শোনেনি। যেন কোন প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়ল পাহাড়গুলি। যেন নরক উন্মুক্ত হল তার সমস্ত ভয়াবহতা নিয়ে।

ওই প্রচণ্ড গোলাবৃষ্টির আড়ালে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো গেরিলারা নেমে এলো পাহাড় থেকে, স্রেফ সংখ্যার জোরে ভেঙে চুরমার করে দিল ফরাসীদের প্রতিরক্ষার ব্যূহ। জাল যেমন ক্রমশ ছোট হ'তে থাকে তেমনি একই ভাবে ওরা ঘিরে ধরল বেয়াত্রিস, গাব্রিয়েল ও আন মেরি শিবির তিনটিকে এক সঙ্গে। নাভারের পরিকল্পনা ছিল কোন একটি শিবির আক্রান্ত হলে অন্য শিবির

থেকে সাহায্য আসবে। এর কোন উপায়ই রইল না। মাঝ রাত্রে বেয়াত্রিস গেরিলাদের দখলে চলে এলো, পরের রাত্রে গাব্রিয়েল, আর ১৭-১৮ তারিখের রাত্রে আন মেরি।

ভিয়েৎমিনদের প্রথম ধাক্কাতেই নাভারের যুদ্ধের সাধ সঙ্কুচিত হয়ে এলো মূল ঝাঁকের মধ্যে। গেরিলাদের পক্ষে হয়ত নিহত হয়েছিল কমসে কম আড়াই হাজার, কিন্তু ফরাসীদের পক্ষে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ছিল এত বেশি যে, প্যারাস্যুটের সাহায্যে নতুন সৈন্য পাঠানো হলেও (রানওয়ে অকেজো হয়ে যাবার পর) বেয়াত্রিস, গাব্রিয়েল ও আন মেরি পুনর্দখল করবার মত শক্তি ওরা আর অর্জন করতে পারেনি।

প্লেন এসেছিল বটে ক্রমশ বেশী সংখ্যায়, কিন্তু নামবার উপায় ছিল না। ব্যর্থ আক্রোশে প্রত্যেকদিন প্রায় ৭৫ থেকে ৮০টি জঙ্গী ও বোমারু প্লেন এসে ছিটিয়ে দিয়ে যেতে লাগল নেপাম ও বোমা। কিন্তু দিয়েন বিয়েন ফু আর ভিন ইয়েন এক ছিল না। ভিন ইয়েনে ছিল না কিন্তু দিয়েন বিয়েন ফুতে গেরিলাদের হাতে ছিল বিমানধ্বংসী কামান। হাতের টিপ ওদের অব্যর্থ। একটু নিচে নেমে এলেই গুলি মেরে মাটিতে নামাবেই ওরা প্লেনকে। নামিয়েও ছিল। অন্তত ৬২টি প্লেন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল এইভাবে, এবং কমপক্ষে ১৭টি প্লেন হয়েছিল দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

এর পর থেকে যুদ্ধ আর যুদ্ধ রইল না। চলল দু' পক্ষের ধৈর্যের পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মীমাংসা সম্পর্কে সেদিন অন্তত গিয়াপের মনে কোন সংশয় ছিল না। প্রায় ১৬ হাজার ফরাসী সৈন্য আটকে আছে সমতলের মাঝখানে চারটি মূল শিবিরের মধ্যে। তাদের বেরোবার রাস্তা বন্ধ, বাইরে থেকে সাহায্যের প্রধান পথও অবরুদ্ধ। আর তাদের ঘিরে চার পাশের পাহাড়ে প্রস্তুত রয়েছে গিয়াপের দুর্ধর্ষ বাহিনী। এবং ওরা শুধু পাহাড়েই নেই।

নেমে এসেছে মাটিতে। ট্রেঞ্চ কেটে কেটে বৃত্তের আকারে ওরা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। প্রত্যেক দিন সকালে উঠে বিস্মিত দ্য কাস্ত্রিস দেখতে পান ওরা আরেকটু কাছে এসে গেছে। আরও, আরও কাছে।

শেষের দিকে সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখাই প্রধান দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়াল। সরবরাহ আসত আকাশ থেকে, প্যারাসুটের সাহায্যে। আগে যখন গেরিলারা পাহাড় ছেড়ে নেমে আসেনি, তখন কোন সমস্যাই ছিল না। কিন্তু এখন গেরিলারা মাটির বুক চিরে চিরে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। এখন আকাশ থেকে রসদ নিয়ে যে প্যারাসুটগুলি নামে তার অধিকাংশই পড়ে গেরিলাদের হাতে।

এমন কি হ্যানয় থেকে দ্য কাস্ত্রিসের জন্যে যে মদের বোতল আসত, সেগুলিও পড়তে লাগল গেরিলাদের হাতে।

ক্রমে দিয়েন বিয়েন ফুতে ফরাসীদের হাতে থাকল মাত্র একটা পার্কের মতো জায়গা।

আতঙ্কে বিস্ফারিত জেনারেল নাভার প্রাণের দায়ে আমেরিকার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর হাতে প্লেন নেই। মার্কিন বিমান বহর যদি ব্যাপক হস্তক্ষেপ করে তাহলেই কেবল দিয়েন বিয়েন ফু রক্ষা পেতে পারে, নইলে আর কোন উপায় নেই।

নাভারের এস-ও-এস নিয়ে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে ফরাসী সরকারের দূত গেলেন ওয়াশিংটনে। মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ ইতিমধ্যেই ১৪০ কোটি ডলারে গিয়ে দাঁড়িয়েয়ছিল। সব শুনে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার তাঁর অফিসারদের নির্দেশ দিলেন, দিয়েন বিয়েন ফু রক্ষার জন্যে যা কিছু করা দরকার সবই যেন করা হয়।

৩ এপ্রিল আইজেনহাওয়ারের পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস মার্কিন কংগ্রেসের আট জন প্রভাবশালী সদস্যকে নিয়ে এক

গোপন বৈঠকে মিলিত হলেন। উদ্দেশ্য: দিয়েন বিয়েন ফু'তে নৌ ও বিমানশক্তি ব্যবহার করার জন্যে তাঁদের সম্মতি আদায় করা। এছাড়া তিনিও বললেন, দিয়েন বিয়েন ফু'কে রক্ষার আর কোন উপায় নেই।

মার্কিন কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা ছিল সপ্তম নৌ-বহরের বিমানবাহী জাহাজ 'এসেক্স্' ও 'বক্সার' থেকে ২০০ প্লেন একযোগে শুধু একবার গিয়ে দিয়েন বিয়েন ফু এলাকায় হানা দিয়ে আসবে। তাতেই কাজ হবে।

কিন্তু কংগ্রেস সদস্যরা ওই পরিকল্পনায় যে কারণেই হোক সম্মতি দেননি। যদি দিতেন তাহলে ভিয়েৎনামের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হ'ত কিনা সে প্রশ্ন এখন অবান্তর।

সুতরাং নাভারকে তাঁর পরিকল্পনা এবং ফ্রান্সের মর্যাদাকে সঙ্গে নিয়ে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিকে সংক্ষিপ্ত পথে একলাই আবার যাত্রা করতে হল।

সৈন্য তিনি পাঠিয়েছিলেন যতক্ষণ সৈন্য ছিল। রাতের পর রাত ডেকোটাগুলি আসত অতি সন্তর্পণে, ভিয়েৎমিন গোলার স্পর্শ বাঁচিয়ে কোনমতে নামিয়ে দিয়ে যেত তাদের। অনেকেই মারা পড়ত মাটির গুলিতে। যারা গুলি এড়িয়ে নেমে আসতে পারত বরাতের জোরে তারা আটকে যেত কাঁটাতারের গায়ে, কিংবা গেরিলাদের ট্রেঞ্চে, নয়ত মাইন-পাতা ধানের ক্ষেতে। সেখান থেকে মৃত্যু মাত্র কয়েক মিনিটের দূরত্ব।

৭ মে, ১৯৫৪ সাল, ভিয়েৎমিনদের প্রথম আক্রমণের পঞ্চান্ন দিন পর, দিয়েন বিয়েন ফু'র রণক্ষেত্র তখন নিস্তব্ধ। মৃতদেহগুলি ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে, কাতারে কাতারে। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় সেগুলি দেখাচ্ছিল বড় বীভৎস, বড় করুণ।

একটি ট্রেঞ্চ থেকে দেখা গেল, একটি রাইফেলের ডগা প্রথমে

একটু উঁকি দিয়ে তারপর ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। তার মাথায় একটি ছোট সাদা রুমাল বাঁধা।

কিছুক্ষণ পরে একজন কর্নেল তাঁর স্লিট ট্রেঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন।

ওদিক থেকে চ্যাপ্টা হেলমেট পরা একজন ভিয়েৎমিন সৈন্যও মাথা বার করে উঠে দাঁড়িয়েছে।

"আপনারা কি আর গুলি করবেন না?" ভিয়েৎমিন সৈন্যটি জিজ্ঞেস করল ফরাসীতে।

"না।" কর্নেলের উত্তর।

"এই শেষ?"

"হ্যাঁ, এই শেষ!"

সেই দিনই শেষ হয়ে গিয়েছিল দিয়েন বিয়েন ফু'র যুদ্ধ। দেখা গেল, ১৬,২০০ ফরাসী সৈন্য ভিয়েৎমিনদের হাতে হয় নিহত না হয় বন্দী।

আট

জেনিভার পর

একদিকে যখন ভিয়েৎমিন দেশপ্রেমিক বীরেরা দিয়েন বিয়েন ফু'র পর্বতে প্রান্তরে মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে মরছিল, অন্যদিকে তখন সায়গনে ফরাসীর হাতের পুতুল বাও দাই তাঁর সাকরেদ বে ভিয়েনকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন বারো শ' মেয়ে নিয়ে এশিয়ার বৃহত্তম বেশ্যালয় স্থাপন করবার জন্যে।

ইতিহাস বিচার করুক ভিয়েৎনামের সত্যিকার প্রতিনিধি কারা।

যখন ওরা রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে, দিনের পর দিন না খেয়ে, পায়ে হেঁটে বুকে হেঁটে পাহাড়, জঙ্গল, নদী পেরিয়ে, প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলছিল—ঘর-ছাড়া, বাড়ি-ছাড়া, সুখ, আরাম, নিরপত্তা সব ছাড়া, সঙ্কল্পে দুর্বার, লক্ষ্যে অটুট মুক্তিপাগল একদল মানুষ—তখন বাও দাই ঐ বে ভিয়েনের সঙ্গে মিলেই 'গ্রাঁদ মঁদ' নামে একটি জুয়ার আড্ডা চালাচ্ছেন।

সত্য, ন্যায়, বিচার ইত্যাদি বলে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে তারাই বিচার করুক ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা কাদের হাতে আসা উচিত।

যারা স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছিল, কষ্ট স্বীকার করেছিল, প্রাণ দিয়েছিল তাদের হাতে? না তাদের হাতে যারা শোষক-সম্প্রদায়ের তল্পিবাহক হয়ে বারে, ব্রথেলে আর রিভিয়েরায় দিন এবং রাত্রি দুই-ই কাটানো ছাড়া আর কিছু করত না?

সততা বলে কোন বৃত্তি যদি আজো অবশিষ্ট থাকে তাহলে সে-ই বলে দেবে এই প্রশ্নের জবাব কি হওয়া উচিত।

অথচ দিয়েন বিয়েন ফু'র বিস্ময়কর জয়লাভের পর হো চিন মিনের নেতৃত্বে ভিয়েৎমিনরা যখন স্বাধীন, ঐক্যবদ্ধ ভিয়েৎনামের দায়িত্ব নেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল তখন সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি তাদের সেই দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফসল থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র আঁটছিল।

ঠিক যেমনভাবে ১৯৪৫ সালে মিত্র-শক্তির বিশ্বাসঘাতকতা আরেকবার স্বাধীনতার জন্মলগ্নে স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল ভিয়েৎনামের মানুষের হাত থেকে।

দেখা গেল ন' বছর পরেও সাম্রাজ্যবাদ তার চরিত্র পাল্টায়নি।

এই ষড়যন্ত্র ও বঞ্চনার কথা সকলের জানা দরকার। তা না হলে আজ ভিয়েৎনামে যে অবিচার, যে অন্যায়, মানবতার বিরুদ্ধে যে অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে তার প্রকৃত স্বরূপ, এবং এই অবিচার, অন্যায় ও অপরাধের বিরুদ্ধে যারা প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে তাদের আসল উদ্দেশ্য ভালোভাবে বোঝা যাবে না।

ভিয়েৎনামের সমস্যার ওপর আজ অত্যন্ত কৌশলে ও সুপরিকল্পিতভাবে একটা ধূম্রজাল বিস্তার করা হয়েছে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে। এই সমস্যার যাঁরা সমাধান চান, এই জাল ভেদ করে তাঁদের তাকাতেই হবে আসল সত্যের দিকে। আর সেই জন্যে এই ষড়যন্ত্র ও বঞ্চনার কথা আরো বেশি জানা দরকার।

দিয়েন বিয়েন ফু'র যুদ্ধে ফ্রান্স ছিল পরাজিত পক্ষ, এবং নিশ্চয়ই সে শুধুমাত্র উত্তর ভিয়েৎনামের শাসক হিসেবে ভিয়েৎমিনদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল না।

ঐ যুদ্ধে ভিয়েৎমিনরা ছিল বিজয়ী পক্ষ, এবং নিশ্চয়ই তারা শুধুমাত্র উত্তর ভিয়েৎনামের দাবীদার হিসেবে ফরাসীদের পরাজিত করেনি।

সুতরাং বিজয়ী ও পরাজিতের মধ্যে বোঝাপড়া যা হবার তা

ভিয়েৎমিন ও ফ্রান্সের মধ্যেই হবার কথা। দায় ও দায়িত্বের হস্তান্তরও যা কিছু তা এই দু'জনের মধ্যেই হবে এটাই স্বাভাবিক।

দিয়েন বিয়েন ফু'র চূড়ান্ত ফয়সালার পরের দিন, অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের ৮ মে এই বোঝাপড়ার জন্যে ভিয়েৎনাম তথা গোটা ইন্দোচীন সম্পর্কে জেনিভায় এক আন্তর্জাতিক বৈঠকের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ফ্রান্স ও হো চি মিনের গণতান্ত্রিক রিপাবলিক ছাড়া এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, রাশিয়া, চীন, এবং লাওস, কম্বোডিয়া ও বাও দাইর পুতুল সরকার।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এ-কথা আজ আর বলতে বাধা নেই, সম্মেলন আরম্ভ হবার আগে থেকেই এ সম্পর্কে শুধু উদাসীন ছিল না, সম্মেলন চলাকালে এর কাজকর্মে নানাভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। এক সময় পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেস এবং সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেডেল স্মিথ দু'জনেই সম্মেলন ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।

একটি জাতি দীর্ঘকাল সংগ্রাম করার পর স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে এবং সেই স্বাধীনতার জন্যে আলোচনা চালাতে এসেছে, এই কথাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেদিন কিছুতেই স্বীকার করে নিতে চায়নি। তার একমাত্র বক্তব্য ভিয়েৎমিন একটি কম্যুনিস্ট আন্দোলন, সুতরাং মীমাংসা আলোচনায় সমর্থন জানাবার অর্থ হল কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আপোস করা। কোন রকম আপোস করার বিরুদ্ধে আমেরিকার মনোভাব এতই কঠিন ছিল যে, আমেরিকা জেনিভা সম্মেলনের সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর পর্যন্ত করেনি। ওয়াশিংটনের এই সময়কার ভূমিকাকে যে কোনমতেই বিশ্ব শান্তির সহায়ক বলা যায় না এ-কথা নিরপেক্ষ পশ্চিমী পর্যবেক্ষকরাই স্বীকার করে থাকেন।

মার্কিন-সরকারের মুখপাত্ররা আজ যখন আলাপ-আলোচনার

মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার কথা বলেন, তখন আমরা জেনিভা সম্মেলনে তাঁদের ভূমিকার কথা মনে না করে পারি না।

অথচ মার্কিন কর্তৃপক্ষ কম্যুনিস্ট আখ্যা দিয়ে সেদিন যাঁদের সঙ্গে আপোস করতে অস্বীকার করেছিলেন, সেই ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের সরকারের ভূমিকার কথা মনে করুন। লড়াই তারাই করেছিল, ফরাসীদের তারাই পরাজিত করেছিল, গোটা ভিয়েৎনামের শাসনভার গ্রহণের অধিকার তারাই অর্জন করেছিল, অথচ মীমাংসার খাতিরে জেনিভা বৈঠকে যখন দেশটাকে সপ্তদশ সমান্তরাল বরাবর সাময়িকভাবে ত্ব'ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল, তখন সেই প্রস্তাবে তারা আপত্তি জানায়নি।

ত্বনিয়ার শান্তিকামী মানুষই বিচার করবে কে বেশি গণতান্ত্রিক: 'কম্যুনিস্ট' উত্তর ভিয়েৎনাম না 'গণতান্ত্রিক' আমেরিকা।

প্রায় আড়াই মাস আলোচনার পর ২০ জুলাই জেনিভায় একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং পরের দিন ২১ জুলাই একটি চূড়ান্ত ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়।

এই চুক্তি ও ঘোষণার মর্মার্থ ছিল এই:

এক, সপ্তদশ সমান্তরাল বরাবর ভিয়েৎনামকে সাময়িকভাবে—(লক্ষ্য করবেন, সাময়িকভাবে)—ত্ব'ভাগ করা হবে। উত্তরাংশ থাকবে ভিয়েৎমিনদের হাতে, দক্ষিণাংশ থাকবে ফ্রান্সের তত্ত্বাবধানে। ত্ব'-পক্ষের সৈন্যরা চুক্তি বলবৎ হবার ৩০০ দিনের মধ্যে যে যার অংশে চলে যাবে।

ত্বই, দেশকে আবার ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে ত্ব'বছর পর, ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে, একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করবার জন্যে ১৯৫৫ সালে উভয় পক্ষ মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করবে।

তিন, যুদ্ধবিরতির সর্তাবলী ঠিক ঠিক পালিত হচ্ছে কিনা তা

দেখার জন্যে কানাডা, পোল্যাণ্ড ও ভারতকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন করা হবে।

চার, চুক্তি বলবৎ হবার দিন থেকে কোন পক্ষই সৈন্য বা সামরিক কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে পারবে না, কিংবা বাইরে থেকে সৈন্য, সামরিক কর্মী, অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ, জঙ্গী বিমান, জাহাজ, জেট ইঞ্জিন, সাঁজোয়া গাড়ি ইত্যাদি আমদানী করতে পারবে না। ভিয়েৎনামের কোথাও কোন নতুন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করাও নিষিদ্ধ। কোন পক্ষই কোন সামরিক জোটের সঙ্গেও সামিল হ'তে পারবে না।

হো চি মিনের সরকার এই চুক্তি মেনে নিয়েছিলেন পুরোপুরি, ফ্রান্সকে পাছ দুয়ার দিয়ে অন্তত দু'বছর ভিয়েৎনামে বজায় রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও। এবং ফ্রান্সও যখন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল তখন এই চুক্তির মর্যাদা সে রক্ষা করে চলবে এটাই ছিল প্রত্যাশিত।

হো চি মিন আরেকবার বিশ্বাস করেছিলেন পশ্চিমী সদিচ্ছা ও সততার ওপর। ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যাবে যে, এইভাবে বিশ্বাস করে প্রতি পদে পদে হো চি মিনকে ঠকতে হয়েছিল। তবু শান্তির স্বার্থে তিনি আরেকবার হাত মেলাতে কুণ্ঠিত হন নি।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ঐ মুহূর্তেই চক্রান্ত করেছিল চুক্তি বানচাল করার জন্যে। নির্বাচনের জন্যে ১৯৫৫ সালে যে আলোচনার কথা ছিল তা অনুষ্ঠিত হয় নি, এবং সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তাবিত তারিখের ঠিক প্রাক্কালে ফ্রান্স তল্পিতল্পা গুটিয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে চলে গিয়েছিল।

এরকম যে ঘটতে পারে জেনিভার সম্মেলনকারীরা তা আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাই চুক্তিতে এই কথা বলা ছিল যে, যদি মূল স্বাক্ষরকারী ফ্রান্স ও উত্তর ভিয়েৎনামের কেউ চুক্তির খেলাপ করে তাহলে তাদের উত্তরাধিকারীর ওপর চুক্তি রূপায়ণের দায়িত্ব বর্তাবে। ফ্রান্স চুক্তি নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘন করেছিল, এবং

ফ্রান্সের উত্তরাধিকারী হিসেবে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের দায়িত্ব গ্রহণ করে বাও দাই-নো দিন জিয়েম সরকার।

কিন্তু বাও দাই-জিয়েম চক্রকে জেনিভা চুক্তি অগ্রাহ্য করার জন্যে প্রকাশ্যে উস্কানি দিচ্ছিল আমেরিকা।

আমেরিকারই প্ররোচনায় বাও দাই-জিয়েমের প্রতিনিধি জেনিভা চুক্তিতে স্বাক্ষর দেননি, এবং এই সিদ্ধান্তকে মার্কিন সরকার প্রকাশ্যে পূর্ণ সমর্থন জানান। অবশ্য রিপাবলিক অব ভিয়েৎনামের আলাদা স্বাক্ষরের কোন দরকার ছিল না, কারণ ফ্রান্সের উত্তরাধিকারী হিসেবে চুক্তি পালন করতে সে এমনিতেই দায়বদ্ধ ছিল। এই দায় অগ্রাহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব হত না যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত না থাকত।

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার মন্তব্য করেছিলেন, সপ্তদশ সমান্তরাল বরাবর ভিয়েৎনামের বিভাগকে তিনি কৃত্রিম বলে মনে করেন। জিয়েম বলেছিলেন, জেনিভা চুক্তি জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়েছে। অথচ ঐ বিভাগ দূর করবার জন্যে এবং জনগণের ইচ্ছা যাচাই করার জন্যে যখন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে বলা হল, তখন তাঁরা নির্বাচন হতে দিতে সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন।

একে আমরা কী বলব : সদিচ্ছা ?

অথচ যে বিভাগকে কৃত্রিম ও জনগণের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ বলা হল সেই সামরিক ভাগের ফসলকে এখন আমেরিকা ও জিয়েম চক্র লুটের মাল হিসেবে ব্যবহার করতে অগ্রসর হলেন।

একে আমরা কী বলতে পারি : সততা ?

এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জেনিভা সম্মেলনকে যে পদে পদে বাধা দিয়েছিল ও জেনিভা চুক্তিতে যে স্বাক্ষর করতে রাজী হয়নি, একজন পরম নীতিবাদীর মতো ঘোষণা করেছিল জেনিভার সভাকক্ষে : মার্কিন সরকার যদিও জেনিভার ঘোষণায় সামিল হতে রাজী নন, তবু যেহেতু তাঁরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী শান্তির

জন্যে কাজ করতে প্রতিশ্রুত, তাই তাঁরা একতরফা এই ঘোষণা করছেন যে, তাঁরা এই চুক্তির কথা নজর করছেন, চুক্তি বিঘ্নিত করার জন্যে তাঁরা শক্তির প্রয়োগ করবেন না, এবং এই চুক্তি লঙ্ঘন করে আক্রমণ পুনরায় আরম্ভ হলে তাঁরা তাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা গুরুতর ভাবে বিপন্ন বলে মনে করবেন।

অথচ তাঁরাই এখন প্রথম প্রথম গোপনে তারপর প্রকাশ্যেই চুক্তি লঙ্ঘন করে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক কর্মী ও যুদ্ধ-সামগ্রী দক্ষিণ ভিয়েৎনামে পাঠাতে লাগলেন।

একেই বা আমরা কী বলব : নীতি, ধর্ম, শান্তির আকুলতা ?

জেনিভা চুক্তির পরবর্তী বছরগুলিতে আমেরিকা ও জিয়েম-চক্র কত নির্লজ্জভাবে চুক্তি লঙ্ঘন করেছে, তার প্রমাণ রয়েছে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রিপোর্টের পাতায় পাতায়। ১৯৫৭ সালের একটি রিপোর্টে কমিশন পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন যে, উত্তর ভিয়েৎনাম চুক্তি লঙ্ঘন করেছে বলে কোন রিপোর্ট তাঁরা পাননি। অপরপক্ষে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম জেনিভার নির্দেশ উপেক্ষা করে মার্কিন সামরিক বিমানে আমেরিকা থেকে সামরিক কর্মী এবং অজস্র অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম আমদানী করেছে।

এই বিষয়ে কমিশন যখন সায়গন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তার কোন জবাবই এলো না।

মিথ্যা প্রচারের দ্বারা এই ঘটনাগুলি এখন আচ্ছন্ন করে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, হো চি মিন উত্তর ভিয়েৎনামে একটি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের পত্তন করেছেন এবং জোর করে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম দখল করার মতলব করছেন।

কিন্তু পৃথিবীর বিবেক বলে যদি কিছু থাকে তবে সে-ই রায় দিক : নির্বাচনে রাজী হওয়া আর জোর করে ক্ষমতা দখল কি সমার্থক ?

ওয়াশিংটন-সায়গন চক্র বলবে, ঐ নির্বাচন অবাধ ও ন্যায়সঙ্গত হত না।

এই যুক্তির একটিই উত্তর আছে: নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্যে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা তো চুক্তিতে ছিল। আলোচনা তাহলে করা হয়নি কেন?

ওয়াশিংটন-সায়গন চক্র আবার বলবে, নির্বাচন হলে হো চি মিনের পক্ষই জয়লাভ করত অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েৎনামও 'কম্যুনিস্ট' হয়ে যেত।

নিজেদের শক্তি ও প্রভাব সম্পর্কে তাদের যদি এতই উঁচু ধারণা, তাহলে আমরা কি বলতে পারি না দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তারাই জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতা দখল করেছে? নির্বাচন হলেই যদি হো চি মিন জয়যুক্ত হন তাহলে ভিয়েৎনামে শাসন করবার প্রকৃত অধিকারী কে: হো চি মিন, না আমেরিকার হাতের পুতুল নো দিন জিয়েম? ভিয়েৎনামের মানুষ তাহলে কাকে চায়: হো চি মিনকে, না জিয়েমকে? এবং জনসাধারণ যদি স্বাধীন ইচ্ছায় হো চি মিনের নেতৃত্বই কামনা করে, তাহলে ওই ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওই দেশ শাসন করবার কোন্ নৈতিক যুক্তি ও অধিকার তাদের আছে?

ভিয়েৎনামের মানুষ হো চি মিনকে চায় না এটা প্রমাণ করবার জন্যে একটা তথ্য খুব ফলাও করে প্রচার করা হয়ে থাকে: দেশ দু'ভাগ হবার পর উত্তর থেকে প্রায় ৮ লক্ষ উদ্বাস্তু দক্ষিণে চলে এসেছে। আর দক্ষিণ থেকে গেছে মাত্র দেড় লক্ষ। কিন্তু একথা কখনই প্রচার করা হয় না যে, ঐ ৮ লক্ষের মধ্যে ৬ লক্ষ ৭৫ হাজারই ছিল ক্যাথলিক যারা ফরাসীদের দ্বারা সৃষ্ট এবং তাদের দ্বারাই পুষ্ট, আর বাকী সকলে ছিল দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সৈন্যদের পরিবারের লোক।

সায়গনে তখন জিয়েম একটি ক্যাথলিক সাম্রাজ্যের পত্তন

করেছেন। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তখন ক্যাথলিকরাই কুলীন এবং সুবিধাভোগী শ্রেণী। সুতরাং ক্যাথলিকরা যে উত্তর ভিয়েৎনামে থাকতে চাইবে না তা জানা কথা। অথচ ঐ "উদ্বাস্তু" স্রোত নিয়ে কত না অপপ্রচার চালানো হয়েছে, উদ্ভট ও বিকৃত চিত্র আঁকা হয়েছে হো চি মিন ও তাঁর সরকার সম্পর্কে, অত্যাচার ও নিপীড়নের অসংখ্য কাল্পনিক কাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে।

এদের প্রচার কী রকম বিকৃত, উদ্ভট ও কাল্পনিক হ'তে পারে তার প্রমাণ পাওয়া যায় টম ডুলি নামে এক ভদ্রলোকের লেখা 'ডেলিভার আস ফ্রম ইভিল' বইয়ে। বইটি ঐ সময় ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিল এবং এ নিয়ে একটা ফিল্মও তৈরি করে সর্বত্র দেখানো হয়েছিল। তাতে এক জায়গায় বলা হয়েছে, ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করবার আগে ভিয়েৎমিনরা হ্যানয়ে ফরাসী সমর্থক প্রায় এক হাজার মহিলাকে হত্যা করে পেট চিরে তাদের নাড়ীভুঁড়ি বার করেছিল।

এই এবং এই ধরণের অন্যান্য গাল-গল্প সম্পর্কে পল মুস (১৯৪৭ সালে ফরাসী সরকার যাঁকে হ্যানয়ে পাঠিয়েছিলেন হো চি মিনের সঙ্গে একটা আপোস রফা করবার জন্যে) পরে বলেছিলেন: "আজ একথা বলবার ও প্রমাণ করবার মতো অবস্থায় আমি আছি যে, ভিয়েৎমিনদের অত্যাচার ও নৃসংশতার যে-কাহিনী প্রচার করা হয়ে থাকে তার চার পঞ্চমাংশই হয় মনগড়া না হয় বিকৃত।"

এইসব বিকৃত ও মনগড়া তথ্য প্রচার করে প্রমাণ করার চেষ্টা হল যে, ভিয়েৎমিনরা অত্যন্ত জঘন্য ধরণের ব্যক্তি, তাদের প্রতি জনসাধারণের কোন সমর্থন নেই, কারণ তারা বুঝতে পেরেছে ভিয়েৎমিনদের অধীনে গেলে তাদের কী হাল হবে।

এবং এইসব বিকৃত ও মনগড়া তথ্যের আড়ালে দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে জোর করে দখলে রাখবার ষড়যন্ত্র চলতে লাগল।

চলতে লাগল কাকে নিয়ে? প্রথমে একজন ভ্রষ্টচরিত্র প্রাক্তন

সম্রাট এবং পরে একজন স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী, স্বজনপোষক ব্যক্তি। বাও দাই'কে ক্ষমতাচ্যুত করে ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে নো দিন জিয়েম যখন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট হলেন, তখন আমেরিকার সমস্ত সমর্থন এসে জড়ো হল জিয়েমের পেছনে।

জিয়েমকে মার্কিনীরা গড়ে তুলতে চাইল হো চি মিনের বদলা হিসেবে।

অথচ ১৯৫৫ সালে জিয়েম যখন সায়গনের গাই লং প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হন, তখন পশ্চিমী পর্যবেক্ষকরাই স্বীকার করেন তাঁর প্রভাব প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের দেওয়ালের বাইরে বিস্তৃত ছিল না।

তাঁর জনপ্রিয়তা এতই বেশি এবং তাঁর নেতৃত্ব এতই সুপরিচিত ছিল যে, ওয়েসলি ফিশেল নামে এক তরুণ মার্কিন অধ্যাপক পরিচয় করিয়ে দেবার আগে ওয়াশিংটনের সরকারী মহল তাঁর সম্পর্কে অবহিতই ছিলেন না! আর মার্কিন সরকারের কৃপা লাভ করবার জন্যে তাঁকে পিঠ চাপড়ানি নিতে হয়েছিল ক্যাথলিক পাদ্রী কার্ডিন্যাল স্পেলম্যান ও মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি উইলিয়াম ও. ডগলাসের কাছ থেকে। মিঃ ডগলাসই একদিন প্রাতরাশের টেবিলে জিয়েমকে সেনেটার মাইক ম্যান্স্‌ফিল্ড ও জন এফ. কেনেডির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সি-আই-এ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তদ্বির। ব্যস, জিয়েম আমেরিকার নেকনজরে পড়ে গিয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের একমাত্র আশা ও ভরসা বনে গেলেন।

সি-আই-এ'র এজেন্টরা তৎপর হলেন। তৎপর হলেন অধ্যাপক ফিশেলের নেতৃত্বে মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির একটি দল, সি-আই-এ'র টাকায় যে দল জিয়েমকে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে গিয়েছিলেন। লেখা হল বই, পত্র-পত্রিকায় বেরোতে লাগল প্রবন্ধ, রিপোর্ট। সকলেরই একই বক্তব্য: জিয়েমের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অসাধ্য সাধিত হচ্ছে, লোকেরা

জিয়েমের ভক্ত হয়ে পড়ছে, হো চি মিনের প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে।

মেজর জেনারেল স্যামুয়েল মায়ার্স, যিনি মার্কিন সামরিক সাহায্য উপদেষ্টা গ্রুপের সহকারী প্রধান ছিলেন, ১৯৫৯ সালে বললেন, ভিয়েৎমিনরা আর সরকারের প্রধান বিপদ নয়। দু'টি টেরিটোরিয়াল রেজিমেন্টই ওদের ঠেকাবার পক্ষে যথেষ্ট।

সেই সময়ের একজন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ এলব্রিজ ডুব্রো মার্কিন সেনেটের একটি সাব-কমিটির কাছে বললেন, জিয়েমের আমলে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এত উন্নত হয়েছে যে, মার্কিন সামরিক সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে আনা যেতে পারে।

১৯৫৪ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে আমেরিকা জিয়েম সরকারকে ১৩০ কোটি ২০ লক্ষ ডলার সামরিক সাহায্য দিয়েছিল।

১৯৫৯ সালের ১৩ মে মিঃ লিণ্ডন জনসন (তখন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন) জিয়েমের সঙ্গে এক যুক্ত বিবৃতি প্রচার করে বললেন: "এসিয়ায় কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যের প্রান্তদেশে যে ক'জন নেতা স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আমেরিকা মনে করে প্রেসিডেন্ট জিয়েম তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।"

কিন্তু কী ছিল ওই স্বাধীনতার স্বরূপ?

পুলিশ যাকে খুশি যখন-তখন গ্রেপ্তার করতে ও জেলে পুরতে পারত। ন্যায়বিচার বলে কিছু ছিল না। ছিল না সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। ভ্রমণের ও সভা-শোভাযাত্রা করার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এমনকি বিবাহ ও শেষকৃত্য করতে গেলেও সরকারের অনুমতি দরকার হত। ১৯৫৯ সালে জাতীয় পরিষদের জন্যে যে 'নির্বাচন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা এমনই ন্যায়সঙ্গত ছিল যে, মাত্র একজন ছাড়া কোন বিরোধী প্রার্থী জিততে পারেন নি। অনেক প্রার্থীকেই নানা উপায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়। কাউকে ভয় দেখিয়ে, কারো বিরুদ্ধে নানারকম মিথ্যা

অভিযোগ তুলে, কারো বেলায় পোস্টার বেশী বড় হয়ে গেছে এই ধরণের অর্থহীন অজুহাত তুলে। একজন যিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন, ডাঃ ফান কোয়াং ডান, তাঁকে পরাজিত করার জন্যে আট হাজার সৈন্যকে পাঠানো হয়েছিল তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্রে।

কিন্তু জয়ী হয়েও কি নিস্তার পেয়েছিলেন ডাঃ ডান? জাতীয় পরিষদের অধিবেশন যেদিন বসবে সেদিন তিনি তাঁর বাড়ি থেকে রওনা হচ্ছেন, পুলিশ এসে তাঁকে বলা নেই কওয়া নেই ধরে নিয়ে গেল, তারপর পাঠিয়ে দিল পুলো কঁদোর দ্বীপে। নির্জন নির্বাসনে।

তবুও জিয়েম বলতেন তিনি দাসত্ব চান না, তিনি মুক্ত ও স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চান। দোহারের মতো সি-আই-এ এজেন্টরা আর কিছুসংখ্যক অন্ধ সমর-নায়ক মার্কিন সরকারকে তাই বুঝিয়ে এসেছেন আর মার্কিন সরকারও তাই বুঝেছেন।

কাদের জন্যে ছিল এই স্বাধীনতা?

"যিনি সার্বভৌম শাসক তিনি জনসাধারণ আর ঈশ্বরের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে থাকেন, সুতরাং জনসাধারণের পবিত্র সম্মান লাভের যোগ্য," জিয়েম একবার লিখেছিলেন।

কাজেই স্বাধীনতা তো তাঁর জন্যে বটেই।

এবং যেহেতু ওই সার্বভৌম শাসক নিজের ভায়েদের প্রতি অনুরক্ত, সুতরাং স্বাধীনতা ওই ভায়েদের জন্যেও।

এক ভাই নো দিন থুক উয়েতে রোমান ক্যাথলিক বিশপ, একটি জাহাজ কোম্পানীর ও অসংখ্য বাগিচার মালিক।

আরেক ভাই নো দিন ক্যান মধ্য ভিয়েৎনামের লাট-বেলাট। তাঁর সৈন্যবাহিনী আলাদা, তাঁর 'রাজত্ব' আলাদা। সেখানে কারো নাক গলাবার উপায় নেই।

আর সবচেয়ে খলিফা যে ভাই, নো দিন নু, তিনি জিয়েমের সঙ্গে গাই লং প্রাসাদেই ছিলেন এবং সেখান থেকে একটি অদৃশ্য সরকার পরিচালনা করতেন। তাঁর হাতিয়ার 'কান লাও' নামে ৭০ হাজার

লোকের একটি গুপ্ত সংস্থা। ওই সংস্থার মারফত একজন গুণ্ডার সর্দারের মতো তিনি দক্ষিণ ভিয়েৎনামে খবরদারী করে বেড়াতেন: লটারী চালাতেন, আফিমের কারবার করতেন, ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতেন, বৈদেশিক মুদ্রার অবৈধ লেনদেন করতেন।

জিয়েম কিছুই দেখতেন না। দেখতে চাইতেন না। কারণ নু একে তাঁর ভাই, তার ওপর একটি সুন্দরী স্ত্রীর অধিকারী। কিছু বলতে এলেই ধমক খেতেন মাদাম নু'র কাছে। সুন্দরীর মুখের ধমক, হজম করেও আনন্দ।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে জিয়েম সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে নিজেকে ধোঁয়ার আবরণে ঢেকে ফেলতেন।

এই ভ্রাতৃচক্রের বাইরে আর যারা স্বাধীনতা ভোগ করত তারা, এক, ক্যাথলিক সম্প্রদায়, চাকরী-বাকরীর ক্ষেত্রে যাদের জন্যে দরজা ছিল অবারিত; দুই, তাঁবেদার সমর-নায়ক যাঁরা বন্দুকের গুলিতে নিজেদের পথ পরিষ্কার করতে করতে এগিয়ে চলতেন; তিন, অনুগত অফিসার গোষ্ঠী যাঁরা ঘুষের টাকা কুড়িয়ে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করতেন; চার, মার্কিন মহল; আর পাঁচ, গুণ্ডা-ডাকাত।

তার বাইরে আর যারা তারা ইচ্ছা করলে জাহান্নামেও যেতে পারত।

উয়েয় বৌদ্ধরা ক্যাথলিকদের কোন পাকা ধানে মই দিতে যায় নি। ১৯৫৩ সালের মে মাসে ভগবান বুদ্ধের ২,৫০৭তম জন্মদিনে তারা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল তু দাম প্যাগোডায়। সেই অনুষ্ঠানে তাদের ধর্মীয় পতাকা ওড়াতে চেয়েছিল ভিক্ষুরা।

আর্চবিশপ থুক বললেন, কী, এতবড় কথা? ক্যাথলিক ধর্ম হচ্ছে নো দিন পরিবারের ধর্ম, সুতবাং দক্ষিণ ভিয়েৎনামেরও জাতীয় ধর্ম। সেখানে কিনা বৌদ্ধধর্মের পতাকা উড়বে?

অসম্ভব!

ক্রুদ্ধ থুক ঠিক করলেন, পতাকা তো তিনি তুলতে দেবেনই না, সভাও ভণ্ডুল করবেন।

থুকের একটি নিজস্ব সৈন্যদল ছিল। তাদের বলা হত বিশপস বয়েজ। ওই বিশপস্ বয়েজদের তিনি পাঠিয়ে দিলেন তু দামে। বলে পাঠালেন, পতাকা তারা তুলতে পারবে না।

প্রতিবাদ জানিয়েছিল ভিক্ষুরা। বৌদ্ধদের দেশ ভিয়েৎনাম। সেখানে তারা এই ঔদ্ধত্য সহ্য করবে কেন। কিন্তু থুকের হাতে ছিল ক্ষমতা, তাঁর পেছনে ছিল জিয়েমের প্রশ্রয়। তাই বৌদ্ধ প্রতিবাদের জবাব এসেছিল বুলেটের আকারে। উয়ের বেতার-কেন্দ্রের সামনের মাঠ ন'জন বৌদ্ধের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল।

নির্বিচার এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তু দাম প্যাগোডার ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা অনশন করেছিল। ওরা অহিংস, ওরা আর কিভাবে প্রতিবাদ জানাতে পারে? প্রতিহিংসাপরায়ণ সরকার নির্দেশ দিল, কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে ফেল প্যাগোডা, বন্ধ করে দাও বিদ্যুৎ ও জল।

১১ জুন প্রেসিডেন্ট জিয়েম যখন সায়গনের একটি গীর্জায় পরলোকগত পোপের আত্মার শান্তি কামনা করছিলেন, তখন কম্বোডিয়ার দূতাবাসের সামনে রাস্তার মোড়ে একটি মোটরগাড়ি চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল। গাড়ির পেছনে পেছনে আসছিল বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের একটি গেরুয়া শোভাযাত্রা।

গাড়িটি থামতেই কয়েকজন লোক নেমে পড়ল চটপট, তুলে ফেলল গাড়ির হুড। গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়ালো ভিক্ষুরা। মুখে মন্ত্র, হাতে রুদ্রাক্ষ, ধীরে ধীরে ওই ভিড় থেকে এগিয়ে এলেন ৭৩ বছরের বৃদ্ধ ভিক্ষু থিচ কোয়াং ডুক। বসে পড়লেন রাস্তার যে গোল জায়গাটা খালি ছিল তার মাঝখানে। একজন গাড়ির

হুডের নিচ থেকে বার করে আনল একটি পেট্রোলের টিন, ঢেলে দিল ডুকের গায়ে।

কোন দিকে না তাকিয়ে, কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে ডুক একটি দেশলাই জ্বেলে ছুঁইয়ে দিলেন নিজের গায়ে। আগুন জ্বলে উঠল। সায়গনের রাস্তায় একজন জীবন্ত মানুষের চিতা। অত্যাচারের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ। কিন্তু সেই প্রতিবাদের ভাষা কি পৌঁছেছিল জিয়েমের প্রাসাদে ?

কোয়াং ডুক ঠায় বসেছিলেন তাঁর দেহ যতক্ষণ নিষ্প্রাণ হয় নি ততক্ষণ। তারপর প্রাণহীন দেহখানি লুটিয়ে পড়েছিল রাস্তার বুকে।

মন্তব্য করলেন জিয়েম: "ড্যাম্‌ড্‌ ফুল! ওদের পাগলামীর জন্যে তো আমি দায়ী হতে পারি না!"

বললেন মাদাম নু: "বাঃ, কী চমৎকার! বারবিকিউ করা ভিক্ষু! ওরা যদি এইভাবে নিজেদের পোড়াতে থাকে তো আমি আনন্দে হাততালি দেব!"

হঠাৎ একদিন দেখা গেল, বিন দিন প্রদেশে নুয়ে বিউ মঠের কাঁচের জানালাগুলো ভাঙা আর ঘর থেকে শহীদ কোয়াং ডুকের ছবিটি অদৃশ্য। তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট এসে মঠের দেয়ালগুলি ক্ষত-বিক্ষত করে দিল।

আন জিয়েন প্রদেশের একটা নিভৃত মঠ ছিল কোয়ান আম। হঠাৎ একদিন কয়েকটা বোমা এসে পড়ল সেখানে। পরদিন আবার। তার পরদিনও। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল অন্যত্র।

ত্রাণ কোয়াং বা তাঁর গাড়িটি মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে দিতেন একটি বৌদ্ধ-সমিতিকে। একদিন রাত্রে দেখা গেল সেটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

ভিক্ষুণী ত্রাং থি তামকে একদিন খুঁজে পাওয়া গেল না।

কয়েকদিন পর তাঁকে একটি রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখা গেল : অচেতন, হাত-পা বাঁধা।

সায়গনের রাস্তায় পুলিশ-মহিলা বিক্ষোভকারীদের রাস্তায় ফেলে বর্বর ভাবে তাদের ওপর দিয়ে মাড়িয়ে চলে গেল।

অত্যাচার যখন চরমে, তখন সেই নিরুপায় যন্ত্রণাকে রূপ দেবার জন্যে ৪ আগস্ট দ্বিতীয় এক ভিক্ষু আগুনে আত্মাহুতি দিলেন। আরো চল্লিশজন ঘোষণা করলেন জিয়েম বৌদ্ধদের অভিযোগের প্রতিকার না করলে তাঁরাও আত্মাহুতি দেবেন।

জিয়েম বললেন : ব্যাটারা সব কম্যুনিস্ট, ওদের মেরে খতম কর।

বললেন মাদাম নু : ওদের আরো দশগুণ বেশী পেটানো উচিত।

কিন্তু মায় তুয়েট তান কি কম্যুনিস্ট ছিল? আঠেরো বছরের তরুণী মায় তুয়েট তান?

"আমার সধর্মীদের সংগ্রামে আমার এই ছোট্ট সাহায্যটুকু রেখে গেলাম।"

ধীরে ধীরে তিনটি আলাদা কাগজে এই কথাগুলি লিখল মায় তুয়েট তান। তারপর একে একে ভাঁজ করে ঠিকানা লিখল : "আমার মা ও বাবা," "দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বৌদ্ধ-সম্প্রদায়," এবং সর্বশেষে "নো দিন জিয়েম, প্রেসিডেন্ট, ফ্রীডম প্যালেস, সায়গন।"

তারপর। আগে থেকেই একটা ভারী হাতুড়ি যোগাড় করে এনেছিল সকলকে লুকিয়ে। এবার সে নিজের বাঁ-হাতখানি নুইয়ে দিল জা লোই প্যাগোডার পবিত্র চাতালে। আর ডান হাত দিয়ে তাতে মারল প্রচণ্ড হাতুড়ির ঘা।

আঠেরো বছরের তরুণী দেহখানি অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল তথাগতের মন্দিরে। রক্তে ভেসে গেল জায়গাটা, ভরে গেল মায় তুয়েটের সারা শরীর।

জা লোইয়ের ভিক্ষু ও কর্মীরা আত্মনিবেদনের এই মর্মস্পর্শী দৃশ্যে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পরের দিন, ১৩ আগস্ট, সায়গন থেকে ৪০০ মাইল উত্তরে উয়ের তু দাম প্যাগোডায় তখনো কেউ জাগেনি। ভোরের হাল্কা বাতাস চীন সমুদ্র থেকে বইছিল মৃদু-মধুর। চুপি চুপি কাউকে কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এক ভিক্ষু।

একবার নীরবে দাঁড়িয়ে বুঝি মনে করার চেষ্টা করেন তথাগতের সৌম্য মুখখানি। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন প্যাগোডার প্রশস্ত উঠোনে।

ভোরের হাওয়ায় কাঁপছিল তাঁর উত্তরীয়। একটি কেরোসিনের টিন নিয়ে উজাড় করে ঢেলে দেন নিজের গায়ে। দেশলাই জেলে তাতে ধরিয়ে দিলেন আগুন। দেখতে দেখতে সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। আগুনের জীবন্ত মশাল হয়ে তিনি বসে রইলেন অচঞ্চল। তারপর একসময় গড়িয়ে পড়ল তাঁর দেহ। পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

কম্যুনিস্ট কি ছিলেন তিনিও?

নিজের বিশ্বাসের জন্যে, আদর্শের জন্যে, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরাই আন্দোলন করবেন তাঁরাই কম্যুনিস্ট? অত্যাচারের বিরুদ্ধে, পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেই যে কেউ কম্যুনিস্ট হয়ে যাবে?

হ্যাঁ, কম্যুনিস্ট, জিয়েম বললেন। তাতে সায় দিলেন মার্কিনী দোহারেরা।

জা লোই প্যাগোডায় বৌদ্ধ-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এক জরুরি বৈঠকে মিলিত হয়ে তৈরী করলেন একটি টেলিগ্রামের খসড়া। পাঠিয়ে দিলেন সে টেলিগ্রাম ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট কেনেডির কাছে, নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেলের কাছে, ছনিয়ার যত বৌদ্ধ-সংস্থা আছে তাদের কাছে।

২১ আগস্ট নো দিন নু'র নেতৃত্বে সি-আই-এ'র ট্রেনিং পাওয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনামী বিশেষ বাহিনী জা লোই প্যাগোডার ওপর চালালো গুলি, গ্রেপ্তার করল বৌদ্ধ নেতাদের।

জিয়েম ভাবলেন, তিনি কম্যুনিস্টদের সায়েস্তা করছেন।

প্রদেশে প্রদেশে নো দিন নু'র নিজ হাতে বাছাই করা তাঁবেদারদের প্রদেশ-প্রধান করে পাঠানো হল। প্রতিবাদের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র তারা লোকেদের ধরে জেলে পুরতে লাগল, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে লাগল।

জিয়েম বললেন, তিনি কম্যুনিস্টদের হাত থেকে তৎপরতা কেড়ে নিচ্ছেন।

সরকারী সৈন্য সংখ্যা সাড়ে তিন লাখে গিয়ে দাঁড়ালো। জিয়েম বললেন, কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে তাঁরা শক্তি বৃদ্ধি করছেন।

কিন্তু এই সাড়ে তিন লাখ সৈন্য কিভাবে অর্জন করা হয়েছিল? কোন রিক্রুটিং সেন্টারে নয়। নো দিন নু'র লোকেরা হঠাৎ এক এক সময় এক-একটি শহরে কিংবা গ্রামে গিয়ে উদয় হত, তারপর একটা রাস্তা বা একটা এলাকা ঘিরে ফেলত। ব্যস, আর কথা নেই। ওই ঘেরা এলাকার মধ্যে যত সক্ষম যুবক থাকত তাদের যেতেই হত জিয়েমের ব্যারাকে।

জিয়েমের খাতায় সংখ্যা বৃদ্ধি হত। কিন্তু মানুষগুলি কি তাতেই ভালোমানুষ সৈন্য বনে যেত? এ হিসাব পশ্চিমী পর্যবেক্ষক-দেরই দেওয়া যে, দিনে অন্তত গড়ে ৬০০ করে সৈন্য পালিয়ে যেত সুযোগ পেলেই।

ওরা ফিরে যেতে পারত না নিজেদের গ্রামে। যাবার উপায় ছিল না। ওরা চলে যেত জঙ্গলে, যেখানে ওরা প্রস্তুত হচ্ছিল প্রত্যাঘাতের জন্যে।

আমেরিকা ভাবল 'কম্যুনিস্ট'দের দেশ-ছাড়া করবার একটা মোক্ষম অস্ত্র পাওয়া গেছে। তার নাম জিয়েম। স্রোতের মতো

ডলার আসতে লাগল ভিয়েৎনামে। সেগুলি যে আবার ফেরত ডাকে চলে যেতে লাগল দেশের বাইরে, জমতে লাগল মার্কিন, ফরাসী, সুইস ব্যাঙ্কে, সে হুঁস তার ছিল না।

তার ধারণা, দেশ স্থিতিশীল হচ্ছে। এত স্থিতিশীল যে, তিন তিনবার জিয়েমের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়েছিল। এবং ভাগ্যের এমনই পরিহাস, শেষের বার ওই চেষ্টা শুধু সফলই হয়নি, যে সি-আই-এ জিয়েমকে একদিন ফ্রীডম প্যালেসে অধিষ্ঠিত করেছিল, সেই সি-আই-এ'কেই ওই চেষ্টার পেছনে মদত যোগাতে হয়েছিল।

সেদিন তারিখ ২ নভেম্বর, ১৯৫৩ সাল।

ইতিহাস সেদিন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল যে, আমেরিকার সমস্ত ধারণা মিথ্যা, সমগ্র চিন্তা ভ্রান্ত, সকল প্রচেষ্টাই বিপথচালিত। ভিয়েৎনামে আমেরিকা যার পেছনে ছুটে চলেছিল তা এক বিরাট মরীচিকা।

আমেরিকা তবুও থামেনি। কারণ ইতিহাস থেকে শিক্ষা পাবার জন্যে সে ভিয়েৎনামে আসেনি। তার উদ্দেশ্য ছিল অন্য। তার সঙ্কল্প ছিল সে গায়ের জোরে দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে কব্জায় রাখবে। কতগুলি অপদার্থ সি-আই-এ এজেন্টের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে সে সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিল ভিয়েৎনামীদের সে কিছুতেই নিজেদের ভাগ্য নিজেদের নির্ধারণ করতে দেবে না।

এলো আরো ডলার, আরো সৈন্য, আরো উপদেষ্টা, আরো অস্ত্র। এলো একের পর এক নতুন নতুন পুতুল: নুয়েন ক্যান, কাও কি, নুয়েন ভান তিউ। জিয়েমের আমলের পরেও বৌদ্ধরা সংস্কারের জন্যে আন্দোলন করেছে। প্রত্যেক বারই, এটাই বড় বিচিত্র, মার্কিনী আর তাঁদের তাঁবেদারেরা ওই আন্দোলনকে কম্যুনিস্ট বিদ্রোহ আখ্যা দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে দমন করেছে। মাঝে মাঝে নির্বাচনের ভড়ং করা হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলিতে সরকারী

হস্তক্ষেপ এত স্থূলভাবে প্রকট ছিল যে, তা চোখে পড়তে দেরী হয় নি।

একদল লোক যাদের আমেরিকা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে 'জনপ্রিয়' নেতা বানিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছে তাদের 'অনুরোধে' দক্ষিণ ভিয়েৎনামে উপস্থিত হয়ে ভিয়েৎনামীদের স্বাধিকারের দাবীর কণ্ঠরোধ করবার কি অধিকার আছে আমেরিকার? ইতিহাস প্রমাণ করেছে ওইসব পুতুল নেতার জনপ্রিয়তায় সীমা কতখানি। তবু তাদেরই মুখের কথায় একটা গোটা জাতিকে আমেরিকা আজ নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত। এই যখন অবস্থা তখন হো চি মিন কী করতে পারেন? কী করা তাঁর উচিত?

তিনি লড়াই করেছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্যে। স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে সেই স্বাধীনতা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হল। শুধু তাই নয় দেশটাও দু'ভাগ হয়ে গেল। তবু তিনি অপেক্ষা করেছিলেন নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ আবার ঐক্যবদ্ধ হবে এই আশায়।

সেই নির্বাচন হয়নি। কথা রাখেনি যারা তাঁকে সেদিন আশ্বাস দিয়েছিল। একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিকে পায়ে দলে লুঠেরার মনোভাব নিয়ে তাঁর দেশের একটা অংশ দখল করেছিল চক্রান্ত-কারীর দল। মানুষ তাদের চায় কিনা তা যাচাই করতেও সাহস হয়নি তাদের। অথচ তারাই এখন হো চি মিনকে তাঁর চুক্তির কথা মনে করিয়ে দিতে চাইছে। কপটতার এর চাইতে কপট দৃষ্টান্ত আর দুটি নেই। আমেরিকা তার কাজের দ্বারাই প্রমাণ করেছে ভিয়েৎনামে সে ফরাসীদের মতোই সাম্রাজ্যবাদী। একটি সাম্রাজ্যবাদের বদলে আরেকটি সাম্রাজ্যবাদ কায়েম হতে দেবার জন্যেই কি হো চি মিন লড়াই করেছিলেন? দেশকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দ্বি-খণ্ডিত হ'তে দেবার জন্যেই কি তিনি পাহাড়ে-জঙ্গলে অনাহারে, অর্ধাহারে ঘুঁরে বেড়িয়েছেন, দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করেছেন?

এবং যদি ওই নয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি পুনরায় লড়াই আরম্ভ করে থাকেন, যদি সাহায্য পাঠিয়ে থাকেন দক্ষিণে তাহলে কি তিনি অন্যায় করেছেন ?

কখনোই নয়। কারণ হো চি মিনের পক্ষে তাঁর দেশের স্বাধীনতা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। সাম্রাজ্যবাদীরা এখনো ভিয়েৎনাম ছেড়ে যায়নি। ১৯৫৬ সালে জেনিভা চুক্তির সমাধিই সেকথা প্রমাণ করছে।

তা-ও, হো চি মিন জোর করে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম দখল করতে চাইছেন, এ-কথা যাঁরা বলেন তাঁদের জানা উচিত, তিনি ১৯৬০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। তখনও যখন চক্রান্তের শেষ হল না, কেবল তখনই তিনি লড়াই আরম্ভের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শুরু হয়েছিল দক্ষিণ ভিয়েৎনামে গেরিলাদের তৎপরতা, জিয়েম যাঁদের আখ্যা দিয়েছিলেন ভিয়েৎ কং—ভিয়েৎনামী কম্যুনিস্ট।

জিয়েম কিংবা আমেরিকা যে আখ্যাই দিক, এই লড়াই ভিয়েৎনামের অপূর্ণ স্বাধীনতার লড়াই। একথা আজ সকলের মনে রাখা দরকার। কারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের প্রচার এই লড়াইকে অন্যভাবে চিত্রিত করে একটি দেশের জবরদখলে, একটি জাতির ক্রমাবলুপ্তিতে আমাদের সায় দিতে বলছে।

নয়

"আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি!"

"আমাদের জাতি এক, আমাদের দেশ অখণ্ড। সমস্ত বাধা, সমস্ত বিপত্তি অতিক্রম করে আমাদের জনগণ জাতীয় ঐক্য সাধন করবেই। উত্তর ও দক্ষিণকে আবার একসঙ্গে আনতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

এ-কথা ঘোষণা করেছিলেন হো চি মিন, ১৯৬০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর, উত্তর ভিয়েৎনামের লাও ডং (শ্রমিক) পার্টির তৃতীয় জাতীয় সম্মেলনে। ভিয়েৎমিন দল ভেঙে দিয়ে হো ১৯৫১ সালে পত্তন করেছিলেন লাও ডংয়ের।

ওই সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই ঘোষণা করেছিলেন লাও ডংয়ের প্রথম সেক্রেটারী লে দুয়ান: "জাতীয় ঐক্য অর্জনের জন্যে মার্কিন-জিয়েম চক্রকে উৎখাত করা ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই।"

ডিসেম্বরে গঠিত হল ফ্রন্ট ফর ন্যাশনাল লিবারেশন, জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট। আজকে যারা লড়াই করছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তাদের রাজনৈতিক সংগঠন।

কারা ছিলেন এই ফ্রন্টের নেতা? লাও ডং পার্টির খবরদারী ছিল এর ওপর সন্দেহ নেই, কিন্তু হাতে-কলমে কারা চালাতেন এর কাজ?

ন্গুয়েন হু তো, ফ্রন্টের প্রেসিডেন্ট, যিনি ছিলেন সায়গনের একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় আইনজীবী। ভাইস-প্রেসিডেন্ট তিনজন: দু'জন জনপ্রিয় ডাক্তার ফুং ভান কুং ও ভো চিং কং এবং একজন স্থপতি হুইন তান ফাট। সেক্রেটারী জেনারেল হলেন ন্গুয়েন ভান

হিউ, যিনি সায়গনের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক ছিলেন।

আমরা কী করে বলতে পারি এঁদের প্রতিবাদ ছিল কোন বিজাতীয় উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত? সায়গনের সমাজের এঁরা সকলেই ছিলেন এক-একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এঁদের জনপ্রিয়তার মাত্রা ছিল অপরিসীম। অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহসী হয়েছিলেন তাঁরা, কারণ তাঁরা ছিলেন মানুষের অনেক কাছাকাছি। জিয়েমের মতো গাই লং প্রাসাদের নিভৃততম প্রকোষ্ঠে বসে সিগারেটের ধোঁয়ার আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখতেন না। অথচ যুক্তির কণ্ঠ, ন্যায়ের কণ্ঠ, নীতির কণ্ঠ, সুবিচারের কণ্ঠ যখন তাঁদের ভেতর দিয়ে উচ্চারিত হল তখন জিয়েম তাঁর ধূম্র কুণ্ডলীর ভেতর থেকে ফতোয়া দিলেন, ওরা কমুনিস্ট।

এরপর নো দিন নু'র গুপ্ত পুলিশের হাত এড়াবার জন্যে ওঁরা যদি পালিয়ে গিয়ে থাকেন জঙ্গলে, তাহলে কে তাঁদের ঘর-ছাড়া করেছিল?

তাঁদের 'ভিয়েৎকং'ই বা করেছিল কে?

এই ইতিহাস ছিল সর্বত্র। এমন অনেক গ্রাম ছিল যেখানে অধিকাংশ লোককেই পাঠানো হয়েছিল জেলে। ছাড়া পাবার পর তারা কি জিয়েমের জন্যে প্রেমে গদগদ হবে?

গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে গুপ্ত পুলিশ। মানুষগুলি কোথায় যাবে নিরাপত্তার জন্যে? জিয়েমের শহরে, না 'ভিয়েৎকংদের' জঙ্গলে?

যে সব বুদ্ধিজীবী প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, তাঁদের অনেককে স্থান দেওয়া হয়েছিল সায়গনের বোটানিকাল গার্ডেনের খাঁচায়। মুক্তি পেয়ে তাঁরা কি করতে পারতেন? লড়াই, না জিয়েমের মোসাহেবী?

দেশের চারদিকে অত্যাচারিত, উৎপীড়িত মানুষেরা ভিড় করতে

লাগল ফ্রন্টের পতাকার পেছনে। ওরা চায় নিরাপত্তা, চায় শোষণহীন জীবন। জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট ওদের সেই নিরাপত্তা ও শোষণ-মুক্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এলো। শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, হাতে-কলমে কাজও।

যে গ্রাম আগে জিয়েমের সৈন্য আর নো দিন নু'র গুপ্ত পুলিশের দয়ার ওপর নির্ভর করত, মুক্তি যোদ্ধারা এখন সেই গ্রাম রক্ষা করবার জন্যে এগিয়ে এলো।

যেখানে করের বোঝা ছিল দুর্বহ, সেখানে কর ওরা মকুব করে দিল।

যেখানে অনুপস্থিত, অত্যাচারী জমিদারের জমি চাষ করে ওদের ভাতের যোগাড় হ'ত না, সেখানে জমিদারের জমি কেড়ে নিয়ে ওরা বিলিয়ে দিল ভূমিহীন মানুষের মধ্যে।

যেখানে উৎপীড়ক মোড়ল কিংবা প্রদেশ প্রধানের হাতে ওদের মান, মর্যাদা, ধন, সম্পত্তি, মায় প্রাণ পর্যন্ত লুণ্ঠিত হ'ত, সেখানে মুক্তি যোদ্ধারা শুধু ওদের উৎখাতই করল না, প্রাণেও খতম করতে লাগল।

যেখানে স্কুল ছিল না সেখানে স্থাপিত হল স্কুল। যেখানে স্কুল ছিল সেখানে আরো স্কুল স্থাপিত হল। যেখানে ক্লাস ছিল শুধু দিনে, সেখানে রাত্রেও ক্লাস চলতে লাগল। যেখানে জিয়েম চক্র স্কুল বন্ধ করে দিয়েছিল, সেখানে নতুন শিক্ষক এসে সেগুলি আবার চালু করল।

যেখানে ম্যালেরিয়া, কলেরা, নিউমোনিয়ায় মানুষগুলি অসহায়ের মত মারা যেত, চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত ছিল না, সেখানে ওরা খুলল ডিসপেন্সারী, হাসপাতাল। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ওরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে যেতে লাগল গ্রাম থেকে গ্রামে।

ওরা চাষীর হয়ে লাঙল ঠেলল মাঠে। চাষীর সওদা ওরাই

নিয়ে গেল বাজারে। চাষীর কাঠ ওরাই নিয়ে এলো কেটে, জল ওরাই এনে দিল তুলে।

যদি আর কোন কাজ না থাকত তাহলে ওরা বাসন পর্যন্ত মেজে ধুয়ে দিত গ্রামবাসীদের হয়ে।

ধীরে ধীরে, ঠিক যেমনটি হয়েছিল ভিয়েৎমিনদের আমলে, মুক্তি যোদ্ধারা একটা প্রতীকে পরিণত হল। শান্তির প্রতীক, চাষীর হাতে জমির প্রতীক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তার প্রতীক।

সেই প্রতীককে বিশ্বাস করল মানুষ, কারণ সেই প্রতীক ছিল কথা দিয়ে কথা রাখারও।

অপর পক্ষে কিসের প্রতীক ছিল জিয়েমের শাসন? ভস্মীভূত গ্রামের, কারারুদ্ধ মানুষের, ক্ষুধার্ত শিশুর, অবহেলিত রোগীর; ছিল অত্যাচারের, শোষণের, দুর্নীতির। ছিল গুলির, বেয়োনেটের, বোমার। ছিল গুপ্ত হত্যার, বিশ্বাসঘাতকতার, ষড়যন্ত্রের।

মানুষ তাহলে কোন্ দিকে যাবে?

কোন অপরিচিতের দাবী নিয়ে মুক্তি যোদ্ধারা গ্রামের মানুষের কাছে হাজির হয়নি। ওরা ছিল গ্রামের মানুষেরই একজন। থাকত ওদের সঙ্গেই, খেতও ওদের সঙ্গে, পরতও ওদের মতোই। ওরা ছিল খুবই সাধারণ।

অথচ ওরা ছিল খুবই অসাধারণ। গ্রামের মানুষ ওদের চিনত অনেকদিন থেকেই। সেই ভিয়েৎমিন আমল থেকে। মানুষ জানতো ওরা দেশের মুক্তির জন্যে লড়াই করছে। মানুষ জেনেছিল ওরা ফরাসীদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করেছিল।

যখন ওরা আবার বলতে এলো সাম্রাজ্যবাদীরা এখনো দেশ ছেড়ে যায়নি, যখন ডাক দিয়েছিল এই বলে যে আরো সংগ্রাম, আরো রক্তপাত, আরো স্বার্থত্যাগ দরকার দেশকে পুরোপুরি স্বাধীন করবার জন্যে, তখন ওরা বিশ্বাস করেছিল সে কথা, এগিয়ে এসেছিল বিনা প্রশ্নে নিজেদের সাহায্য নিয়ে।

যারা ওদের সুখ-দুঃখের অংশীদার, যারা ওদের সঙ্গে সব সময় উঠছে, বসছে, কাজ করছে, ওরা তাদের জন্যে লড়াই করবে না তো কী করবে দুঃশাসন জিয়েমের জন্যে, ফ্রীডম প্যালেসের জানালার ফোকর দিয়ে যে ভিয়েৎনামকে দেখত? কিংবা ওই দুঃশাসনের দোসর আমেরিকানদের জন্যে যারা বোমা আর বেয়োনেটের বিনিময়ে আনুগত্য আদায় করতে চায়?

সুতরাং সময় এবং আহ্বান যখন এলো সেই আহ্বানে সাড়াও এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে।

জেনিভা চুক্তি কার্যকর হবার পর নির্দিষ্ট ৩০০ দিন থেকে তিন দিন আগে হো চি মিন তাঁর সৈন্যদের সরিয়ে নিয়েছিলেন দক্ষিণ থেকে। কিন্তু কিছু কিছু সক্রিয় সমর্থক রয়ে গিয়েছিল আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্যে। এরা প্রধানত ছড়িয়ে ছিল ফু ইয়েন, বিন দিন, কোয়াং নাম, কোয়াং নাই, ভিন লং, ভিন বিন, কা মাউ, কোণ্টুম, প্লাইকু ও দারলাক প্রদেশে এবং সায়গনের উত্তরাঞ্চলে। একটা ভিত্তি এইভাবে আগেই তৈরী ছিল, এখন ওই ভিত্তির ওপর নির্ভর করে ফ্রণ্টের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হল সারা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে।

১৯৮৫ সালের এপ্রিলে আমি যখন দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যাই তখন সরকারি হিসাব অনুযায়ী মূল 'ভিয়েৎকং' সৈন্য সংখ্যা ৩৫ হাজার, আর স্থানীয় বাহিনী আরো ৮০ হাজারের মতো।

কিন্তু নিছক এই সৈন্য সংখ্যা দিয়ে কিছুই বোঝা যাবে না, কারণ ভিয়েৎকংরা শুধু সৈন্য দিয়ে যুদ্ধ করে না। তারা যুদ্ধ করে দেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়েও। বলা যায়, জনশক্তিই তাদের আসল শক্তি। আমি শুনেছিলাম, অন্তত ৪০ থেকে ৫০ লাখ লোক তখনই সক্রিয়ভাবে তাদের সঙ্গে আছে।

অথচ সায়গনের সরকারী মুখপাত্ররা বারবার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে চলেছিল যে, গ্রামাঞ্চলে 'ভিয়েৎকংরা' একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব

সুরু করেছে, আর তার ফলে দলে দলে লোক পালিয়ে আসছে সরকারী এলাকায়।

ভিয়েৎনামে এই একটা কথা আমি প্রায়ই শুনতে পেতাম : সরকারী এলাকা আর 'ভিয়েৎকং' এলাকা। কিন্তু যদি এ নিয়ে প্রশ্ন করতাম তাহলেই আর সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যেত না। যদি জিজ্ঞেস করতাম সরকারী এলাকা বলে যাকে বলা হচ্ছে সেখানে একজনও গেরিলা নেই এই গ্যারান্টি কি তাঁরা দিতে পারেন, জবাব পেতাম, 'না'।

ওরা বলত, দিনের বেলা সরকারী বাহিনী যে এলাকায় বিনা বাধায় টহল দিতে পারে, সেই এলাকাই সরকারী এলাকা। কিন্তু ওরা ভুলে গিয়েছিল গেরিলারা কোন নিয়মিত সৈন্য বাহিনী নয়, কোন কেতাবী যুদ্ধও তারা লড়ছে না। শত্রু দেখলেই যে তাকে খতম করতেই হবে গেরিলা যুদ্ধে এমন কোন কথা নেই। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ যে কেবল গেরিলারাই চালায় তা নয়, চালায় সাধারণ মানুষও। নানাভাবে। কাজেই কোনো এলাকায় 'ভিয়েৎকং' নেই বলেই যে ওই এলাকা গেরিলাদের প্রভাবমুক্ত এমন মনে করার কোন কারণ নেই। তৃতীয়ত, গতিবিধির স্বাচ্ছন্দ্য গেরিলা যুদ্ধের একেবারে গোড়ার কথা। সুতরাং কোন বিশেষ এলাকাকে দখল করে সেখানে কায়েম হবার মতো বোকামী তারা করবে কেন? আর 'ভিয়েৎকং' এলাকা বলে যখন কোন নির্দিষ্ট এলাকা নেই তখন সরকারী এলাকারই বা কি তাৎপর্য থাকে? চতুর্থ, সরকারী বাহিনী টহল দেয় দিনের বেলায়। কিন্তু রাতের বেলায়? রাতে গেরিলাদের অবাধে ঘুরে বেড়াতে কে বাধা দিচ্ছে?

এ-ক্ষেত্রে এক দল লোক যদি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় তাহলে কী করে বলা যায় যে, তারা 'ভিয়েৎকং' এলাকা ছেড়ে সরকারী এলাকায় যাচ্ছে?

সে যাই হোক, আসলে কি লোকেরা ভিয়েৎকংদের 'সন্ত্রাসের' হাত থেকে বাঁচবার জন্যে দলে দলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে যাচ্ছিল?

"অসম্ভব।"

সায়গনের ক্যারাভেল হোটেলে বসে কয়েকজন জাপানী সাংবাদিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিনীদের পরেই সে সময় জাপানী সাংবাদিকের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী। যুদ্ধকে তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসরণ করেছে, গেরিলাদের কর্মপদ্ধতি ওরা খুব কাছে থেকে লক্ষ্য করেছে। তাছাড়া সংবাদ সংগ্রহের ওদের নিজস্ব সূত্র ছিল। তাদেরই একজন ওই একটি কথায় সায়গনের প্রচারের জবাব দিয়েছিল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, কেন অসম্ভব।

অপদার্থ, অত্যাচারী, দুর্নীতিপরায়ণ গ্রাম-মোড়ল আর প্রদেশ-প্রধানদের মৌরসী পাট্টা গায়ের জোরে খতম করে দেবার নাম যদি সন্ত্রাসবাদ হয় তাহলে ভিয়েৎকংরা নিঃসন্দেহে ছিল সন্ত্রাসবাদী। কিন্তু তার বাইরে ?

কর ওরা জোর করে আদায় কেন করবে যখন ওরা জমি বিলিয়ে দিয়েছিল গ্রামের মানুষের মধ্যে ?

যে চাষীর ক্ষেতে ওরা লাঙল দেয়, যে চাষী ওদের হয়ে বন্দুক ধরে রাত্রে, সে চাষীর ফসল ওরা লুঠ করবে কেন ? বিশেষ করে যখন ওদের একদিনের খাবার একটা ভাতের গোল্লা এবং যখন অধিকাংশ 'ভিয়েৎকং' গুপ্ত ঘাঁটির সঙ্গেই নিজস্ব ধানের ক্ষেত রয়েছে ?

রাত্রে তো বটেই, দিনেরও কিছুটা সময় যে গ্রাম ওরা পাহারা দেয়, সেই গ্রাম ওরা কেন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করবে ;

যে স্কুলে তাদেরই সমর্থকেরা শিক্ষকতায় নিযুক্ত, সেই স্কুল কেন ভাঙতে যাবে ওরা ?

যে হাসপাতাল বাড়ি একদিন তাদেরই সম্পত্তি হবে তা ওরা ভেঙে নিজেদের কাজ বাড়াতে যাবে কেন ?

যে সেতু ও রাস্তা ওদেরও পারাপারে সাহায্য করে সেই সেতু ও রাস্তা ওরা সাধারণত নষ্টই বা করবে কোন্ যুক্তিতে ?

যে মানুষগুলির সাহায্য না পেলে তাদের নিরাপত্তা নিরাপদ নয়, সেই মানুষগুলিকেই বা তারা কেন ভয়ে ভীত এবং আতঙ্কে সন্ত্রস্ত করতে চাইবে?

কাজ উদ্ধার করার জন্যে? যদি সন্ত্রাসই ওদের একমাত্র অস্ত্র হয়ে থাকে, যদি অধিকাংশ লোকই নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেরিলাদের সাহায্য করতে বাধ্য থাকে, তাহলে এতদিন ধরে এত ব্যাপক ভিত্তিতে এবং এত নিখুঁতভাবে একটা গেরিলা আন্দোলন চলতে পারে?

"যারা সন্ত্রাসের থিসিস প্রচার করছে," ওই জাপানী সাংবাদিক আরও বলেছিলেন, "তারা হয় ইচ্ছে করে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তথ্যকে বিকৃত করছে, না হয় মূর্খের স্বর্গে বাস করছে।"

বরং জন-সমর্থন প্রচণ্ডভাবে ছিল বলেই গেরিলারা দ্রুত একটা ব্যাপক সংগঠন গড়ে তুলতে পেরেছিল। এমন কোন গ্রাম ছিল না যেখানে কোন গেরিলা কম্যাণ্ড ছিল না। ওরা যাতায়াত করত বিনা বাধায়। ওরা সভা করত অনেক সময় লাউডস্পীকার লাগিয়ে।

প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে হত এই সব সভা। সারা গ্রামের লোক জড়ো হ'ত সেখানে। গ্রামের দায়িত্বে ছিল যে গ্রাম-কমিটি কিংবা বিশেষভাবে শিক্ষিত যে ক্যাডাররা ছিল সামরিক প্রস্তুতির জন্যে, তাদের সঙ্গে আলোচনা করত লোকেরা। তর্ক করত, কোন যুক্তি পছন্দ না হলে পাল্টা যুক্তি দেখাতো, অভাব-অভিযোগ থাকলে তা-ও পেশ করত। প্রতিকার হয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গেই।

গ্রাম কমিটি নির্বাচন করত গ্রামের লোকেরাই। নিজেদের মধ্যে থেকে। কাজেই কমিটির কাজ-কর্মে অবিশ্বাস বা বিরোধিতা করার প্রশ্নই উঠত না কোন। নিজেদের লোকের কাছেই ওরা নিয়ে যেত তাদের সমস্যা, নিজেদের লোকের স্বার্থে সেগুলি সমাধান করত কমিটি। এর মধ্যে সন্ত্রাসের কোন সুযোগই ছিল না।

গ্রাম কমিটির ওপরে জেলা কমিটি। বিশেষ কোন কাজের জন্যে অর্থ, লোক ও রসদের সংস্থান করার দায়িত্ব এই কমিটির ওপর। তার ওপর রয়েছে প্রদেশ কমিটি যার কাজ হল স্থানীয় গেরিলাদের মধ্যে সামরিক কর্তব্য বণ্টন করে দেওয়া। তারও ওপর সাতটি আঞ্চলিক কমিটি যার কাজ সাধরণভাবে হল বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। এগুলি আবার তিনটি আন্তঃ-অঞ্চল কমিটির আওতায়, গেরিলাদের ট্রেনিং এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচার যার প্রধান দায়িত্ব। একেবারে শীর্ষে রয়েছে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটি।

এই যে বিশদ, অন্তর্খণ্ডিত কাঠামো তা একেবারে নিচের স্তরে যার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল গেরিলাদের ভাষায় তার নাম ক্যাডার। সংগ্রামের বোঝা প্রধানত বইতে হ'ত, এখনও হয়, এই ক্যাডারদেরই। শত্রুপক্ষের গতিবিধির ওপর নজর রাখার দায়িত্ব ছিল এদেরই। নিজেদের যোগাযোগের ব্যবস্থায় যাতে কোন ত্রুটি না থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখত এরাই। রসদের সরবরাহ ঠিক ঠিক আছে কিনা তার খবরদারীর ভারও ছিল এদের।

এমন কোন সরকারি অফিস ছিল না যেখানে এই ক্যাডাররা অনুপ্রবেশ করেনি। এমন কি সরকারি গ্যারিসনের মধ্যেও এরা ছড়িয়ে পড়েছিল। টাইপিস্ট হয়ে কিংবা কেরানী সেজে মার্কিন সামরিক বা আধা-সামরিক দপ্তরে ঢুকে পড়তেও কোন বাধা ছিল না। সরকারি ট্রাকে ড্রাইভার হত ওরা, কিংবা বাসে। সরকারী অফিসার সেজে ওরা আদায় করত সরঞ্জাম, যোগাড় করত গোপন তথ্য। মশা-মারা কর্মচারী সেজে সরকারী সৈন্যদের নাকের ডগা দিয়েই নিজেদের কাজ করে যেত ওরা।

এইভাবে দেশ-জোড়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করার পর মুক্তিফ্রন্ট আরও একবার ভিয়েৎনামের অপহৃত স্বাধীনতাকে উদ্ধার করবার জন্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হল।

প্রথম প্রথম আক্রমণ ছিল বিক্ষিপ্ত, ছাড়া ছাড়া। ছোট ছোট দু'-পাঁচজনের দলে বিভক্ত হয়ে হঠাৎ এক-একটি বিচ্ছিন্ন সরকারী ঘাঁটিতে চড়াও হয়েই আবার দ্রুত সরে পড়ত গেরিলারা। বলা যায়, 'ভিয়েৎকং' লড়াইয়ে ওটা ছিল নেট প্র্যাকটিসের যুগ। ওরা পরীক্ষা করত নিজেদের দক্ষতা, গতিবিধির ক্ষিপ্রতা, অপর পক্ষের প্রতিক্রিয়া। ব্যবস্থা নিখুঁত হ'ত ক্রমে।

এবং, যেটা তখন গেরিলাদের পক্ষে আরো গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সংগ্রহ হত অস্ত্রশস্ত্র। ১৯৫১, ১৯৫৫ ও ১৯৫৯ এই তিন বছরে অন্তত ১৪ হাজার হাল্কা ও ভারী অস্ত্র ওরা যোগাড় করেছিল এইভাবে।

১৯৫৯ সালের শেষার্ধ থেকে লড়াইয়ের প্যাটার্ন গেল পাল্টে। গেরিলারা আরো বড় বড় দলে আক্রমণ চালাতে লাগল এবং তাদের অভিযানও ক্রমশ একটা সংঘবদ্ধ রূপ নিল।

ওদিকে প্রথমে শত শত, তারপর হাজার হাজার মার্কিন অফিসার ও নন-কমিশণ্ড অফিসার এসে পৌঁছতে লাগল ভিয়েৎনামে। জিয়েমের বাহিনীকে গড়ে-পিটে 'মানুষ' করবার জন্যে। যাতে ওরা গেরিলাদের আরো ভালোভাবে প্রতিহত করতে পারে।

ওই সব মার্কিন অফিসাররা ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে গ্রামে, জিয়েমের বাহিনীর উপদেষ্টা হয়ে। কিভাবে লড়াই করতে হবে, কিভাবে গেরিলাদের জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে, উপদেশ সেই বিষয়ে। যুদ্ধে যেত জিয়েমের সৈন্যরা, ওরাও সঙ্গে সঙ্গে যেত। দেখিয়ে দিত কোন্ পথে আক্রমণ আরম্ভ করতে হবে।

এমনি একজন উপদেষ্টা ছিলেন ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড নিডেভার। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যাবে গেরিলাদের প্রতিহত করার ধরণটি ছিল কি রকম।

১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একদিন। সন্ধ্যে তখন হয় হয়, কি সবেমাত্র সন্ধ্যের কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন

নিডেভার ট্রুং লাপে তাঁর আস্তানায় দাবার গুটি সাজিয়ে বসেছিলেন।

একলাই খেলছিলেন। এমনি তাঁকে প্রায়ই খেলতে হয়। নির্বান্ধব প্রহরগুলি যখন আর কাটতে চায় না, তখন তিনি এইভাবে সময় কাটাবার জন্যে বসতেন। সময় কেটে যেত।

ট্রুং লাপ জায়গাটা বেশী দূরে নয় সায়গন থেকে। উত্তর-পশ্চিমে মাত্র কুড়ি মাইল। তাহলেও যেন মনে হচ্ছে অনেক দূর। বাইরে অন্ধকারে ভালোভাবে ঠাহর হয় না কিছু। লোকজনের চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই। প্রায় ছাদ সমান উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট্ট দু'খানা পাকা ঘরের আস্তানার মধ্যে নিডেভার একা। দরজায় অবশ্য একজন ভিয়েৎনামী পাহারাদার আছে, কিন্তু তার সঙ্গে সন্ধ্যার আলাপ জমে না। একটু যে বাইরে বেড়িয়ে আসবেন তারও উপায় নেই। জায়গাটা একদম নিরাপদ নয়।

পাশেই ভিয়েৎনামী সৈন্যদের ব্যারাক। সারাদিন ক্যাপ্টেন নিডেভারের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে ওরা। যেতে কি চায়! একটু চলে তো বিশ্রাম করে তার বেশী। নিডেভার যদি বলেন একদিকে যেতে তো ওরা যাবে তার সম্পূর্ণ উল্টোদিকে।

এইভাবে কোন যুদ্ধ চালানো যায়? কিন্তু চালাতেই হবে, নিডেভার ভাবেন, কারণ তা না হলে কম্যুনিস্টরা নিয়ে নেবে দেশ।

সারাদিন পর সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করছে নিজেদের ব্যারাকে।

পরনে হাফপ্যাণ্ট, গায়ে গেঞ্জী, ক্যাপ্টেন নিডেভার বাঁ-হাতে সিগারেট ধরে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চালবার জন্যে সবে একটা বোড়ে তুলেছেন।

হঠাৎ···

রাত্রির অন্ধকার খান খান হয়ে গেল গুলির শব্দে। পর পর বেশ কয়েকটা।

বোড়ে হাত থেকে পড়ে গেল নিডেভারের। কান পেতে তিনি কিছুক্ষণ শোনার চেষ্টা করলেন। রাইফেলের গুলি বলেই মনে হচ্ছে। বেশী দূরেও তো মনে হল না।

নিডেভার বোঝবার চেষ্টা করলেন। একটা চাপা দৌড়োদৌড়ির আওয়াজ কানে এল। এ নিশ্চয়ই অ্যামবুশ, 'ভিয়েৎকংদের' চোরা-গোপ্তা আক্রমণ। এবং তাঁর শিবির থেকে বেশী দূরেও নয়।

এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন নিডেভার। ভাববার মতো কোন অবকাশ ছিল না তাঁর। দেয়াল থেকে টেনে নিলেন একটা কারবাইন। টোটা লাগানো একটা বেল্ট তুলে নিয়ে মালার মতো খালি কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর হাফপ্যাণ্ট আর হাত-কাটা গেঞ্জী পরেই ছুটে বেরিয়ে গেলেন দরজা দিয়ে।

নিডেভার দেখলেন অন্ধকার রাঙা হয়ে উঠেছে।

পাশের ব্যারাক থেকে ভিয়েৎনামী সৈন্যরা অটোমেটিক রাইফেলে 'ট্রেসার' ছুঁড়ছিল। আলোকরশ্মি হয়ে সেগুলি ছড়িয়ে পড়ছিল আকাশে। প্রায় শ'খানেক গজ দূরে একটা জায়গা তাইতে বেশ আলোকিত হয়ে উঠেছে।

ওই আলোর দিকে লক্ষ্য করে প্রথমেই কয়েকটা গুলি ছুঁড়ে দিলেন নিডেভার।

কিন্তু এত আলো সত্ত্বেও এ যেন অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া। কে শত্রু কে মিত্র কিছুই বোঝার উপায় নেই। নিডেভার শুধু দেখলেন ওই আলো'কে পেছনে রেখে কেবল কয়েকটা শিলুয়েট এধার-ওধার দৌড়োদৌড়ি করছে।

"কে, কে ওখানে?" চেঁচিয়ে উঠলেন নিডেভার। "ব্যাপার কী?"

কেউ কোন উত্তর দিল না। শুধু শুনতে পেলেন গুলি চলছে ঘনঘন।

তিনি আবার কারবাইন তুলে নিলেন। কিন্তু আবার নামিয়ে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে। কাকে গুলি করবেন? কে 'ভিয়েৎকং' আর কে তাঁদের সৈন্য? আন্দাজে গুলি করলে নিজের দলের লোকেরাই যে মারা পড়বে না তা কে বলতে পারে?

পোষাক দেখেও চেনার উপায় নেই। একে শিলুয়েট, ভালো করে বোঝাই যাচ্ছে না। তা-ও যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে নিডেভারের মনে হল সকলেই একই রকম পোষাক পরেছে।

কে যেন এদিকেই দৌড়ে আসছে না? কারবাইন তৈরী রেখে অপেক্ষা করতে লাগলেন নিডেভার। কিন্তু কে হতে পারে লোকটা? তিনি যে গুলি করবেন সে কাকে?

লোকটি যখন তাঁর সামনে দিয়ে চলে গেল নিডেভার তখনো বুঝতে পারেননি সে কে হ'তে পারে, 'ভিয়েৎকং' না ভিয়েৎনামী রেঞ্জার।

ঘণ্টাখানেক পর। গুলির আওয়াজ থেমে গেছে। আকাশে আলোর রশ্মিগুলিও আর নেই। অন্ধকার আবার আগের মতোই নিরন্ধ্র। কেবল তাঁর শিবিরে এবং পাশের ব্যারাকে আলো জ্বলছে।

ক্যাপ্টেন নিডেভার গম্ভীর মুখে ব্যারাকের উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সামনে তাঁর ইউনিটের লোকেরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ইউনিট কমাণ্ডার হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে জানাচ্ছিলেন, না, একজন 'ভিয়েৎকং'কেও ধরা যায়নি। অন্ধকারের সঙ্গে মিশে সরে পড়েছে ওরা, যাবার সময় ব্যারাকে যত অস্ত্র ছিল সব নিয়ে গেছে ঝেড়ে মুছে। মাঝখান থেকে নিজেদের গুলিতে মারা পড়েছে বেশ কিছু ভিয়েৎনামী সৈন্য।

ধীরে ধীরে ফিরে এলেন নিডেভার। তাঁর লোকেরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েই রইল। একজন কাঁদতে আরম্ভ করল।

নিডেভার তখন দাঁতে দাঁত চেপে ভাবছিলেন, এই অপদার্থদের নিয়ে তাঁরা গেরিলাদের ঠেকাবেন। তার পরেই তাঁর মনে হল এদেরই বা দোষ কি। রাত্রে হয়েই তো যত মুস্কিল। হ'ত যদি দিনের বেলা…।

নিজের চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন নিডেভার। এত জঘন্য ধরণের কালো রাত্রি তিনি আগে আর কোথাও দেখেননি।

ঠিক এই কথাই মনে হয়েছিল স্টাফ সার্জেন্ট ওয়েন মার্চ্যাণ্ড-এর।

"ট্রেসার ছোড়ো", তিনি চেঁচিয়ে উঠেছিলেন পাগলের মতো। "কোথায় গেল সব ট্রেসারগুলি।"

একবার যেন মনে হল সামনে থেকে গুলি আসছে। অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না, তবু যেন নাকের সোজাই কতকগুলি আগুনের হল্কা দেখা গেল।

ভিয়েৎনামা সৈন্যরা ভয় পেয়ে সেই আগুনের ফুলকিগুলির দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি উজাড় করে দিল।

যেন প্রতিধ্বনি ফিরে এলো তেমনিভাবেই, অন্ধকারের ওপার থেকে আবার শোনা গেল গুলির আওয়াজ। কিন্তু সামনে থেকে তো নয়! এ আওয়াজ যে আসছে ডান দিক থেকে!

আর তাতেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন মার্চ্যাণ্ড।

একে কালি-গোলা অন্ধকার, কোন দিকেই দৃষ্টি চলে না, তার ওপর গেরিলারা যদি একাধিক দিক থেকে আক্রমণ করে তাহলে কোনদিক সামলাবেন? এবং এইভাবে চারদিকে সৈন্যদের ব্যস্ত রেখে যদি উচু উঁচু ঘাসের ভেতর দিয়ে সাপের মতো বুকে হেঁটে গেরিলারা এগিয়ে আসে, তাহলে এই ঘাঁটি দখল করে নিতে তাদের কতক্ষণ লাগবে?

কোয়াং নাম প্রদেশের এক দূর গ্রামে এটা ঘাঁটিও বটে আবার

শিক্ষণ-শিবিরও বটে। মার্কিন স্পেশাল ফোর্সেস-এর শিবির। মার্চ্যাণ্ড এবং তাঁর সঙ্গী জেমস গ্র্যাব্রিয়েল ওই বিশেষ বাহিনীর লোক। তাঁদের মাথায় সবুজ বেরে টুপি। এই টুপি দুর্ধর্ষতার প্রতীক। এই টুপি যাঁরা পরেন, ধরে নেওয়া হয় তাঁরা একাধারে ঝানু পদাতিক, ছত্রী, সাবোটাজ-পারদর্শী, গেরিলা, ভাষাবিদ ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ।

মার্চ্যাণ্ড ও গ্র্যাব্রিয়েল এই শিবিরে ভিয়েৎনামী সৈন্যদের গড়ে-পিটে মানুষ করার কাজে নিযুক্ত আছেন। অর্থাৎ ভিয়েৎনামীদের তাঁরা শেখান কী করে গেরিলা যুদ্ধের মোকাবিলা করতে হয়।

গ্রামের নাম আন চাউ। ঠিক গ্রাম নয়। একটা ছোট্ট কাদা-জল নদীর ধারে কতগুলি খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরের মাইল খানেক লম্বা লাইন। জায়গাটা পাহাড়ী হলেও খুব একটা ঘন জঙ্গল নয় চারদিকে। মোটামুটি সমতলই বলা যায়। অথচ এই সমতলেই একদল গেরিলার আক্রমণে তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

অবশেষে, অনেক চেষ্টার পর, একটি ট্রেসার খুঁজে এনে ছোঁড়া হল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে একটা চোখ-ধাঁধানো নীলচে-সাদা আলোয় অন্ধকার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে ঘাসের জঙ্গল পরিষ্কার দেখা গেল নিস্তব্ধ বিছিয়ে রয়েছে পশ্চিম পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত।

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের জন্যেই। তার পর ধীরে ধীরে আলো ম্লান হয়ে এলো, এবং যখন একেবারে নিভে গেল তখন অন্ধকার দ্বিগুণ কালো হয়ে ওদের সামনে থেকে মুছে দিল সবকিছু।

ওই জঙ্গলে ওরা কিছুই দেখতে পায়নি।

তবে কি গেরিলারা ইতিমধ্যে সরে পড়েছে?

পরীক্ষা করবার জন্যে একজন একটা হাত বোমা ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে। দ্রুত বিস্ফোরণে টুকরোগুলি ছড়িয়ে পড়ল এদিকে-ওদিকে।

সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক বুলেট অন্ধকার ভেদ করে ছুটে এসে কয়েকটা

ঠুন ঠুন আওয়াজ তুলে এদিকে ঠিকরে পড়ল আর কয়েকটা আশেপাশের গাছের গুঁড়িতে বিঁধে গেল।

গেরিলারা তাহলে অতিমাত্রায় বর্তমান।

সে রাত্রে মার্চ্যাণ্ড বা গ্যাব্রিয়েল কিংবা তাঁদের ভিয়েৎনামী সৈন্যরা কেউই ঘুমোতে যাননি। তবে ওই রাত্রে আর গুলি আসেনি ঘাসের জঙ্গল থেকে। মার্চ্যাণ্ড ভাবছিলেন, কোন মতে যদি রাতটুকু পার করে দেওয়া যায় তাহলে আর ভয়ের কারণ নেই।

ভোরবেলা অন্ধকার যখন ফিকে হয়ে এলো, মার্চ্যাণ্ড তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর যখন দেখলেন রাস্তায় লোকজন চলাফেরা করছে, পসরা নিয়ে বাজারে চলেছে মেয়েরা, পাহাড়ের চালে গোরু চরাচ্ছে রাখাল, তখন তাঁর মনে হল সবই স্বাভাবিক আছে, রাতে যা ঘটেছিল সেটা একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

একটা গাছের নিচে দুটো ক্যাম্প চেয়ার টেনে এনে ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসেছিলেন মার্চ্যাণ্ড ও গ্যাব্রিয়েল। কাল রাতে খাবার সময়-টুকু পর্যন্ত পান নি তাঁরা। একটু দূরে ভিয়েৎনামী সৈন্যরা চায়ের কাপ নিয়ে চুপ-চাপ খেয়ে যাচ্ছিল। কাল রাতের অভিজ্ঞতা দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল ওদের। ওরা জানতো সামনে পেছনে যে পাহাড়গুলি রয়েছে সেগুলিতে গেরিলারা গিজগিজ করছে। যদি তারা একসঙ্গে কখনও আক্রমণ চালায় তাহলে আর রক্ষা নেই।

মুখ থেকে সিগারেটটা নামিয়ে রেখে পা দুটো সামনে ছড়িয়ে দিয়ে চেয়ারে আধ-শোয়া অবস্থায় আকাশের দিকে তাকালেন মার্চ্যাণ্ড। তারপর কাঁটাতারের বেড়ার ওদিকে ঘাসের জঙ্গল পার হয়ে ধানের ক্ষেতের দিকে চোখ ফিরিয়ে গ্যাব্রিয়েলকে বললেন: "হোয়া কামে (স্পেশাল ফোর্সেস-এর ট্রেনিং ক্যাম্প) খবর দিতে হবে আমাদের আরো গোলা-বারুদ, ট্রেসার শেল দরকার। কখন কী হয় তো বলা যায় না।"

পাকা ধানের ক্ষেত একটা সোনার কার্পেটের মতো বিছিয়ে রয়েছে।

হঠাৎ যেন মনে হল মার্চ্যাণ্ডের, ধানের গাছগুলি একটু নড়ে উঠল।

চকিতে সোজা হয়ে বললেন তিনি।

"কী ব্যাপার?" জিজ্ঞেস করলেন গ্যাব্রিয়েল। পাহাড়ী এলাকায় মেঘমুক্ত দিনে ভোরের একটা আমেজ আছে। সেই আমেজে একটু ঝিমুনি ধরেছিল তাঁর। হঠাৎ মার্চ্যাণ্ডকে সোজা হয়ে বসতে দেখে তিনিও ধড়ফড়িয়ে উঠলেন।

"দেখ তো জিম, ধানের ক্ষেতে কিছু দেখতে পাও কিনা।"

খুব শক্ত করে তাকাবার চেষ্টা করল গ্যাব্রিয়েল। তারপর হঠাৎ এক লাফ দিয়ে কারবাইনটা টেনে আনতে আনতে বলল: "হ্যাঁ, ধান ক্ষেত নড়ছে, 'কং'রা নিশ্চয়ই ওখানে লুকিয়ে আছে।"

গ্যাব্রিয়েল ততক্ষণে কারবাইনটা তুলে নিয়ে তাক করছে ক্ষেতের দিকে।

"সাবধান জিম!" মার্চ্যাণ্ড চেঁচিয়ে বলে উঠল। "এটা রাত নয়, দিন। আমরা জানি না ওদের সংখ্যা কত, ওরা জানে আমাদের শক্তি কি। আমরা দেখতে পাচ্ছি না ওদের কিন্তু ওরা আমাদের পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে। এই অবস্থায় গুলি চালানো ঠিক হবে কি?"

"না করে উপায় কী" গ্যাব্রিয়েলের উত্তর। "আমি জানি ওরা গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। এবং এসে পড়বেও একেবারে আমাদের বেড়ার ধার পর্যন্ত। তখন আর আত্মরক্ষার সুযোগ পাবো না।"

এই বলে খুব সন্তর্পণে অনেকক্ষণ ধরে তাক করে গুলি করলেন ধান ক্ষেতের একটা জায়গা লক্ষ্য করে। গেরিলারা যদি সংখ্যায় অল্প হয় তাহলে তারা এরপর আর এগোতে সাহস পাবে না।

কিন্তু যদি সংখ্যায় বেশী হয়?

সে-কথা আর ভাববার সময় পেলেন না মার্চ্যাণ্ড কিংবা গ্যাব্রিয়েল। চারদিক থেকে ধান গাছগুলি যেন একসঙ্গে বিস্ফোরণে ফেটে পড়ল। যেন ধানের গাছগুলিই রাইফেল হয়ে গুলি ছুঁড়তে লাগল বৃষ্টির ধারার মতো।

এই ভয়ঙ্কর অবস্থার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না মার্চ্যাণ্ড কিংবা গ্যাব্রিয়েল। ওঁরা ভাবতেও পারেননি সারা রাত ধরে গেরিলারা পাহাড় ছেড়ে ধান ক্ষেতে এসে জড়ো হয়েছে।

"আক্রমণ! এ রীতিমতো একটা আক্রমণ!" স্লিট ট্রেঞ্চে ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে চিৎকার করে উঠলেন মার্চ্যাণ্ড।

ওদিকে ভিয়েৎনামী সৈন্যরা ভয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। একজন শুয়ে বিশ্রাম করছিল, সে আর উঠল না। চায়ের কাপ মুখে তুলেছিল আরেকজন, হাত থেকে পড়ে গেল কাপ, যন্ত্রণায় হাত দুটো একবার ওপরের দিকে তুলে থুবড়ে পড়ল মাটির বুকে। কেউ দৌড়ে নামতে যাচ্ছিল ট্রেঞ্চে, পায়ে গুলি লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

এদিকে এরা মাত্র জনা চল্লিশেক। ওদিকে ওরা কত?

"গুলি চালাও! শীগ্‌গির গুলি চালাও, নইলে আমরা শেষ হয়ে যাবো!" মার্চ্যাণ্ডের নির্দেশ একটা প্রচণ্ড আর্তনাদের মতো শোনালো।

এদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট গিয়ে ধানের গাছগুলিকে দুলিয়ে দিল ভীষণভাবে।

কিন্তু এ কি! ঘাসের জঙ্গল নড়ছে কেন?

"শুধু নড়ছে কই, এগিয়ে আসছে যে!" রেডিও ট্রান্সমিটারে হোয়া কামকে ধরবার চেষ্টা করতে করতে বলে উঠলেন গ্যাব্রিয়েল।

বিস্মিত মার্চ্যাণ্ড দেখলেন, ঘাসের জঙ্গল এক এক লাফে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। তিনি বুঝলেন এটা ক্যামো-

ক্লেজ। ওই এক একটা ঝাড়ের নিচে একজন করে 'কং' লুকিয়ে আছে।

এবার গুলি আসতে লাগল ঘাসের জঙ্গল থাকে।

মার্চ্যাণ্ড এখন কোন দিক সামলাবেন? ধানের ক্ষেত লক্ষ্য করে গুলি চালালে জঙ্গল এগিয়ে আসে, আর জঙ্গল নিয়ে পড়লে ধান ক্ষেত নিরাপদ। অথচ এটা ভরা দিন।

"হোয়া কাম! হোয়া কাম! গেরিলারা ঘাঁটি দখলের জন্যে আক্রমণ স্থরু করেছে। শীগ্‌গির প্লেন পাঠান। শীগ্‌গির! আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি!" দ্রুত, উত্তেজিত, চাপা গলায় গ্যাব্রিয়েল কথা বললেন ট্রান্সমিটারে।

তারপর মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন: "আসছে! যে-কোন মুহূর্তেই এসে পড়বে।"

আর সঙ্গে সঙ্গে, বোধ হয় তাঁর এই কথার জবাবে, প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দ এলো একেবারে কাঁটাতারের বেড়ার কাছ থেকে।

মার্চ্যাণ্ড উদ্‌ভ্রান্ত। গ্যাব্রিয়েল অবাক। ভিয়েৎনামী সৈন্যেরা এলোপাথাড়ি গুলি করেই চলেছে।

"ওরা যে একেবারে ঘাঁটির গায়ে এসে পড়েছে।"

"ঐ দেখ। কাঁটাতারের বেড়া ছিঁড়ে ফেলেছে ওরা!"

মার্চ্যাণ্ড দেখলেন চার-পাঁচজন গেরিলা ছেঁড়া কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে হাত বোমা নিয়ে ছুটে আসছে তাঁদের ট্রেঞ্চের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলেন তিনি। জন দুয়েক গেরিলা সেইখানেই পড়ে গেল। কিন্তু ওই ফাঁকে, মার্চ্যাণ্ড দেখলেন, বাকী গেরিলারা এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। তাদের পেছনে আরো কয়েকজন আসছে। তাদেরও পেছনে আরো।

ওদিকে জঙ্গল আর ক্ষেত থেকেও গুলি চলছে সমানে।

কত লোককে খতম করবেন তিনি? এখন যেন মনে হল

মার্চাণ্ডের জঙ্গলের ঘাসগুলিই মানুষ হয়ে এইদিকে এগিয়ে আসছে।

পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি : "গুলি থেমে যাচ্ছে কেন? আমাদের লোকগুলি করছে কি? সব কি মরে গেছে নাকি?"

গ্র্যাব্রিয়েল কেটে যাওয়া রেকর্ডের মতো বকে যেতে লাগলেন ট্রান্সমিটারে : "আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি···রিপিট···আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি···রিপিট···আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি।"

ভুলে গিয়েছিলেন মার্চ্যাণ্ড যে তাঁরা সংখ্যায় মাত্র ২০ জন। আর আর এ খেয়ালও তাঁর হয়নি উত্তেজনার মুহূর্তে কখন তিনি ট্রেঞ্চে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

যখন খেয়াল হল তখন তাঁর সারা শরীর কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছে। তাঁর মুখ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, হাত দুটি শিথিলভাবে দুলতে লাগল দু'পাশে, মুখ ছাই হয়ে গেল নিদারুণ যন্ত্রণায়।

"হায় যীশু!" বলে তিনি লুটিয়ে পড়লেন ট্রেঞ্চের মেঝেতে। তাঁর সবুজ টুপি ছিটকে পড়ল দূরে।

একটা গুলি তাঁর বুক ভেদ করে চলে গিয়েছিল।

গ্যাব্রিয়েল তাড়াতাড়ি আবার ট্রান্সমিটার চালু করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এবার আর কিছুতেই যোগাযোগ করা গেল না হোয়া কামের সঙ্গে। ওদিকে গুলির আওয়াজ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। এখন কত দূরে হবে? একশ' গজ? পঞ্চাশ গজ। নাঃ, আরো যেন কাছে মনে হচ্ছে।

গ্যাব্রিয়েল একটা গ্রিনেড নিয়ে ট্রেঞ্চের মুখ দিয়ে গড়িয়ে দিলেন নিচে। একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরো একশ' গুণ বেশী বিস্ফোরণ যেন ফেটে পড়ল ট্রেঞ্চের মাথার ওপর।

"ওরা একেবারে কাছে এসে পড়েছে, আর রক্ষা নেই।" গ্যাব্রিয়েল আর্তনাদ করে উঠলেন।

আর কিছু বলতে পারেননি গ্যাব্রিয়েল। তার আগেই একটা গুলির আঘাতে তিনি ছিটকে পড়েছিলেন ট্রেঞ্চের দেয়ালে।

তারপর হঠাৎ গুলি থেমে গিয়েছিল আন চাউ শিবিরে। প্রচণ্ড গোলা-গুলির পর ওই স্তব্ধতা ছিল অতল, অপরিমেয়।

প্রায় এক ঘণ্টা যুদ্ধের পর আন চাউ শিবির নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল গেরিলারা।

পরে, অনেক পরে, যখন প্লেন এসেছিল আন চাউয়ে তখন সেখানে ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটি মৃতদেহ আর নিস্তব্ধ ঘাসের জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

অথচ সেটা ছিল ভরা দিন।

দশ

'তিয়েন-লেন!'

হ্যাঁ, রাত সহায় ছিল গেরিলাদের। নিরক্ষীয় এলাকার নিকষ কালো রাত। ঝিরঝিরে বৃষ্টি হওয়া রাত। লতায়-পাতায়, জঙ্গলে-জঙ্গলে আটকে থাকা গাঢ় অন্ধকার।

কিন্তু আন চাউ তো শুধু রাত্রের ঘটনা ছিল না। সেখানে বরং প্রধান আক্রমণটাই হয়েছিল দিনে। এবং যে জাপানী সাংবাদিকের কাছে আমি আন চাউ'র ঘটনা শুনেছিলাম, তিনিই বলেছিলেন যে, ১৯৫৯ সাল থেকে আন চাউ'র মতো আক্রমণ শত শত হয়ে এসেছে এবং সবগুলিই রাত্রের অভিযান নয়।

ভিয়েৎনামী কর্তারা আর তাঁদের মার্কিন উপদেষ্টারা ভেবেছিলেন সারা দক্ষিণ ভিয়েৎনাম জুড়ে যদি তাঁরা সশস্ত্র ঘাঁটির একটা জাল বিছিয়ে দিতে পারেন তাহলে ওই সব ঘাঁটি থেকে আশেপাশের এলাকায় নিয়মিত টহল দিয়ে গেরিলাদের ছেঁকে তোলা সম্ভব।

কিন্তু এখন তাঁরা দেখলেন, ঘাঁটিগুলি গেরিলাদেরই টারগেট প্র্যাকটিসের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। একের পর এক ঘাঁটিগুলি আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হ'তে লাগল। সরকারের হাতে ছিল প্লেন। প্লেন থেকে বোমা ফেলে তারা কোথাও কোথাও গেরিলাদের হটিয়ে দিত বটে, কিন্তু সেটা কোন কথাই নয়। কারণ এই রকম ঘটনার সংখ্যা ছিল খুবই অল্প, আর ঘাঁটিগুলি অকেজো হয়ে যেত ঠিকই।

আর টহল? দেখা যাক সেটাই বা কিরকম কার্যকর ছিল।

মধ্য ভিয়েৎনামের পাহাড়ী এলাকার এক জঙ্গলে টহল দিতে গিয়ে একদিন মার্কিন স্পেশাল ফোর্সেস-এর দু'জন উপদেষ্টা ও তাঁদের

উপজাতীয় অনুচরেরা একটা গাছের ফাঁপা গুঁড়ির মধ্যে কতকগুলি প্লাষ্টিকের বাসনের ঢাকনা খুঁজে পেলেন। তারপর এধার ওধার তাকিয়ে দেখলেন কতগুলি অ্যালুমিনিয়ামের বাসন মাটিতে ছড়ানো রয়েছে। ছড়ানো ঠিক নয়, এক-একটা গর্তের মুখে বসানো রয়েছে। চাল আর জল রয়েছে তার মধ্যে। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই কিন্তু ওই এক একটা গর্ত এক একটা উনুন। আগুন জ্বলছে। কিন্তু ধোঁয়া বেরোচ্ছে না, কারণ, পরে দেখা গেল, চার পাশে লম্বা লম্বা সুড়ঙ্গ কেটে মাটির তলা দিয়েই ধোঁয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিছুটা দূরে যাতে ধোঁয়া মাটির সঙ্গেই মিশে যেতে পারে, আর যেটুকু বেরোবে জঙ্গলের মধ্যে ততটা নজরে পড়বে না।

"এটা ভিয়েৎকংদের একটা আস্তানা," একজন মার্কিন উপদেষ্টা আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। "নিশ্চয়ই আমাদের আসার খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়েছে।"

জিনিসগুলি যেমন ছিল তাঁরা তেমনই রেখে দিলেন। তারপর আশেপাশে অনেকদূর পর্যন্ত সন্তর্পণে খুঁজে বেড়ালেন। কিন্তু কোথাও গেরিলাদের দেখা পেলেন না। আবও কয়েকদিন পব পর এলেন, তবু গেরিলাদেব টিকিটিও দেখা গেল না।

তখন হঠাৎ তাঁদের মধ্যে একজনের মনে হল, তাঁরা যখন টহল দেন তখন কারা যেন তাঁদের পেছন পেছন ছায়ার মতো অনুসরণ করে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল যেখানটায় তাঁরা গেরিলাদের আস্তানা আবিষ্কার করেছিলেন সেখান থেকে কিছুটা দূরে কাসাভা গাছের একটা ঝাড় আছে। তার গোড়ায় তিনি যেন প্রায়ই নতুন নতুন জায়গায় মাটি খোঁড়া দেখতে পেয়েছেন।

নিশ্চয়ই আমরা চলে গেলে তারা গাছেব মূল (খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত) তুলতে আসে, তিনি ভাবলেন।

ব্যস্, অমনি একটা প্ল্যান এঁটে ফেললেন তাঁরা। ঠিক হল

পরের দিন যথারীতি টহল বেরোবে এবং যেন তারা গেরিলাদের খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়েছে এমনিভাবে কাসাভার ঝাড় ছাড়িয়ে কিছু দূর গিয়ে ফিরে আসবে। তার আধ ঘণ্টা পর শিবির থেকে ওই ঝাড়ের দিক লক্ষ্য করে গোলা বর্ষণ করা হবে। ততক্ষণে গেরিলারা নিশ্চয়ই মূল খোঁড়বার জন্যে সেখানে ফিরে আসবে।

পরের দিন। টহল যথারীতি বেরোল এবং কাসাভার ঝাড় ছাড়িয়ে কিছুদূর এগিয়েও গেল। তারপর ফিরতি পথে তারা আবার ঝাড়ের কাছাকাছি এসে পড়েছে, হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার করে একজন স্পেশাল ফোর্স উপদেষ্টা বসে পড়লেন। তাঁর হাত থেকে এ-আর ১৫ অটোমেটিক রাইফেলটি পড়ে গেল। একটা লতায় তাঁর পা লেগেছিল, অমনি একটা বাঁশের বর্শা ছিটকে এসে বিঁধে গেল তাঁর বাঁ হাতে।

ধনুকের মত বাঁকিয়ে লতার সঙ্গে এমনভাবে আটকানো ছিল বর্শা যে লতায় একটু টান লাগার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ছিটকে বেরিয়ে আসে। একটা ভৌতিক কাণ্ড যেন।

তবু ভালো এটা বর্শা। এমনি কায়দায় মাইনও পেতে রাখে গেরিলারা। তাহলে আর দেখতে হ'তনা।

বর্শাটা টেনে বার করতে কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু সোজা পথে আর যেতে ভরসা হল না। কে জানে আরো কত আপাত-নির্দোষ লতার পেছনে মারাত্মক বর্শা লুকিয়ে আছে।

কাজেই ঘুর-পথে ফিরে যাওয়াই ঠিক করলেন স্পেশাল ফোর্স উপদেষ্টারা। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। কারণ একটু পরেই গোলা-বর্ষণ সুরু হয়ে যাবে। সেজন্যে তাড়াতাড়ি হাঁটছিলেনও তাঁরা।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো দলটি। উপদেষ্টারা দেখলেন, সঙ্গের পাহাড়ীরা দেখালো, সামনে মাটিতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছুঁচলো-মুখ বাঁশের ফলা পোঁতা। একবার যদি সেখানে পা পড়ে তো সোজা গেঁথে যাবে।

একটা একটা করে ফসলগুলি তুলে ইঞ্চি ইঞ্চি করে দলটা যখন এগোতে লাগলো তখন গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে।

ভিয়েৎকংদের জন্যে পাতা ফাঁদে নিজেরাই পা দিয়ে ঈশ্বরের নাম করে অপেক্ষা করা ছাড়া ওই টহলদার দলের আর কিছু করার ছিল না।

সুতরাং সায়গনের কর্তারা যখন দেখলেন গেরিলাদের ছেঁকে তোলার বদলে তাঁদের পাতা জাল নিজেদেরই হতাহতদের টেনে তুলতে লাগল, তখন তাঁরা একটি নতুন বুদ্ধি বাতলালেন। ঠিক হল মাটিতে টহল দিয়ে গেরিলাদের খুঁজে বার করার চাইতে টহলের জন্যে ক্রমশ বেশীমাত্রায় হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হবে।

এলো এইচ-২১ 'উড়ন্ত-কদলী', ইউ-এইচ ১-বি 'হুই'। ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়।

কিন্তু তাতে লাভ হলো কি? সৈন্যদের গতিবিধির তৎপরতা বেড়ে গেল বটে, কিন্তু গেরিলাদের কি খুঁজে পাওয়া গেল?

রাত্রিবেলা ওই জঙ্গল ভেদ করে গেরিলাদের তল্লাসী করার কথা চিন্তা করাই অবাস্তব। আর দিনের বেলা? আকাশে উড়ে সায়গনের হেলিকপ্টার শুধু গেরিলাদের চোখের সামনেই নিজেকে মেলে ধরেছিল। ঘন জঙ্গলের আড়াল থেকে গুলি করে তা নামিয়ে দেওয়া কিছুই কঠিন ছিল না। প্রায়ই দেখা যেতো হেলিকপ্টারগুলি কিছুক্ষণ বৃথা ঘুরে বেড়িয়ে আন্দাজে কিছু গুলি এলোপাথাড়ি ছিটিয়ে দিয়ে ঘাটিতে ফিরে আসত। গেরিলারা বাধা দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানাবার কোন চেষ্টাই করত না।

কখনো কখনো মার্কিনীরা একটু চালাকি করবার চেষ্টা করতেন। একটা হেলিকপ্টারকে আগে 'টোপ' হিসেবে পাঠানো হতো। খানিকক্ষণ আকাশে উড়ে ওই 'টোপ' ক্রমে ক্রমে নিচুতে নামতো। যখন 'টোপ' অনেকখানি নেমে এসেছে, গাছের মাথা প্রায় ছোঁয়

ছোঁয়, তখন গুলি আসত নিচে থেকে। সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপ্টার থেকে খবর যেত বেতারে: গেরিলারা টোপ গিলেছে। ছুটে আসত অন্যান্য হেলিকপ্টার যারা এতক্ষণ দূরে দূরে ছিল। মাটির যে জায়গা থেকে গুলি এসেছিল সেই জায়গা লক্ষ্য করে চালাতো গোলা, ফেলত বোমা।

প্রথম প্রথম এতে যে কাজ হয় নি তা নয়। কিন্তু গেরিলারা শিগ্‌গিরই ধরে ফেলেছিল চালাকি। তার পর থেকে ওরা টোপ যদি গিলত তো গিলত ইচ্ছে করেই, এবং যখন বোমা নিয়ে বাকি হেলিকপ্টারগুলি আসত তখন চারদিক থেকে গুলি এসে পড়ত তাদের ওপর। গেরিলাদের ঘায়েল করার বদলে তারাই ফিরে যেত ঘায়েল হয়ে।

শেষের দিকে কোন বিশেষ অভিযানের জন্যে সৈন্য নিয়ে যেসব হেলিকপ্টার যেত সেগুলিও গেরিলা আক্রমণে কিমা-কাটা হতে লাগল।

যেমন হয়েছিল আপ বাক-এ। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারিতে।

সায়গনের দক্ষিণে মাই তো প্রদেশে একটি ছোট্ট গ্রাম আপ বাক। ওই গ্রামে, সরকারের কাছে খবর এলো, বেশ কিছু গেরিলা জমায়েত হয়েছে। তাঁরা ঠিক করলেন, গেরিলাদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

নৌকা করে, সাঁজোয়া গাড়ি করে, হেলিকপ্টারে করে অন্তত হাজার তিনেক সৈন্য পাঠানো হল আপ বাকে। খবর ছিল যে, গেরিলারা সংখ্যায় দুশোর মতো হবে। সুতরাং মার্কিন সমর বিশারদরা প্রায়ই যে বলে থাকেন একজন গেরিলা পিছু দশ জন সৈন্য থাকলে যুদ্ধ জয় করা সম্ভব, সেই অনুপাত আপ বাকে ছিল।

গ্রামের পাশে একটা ধান ক্ষেতের ধারে জঙ্গলের মধ্যে জড়ো হয়েছিল গেরিলারা। ওই জঙ্গলের প্রায় চারদিক ঘিরে মোতায়েন

হয়ে গেল সৈন্যরা। তারপর ভোর নাগাদ আরম্ভ হল আক্রমণ। চারদিক থেকে গোলা আর আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে এই বর্ষণ চলল প্রচণ্ডভাবে। ভারী ভারী বোমা পড়তে লাগল বৃষ্টির ধারার মতো।

জঙ্গল কিন্তু চুপ করেছিল এতক্ষণ। গেরিলারা অপেক্ষা করছিল উপযুক্ত সময়ের জন্যে। সময় এলো যখন ভিয়েৎনামী বাহিনী আর মার্কিন উপদেষ্টারা ভাবলেন, ওই সাংঘাতিক বোমাবর্ষণে গেরিলাদের শিরদাঁড়া নিশ্চয়ই ভেঙে গিয়েছে, কাজেই এখন জঙ্গলে প্রবেশ করে তাদের একেবারে খতম করতে কোন অসুবিধা হবে না।

ধানের ক্ষেতে তখন প্রায় হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ভরা। মার্কিনীদের পরামর্শে প্রায় ৪০০ ভিয়েৎনামী সৈন্যকে ওই কাদার মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হল। থপ্ থপ্ করতে করতে ওই কাদা ভেঙে এগোতে লাগল তারা।

এগোতে দিয়েছিল গেরিলারা। জঙ্গল এত ঘন ছিল যে, কোন্ ঝোপের আড়ালে কে লুকিয়ে বসে আছে তা বোঝবার কোন উপায় ছিল না সূর্যালোকিত ধান ক্ষেত থেকে। ভিয়েৎনামী সপ্তম ডিভিসনের সৈন্যরা এগিয়ে গিয়েছিল একেবারে জঙ্গলের কিনারা পর্যন্ত।

ওরা জানতো না গেরিলাদের বন্দুকের নল তখন মাত্র কয়েক গজ দূরে।

সেই নল এখন গর্জে উঠল একসঙ্গে, সবগুলি। যেন হাঁস শিকার করছে এইভাবে গেরিলারা পট্ পট্ করে গুলিতে বিঁধে শুইয়ে দিল সায়গনের সৈন্যদের। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রথম দল খতম।

সঙ্গে সঙ্গে আরো সৈন্য এলো হেলিকপ্টারে। তাদের নামিয়ে দেবার জন্যে 'উড়ন্ত কদলী'গুলিকে নেমে আসতে হয়েছিল মাঠের

কাছাকাছি, সুতরাং জঙ্গলেরও কাছাকাছি। এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার গর্জে উঠেছিল গেরিলাদের মেশিনগান।

"জঙ্গলের প্রান্তে একটি ভূমিকম্প ফেটে পড়ল যেন," একজন পাইলট মন্তব্য করেছিলেন পরে।

প্রায় পয়েণ্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জের গুলিতে পাঁচটা হেলিকপ্টার ধান ক্ষেতের কাদায় আছাড়ে পড়ল তক্ষুণি এবং আরো অন্তত ন'টা বুকে পিঠে বড় বড় গর্ত নিয়ে দুলতে দুলতে ফিরে গেল কোনরকমে।

সপ্তম ডিভিশনের কিছু 'ঝানু' সৈন্য ইতিমধ্যে নেমে পড়েছিল মাঠে। ব্যাপার দেখে তারা আর এগোতেই চাইল না। সটান শুয়ে পড়ল কাদার মধ্যে, এবং যুদ্ধের সাধ পরিত্যাগ করে সেইখানে শুয়েই রইল।

আট ঘণ্টা পর আরো সৈন্য এসেছিল আপ বাকে। আকাশ থেকে তো বটেই মাটি থেকেও সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে বার বার আক্রমণের চেষ্টা করেছিল সরকারী বাহিনী। বার বার গেরিলারা ফিরিয়ে দিয়েছিল সেই আক্রমণ।

"বাপরে বাপ!" মন্তব্য করেছিলেন একজন মার্কিন উপদেষ্টা। "যতবার আমরা ভেবেছি এবার বাছাধনকে শেষ করেছি, ততবারই আবার সে ঠিক নিজের জায়গায় উঠে দাঁড়িয়ে গুলি চালিয়ে গেছে।"

সেদিন অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর গেরিলারা টুক্ টুক্ করে সাম্পানে চড়ে একটি খাল দিয়ে সরে গিয়েছিল একে একে। সারা রাত ধরে ওই ফাঁকা জঙ্গলে বোমা ফেলার পর সকালে যখন ভিয়েৎনামী বাহিনী জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছিল তখন গেরিলারা মাইল দুয়েক দূরে একটা জায়গায় বিশ্রাম করছে।

ভিয়েৎনামী বাহিনী দেখল জঙ্গলের মধ্যে মাইল খানেক লম্বা ও সিকি মাইলের মতো চওড়া এক জায়গা জুড়ে সারি সারি শুধু ট্রেঞ্চ। প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সঙ্গে জোড়া। গাছ বাঁচিয়ে, ঝোপ বাঁচিয়ে গভীর করে কাটা সেই সব ট্রেঞ্চ। ওপরে লতা-পাতা ডাল-পালা দিয়ে

ক্যামোফ্লেজ করা। মাঝে মাঝে ট্রেঞ্চের দেয়াল কেটে মাটির নিচেই খুপড়ির মতো সাজানো।

বোমা যতই ভারী হোক এবং বর্ষণ যতই হোক প্রবল, সাধ্য কি নিজেরা সরে না গেলে কেউ এই ট্রেঞ্চ থেকে গেরিলাদের উৎখাত করে।

আপ বাকেই গেরিলারা প্রথম সরকারী বাহিনীর সঙ্গে একটা মুখোমুখি বড় রকমের সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, এবং সরকারী বাহিনীও এই প্রথম সংঘবদ্ধভাবে গেরিলাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল।

আমরা দেখেছি ওই লড়াইয়ের ফয়সালা কিভাবে হয়েছে। গেরিলাদের পক্ষে নিহত হয়েছিল মাত্র ১৩ জন। তাদের এক-জনকেও সরকারী বাহিনী জীবিত ধরতে পারে নি।

গেরিলারা অবশ্য তাদের জঙ্গলের ঘাঁটি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এই থেকে যদি কেউ ভাবেন সায়গনের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল, গেরিলাদের ঘাঁটি থেকে উৎখাত করা হয়েছিল, তাহলে তিনি ভুল করবেন।

কারণ গেরিলা যুদ্ধের প্রধান কথাই হল 'মবিলিটি', অর্থাৎ সচলতা। গেরিলারা যত সচল থাকতে পারবে ততই তারা দুর্ভেদ্য। কোন জঙ্গল বা কোন গ্রাম বা কোন সরকারী ঘাঁটি দখল করে সেখানে কায়েম হয়ে বসে থাকা 'ভিয়েৎকং'দের রণকৌশলের অঙ্গ নয়। ওইভাবে বসে থাকার অর্থ হচ্ছে বেশ কিছু গেরিলাকে অনাবশ্যক এক জায়গায় আটকে রাখা। যে-মুহূর্তে গেরিলারা ওই ভাবে আটকে থাকবে সেই মুহূর্তে গেরিলা-যুদ্ধ প্রচলিত-যুদ্ধে পরিণত হবে, এবং প্রচলিত-যুদ্ধে আমেরিকার উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের কাছে পেরে ওঠা কঠিন।

তাছাড়া এইভাবে জায়গা দখল করে রাখার কোন দরকারই নেই তাদের। কারণ যে জঙ্গল বা যে গ্রাম তারা পরিত্যাগ করে

গেল সেই জঙ্গলে বা গ্রামে তারা আবার সুবিধা মতো নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্যে ফিরতে আসতে পারে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের যে কোন জায়গায় তাদের গতিবিধি স্বচ্ছন্দ। এর প্রধান কারণ, কে গেরিলা আর কে নয় তা আলাদা করে বোঝবার কোন উপায় নেই। কিন্তু একটা বড় কারণ হচ্ছে, যে গ্রাম থেকে গেরিলারা আপাতত সরে গেল সেই জঙ্গল বা গ্রাম পাহারা দেবার মতো লোকবল সরকার বা আমেরিকানদের হাতে নেই। সেটা অবাস্তবও বটে।

গেরিলাদের তুলনায় ভিয়েৎনামী-মার্কিনী বাহিনীর সবচেয়ে বড় অসুবিধাই এইখানে। এরা প্রচলিত ধাঁচের যুদ্ধ করছে, কাজেই এদের অধিকাংশ সৈন্যই স্থাবর পাহারাদারীর কাজে নিযুক্ত। স্থাবর ঘাঁটিগুলির বাইরে যে এলাকা সেখানে গেরিলাদের অবাধ রাজত্ব।

এই অসুবিধা ছিল ফরাসীদের ক্ষেত্রেও, এবং এই অসুবিধাই তাদের পরাজয়কে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল।

অথচ মার্কিনী প্রচার গেরিলাদের সাময়িক অপসারণকে তাদের পরাজয় বলে ব্যাখ্যা করে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একটা চিত্র তুলে ধরতে চায়।

একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে সায়গন থেকে ৫ মাইল উত্তরে বুডপ-এ গেরিলারা একটি মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের শিবির আক্রমণ করেছিল। একাশি মিলিমিটার মর্টার, ৫৭ মিলিমিটার রিকয়েললেস রাইফেল ও হাল্কা অস্ত্র নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছিল গেরিলারা। যে ছ'জন মার্কিন 'উপদেষ্টা' ও ২০০ জন ভিয়েৎনামী শিবিরে ছিল তাদের অধিকাংশই নিহত। বাকী সকলেই আহত, তাদের পরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শহরে। শিবির প্রায় খালি, এবং গেরিলারা চলে গিয়েছিল তাদের আক্রমণ সুসম্পন্ন করে। মার্কিনীরা এসে ওই

বিধ্বস্ত শিবিরের আশেপাশে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে তারপর ঘোষণা করেছিল, 'ভিয়েৎকং'দের প্রতিহত করা হয়েছে।

কিন্তু আপ বাক শুধু গেরিলা যুদ্ধের একটা কৌশলকেই প্রকাশ করেনি। আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফুটে উঠেছিল এর মধ্যে দিয়েঃ শত্রুর গতিবিধি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আগে থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহের বিস্ময়কর নিখুঁত ব্যবস্থা।

আপ বাকের জঙ্গলে গেরিলারা প্রথমে জড়ো হয়েছিল খুবই অল্প সংখ্যায়। এত অল্প যে প্রথম ধাক্কাতেই ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারত। কিন্তু তথ্য সংগ্রহের বন্দোবস্ত ওদের এত পাকা যে, সায়গনের উপায় ছিল না সবকিছু গোপন রেখে তারা কোন অভিযান চালায়।

সন্ধ্যে ৭টা নাগাদ মুক্তি ফ্রন্টের দপ্তরে খবর পৌঁছল সরকারী বাহিনী পরের দিন ভোরে জঙ্গল আক্রমণ করবে।

তৎপরতা শুরু হয়ে গেল গেরিলা শিবিরে। জঙ্গলে যারা জড়ো হয়েছিল তাদের মধ্যে 'নিয়মিত' গেরিলা সৈন্য কেউ ছিল না। একদল 'নিয়মিত' সৈন্য সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেল আপ বাকের দিকে। পাঠানো হল অস্ত্রশস্ত্র। রাত দুটোর মধ্যে আয়োজন সব সম্পূর্ণঃ তখন সবেমাত্র সরকারী সৈন্যরা একে একে আসতে শুরু করেছে। ভোর বেলা যখন তারা আক্রমণ শুরু করল, গেরিলারা তখন তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে প্রস্তুত।

আপ বাকের অভিযান ছিল সরকার পক্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান। এবং নিশ্চয়ই এর পরিকল্পনা অত্যন্ত চুপি চুপি করা হয়েছিল। অথচ ওই অভিযান আরম্ভের পুরো এগারো ঘণ্টা আগে তার খবর পৌঁছে গিয়েছিল গেরিলাদের কাছে। এ থেকেই বোঝা যাবে তাদের তথ্য আহরণের ব্যবস্থা কত নিখুঁত ও বিস্তৃত।

কোন 'ভিয়েৎকং' এলাকায় সরকারী বাহিনী প্রবেশ করা মাত্র গেরিলারা যেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে তা বুঝতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একটা ঢাকের আওয়াজ বেজে ওঠে। টানা, মৃদু, চাপা

আওয়াজ। সেই আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত, জঙ্গল থেকে জঙ্গলে। ঢাক বেজে ওঠে সামনে, পেছনে, চারদিকে। ওই ঢাকের বোল হচ্ছে গেরিলাদের কোড। সঙ্গে সঙ্গে ওরা সাবধান হয়ে যায়।

হাতে গোনা যায় এমন দুয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া সরকারী বাহিনী গেরিলাদের অজ্ঞাতে এবং তাদের চমকে দিয়ে কোন আক্রমণ চালাতে পারে নি। আর তার ফলে প্রকৃত আক্রমণ হবার আগেই ওই যুদ্ধ অর্ধেক জয় করে করে ফেলত তারা।

আর আক্রমণকারীরা যদি আসত আকাশপথে তা হলে তো কথাই নেই। বেশ কয়েক মাইল দূর থেকেই গেরিলারা টের পেয়ে যেত সেকথা। সময় পেত কয়েক মিনিট। কয়েক মিনিটও লাগত না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ওরা মিশে যেত জঙ্গলের পাতার মধ্যে, খড়ের গাদায় খড় হয়ে শুয়ে থাকত, ঢুকে পড়ত চাষীর ঘরে, কিংবা পুকুরে ও ধানের ক্ষেতে শরীর, মাথা সব ডুবিয়ে বসে থাকত, নিঃশ্বাস নিত বাঁশের নল দিয়ে। প্লেন আসত, কিন্তু ততক্ষণে সব ফাঁকা।

সেই রকম নিখুঁত ও বিস্ময়কর তাদের নিজেদের সংগঠন শক্তি। সমস্ত ব্যবস্থাটাই এমন চমৎকারভাবে গ্রথিত যে, যোগাযোগের সূত্র ছিন্ন হবার কোন উপায়ই ছিল না। ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায়, ঠিক ঝোপের আড়ালে ঠিক লোকটি ঠিক ঠিক উপস্থিত থাকবেই। কোন্ পথ দিয়ে গেরিলারা যাবে, কোন্ সরকারী রাস্তা কোন্ জায়গা দিয়ে তারা পার হবে, কোথায় কোন্ নদীর ওপর বাঁশের ব্রীজ বাঁধতে হবে, কোন্ খালে কত নৌকা রাখতে হবে, সব ঠিক করা থাকে আগে থেকে, সব তৈরী থাকে নির্ভুল অঙ্কের মতো।

এক-এক সময় গোলমাল হয়ে যায়। গেরিলাদের অভিযানের পথের খবর হয়ত পেয়ে যায় আমেরিকানরা। তৈরী হয় ওই পথ রোধ করবার জন্যে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গেরিলাদের কাছেও পৌঁছে

যায় সে-কথা। ওরা সাবধান হয়। অভিযান পরিত্যক্ত হয় সেদিনের মতো। কিংবা চলে অন্য দিক দিয়ে, অনেক ঘুর পথে।

যদি হঠাৎ চলার পথে কোন সরকারী বাহিনীর কাছাকাছি এসে পড়ে কখনো, ওরা সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে যায় বিভিন্ন দিকে। তারপর নানা দিক থেকে গুলি চালায় একসঙ্গে, যাতে মনে হয় একটা বিরাট গেরিলা ফৌজ অর্ধচন্দ্রের আকারে অপেক্ষা করছে সামনে, এগোলেই বিপদ। সরকারী বাহিনী থমকে দাঁড়ায়। পিছু হটে। এই সুযোগে গেরিলারা সরে পড়ে। কয়েকজন পেছনে থেকে যায় সরকারী বাহিনীর গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্যে।

অধিকাংশ সময় তা-ও দরকার হয় না। ক্যামোফ্লেজ বা আত্ম-গোপনের কৌশল এত নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করেছে গেরিলারা যে যদি সরকারী সৈন্য কয়েক গজ দূর দিয়েও হেঁটে যায় তাহলেও ঘুণাক্ষরেও কিছু বুঝতে পারবে না তারা।

এইরকম একটি ঘটনার কথা আমি শুনেছিলাম। একজন মার্কিন মেজরের নেতৃত্বে দু' কোম্পানী ভিয়েৎনামী সৈন্য এক জঙ্গলের পথ দিয়ে চলেছিল। তাদের সঙ্গে ১৫৫ মিলিমিটার একটি হাউইজার। ওই হাউইজার নিয়ে তারা যাচ্ছিল লং মি'তে। মেকং ব-দ্বীপ এলাকার একটি ছোট্ট জেলা-সহর লং মি। গেরিলারা চারদিক থেকে শহরটি ঘিরে ফেলেছে। যে-কোন মুহূর্তে দখল করে নিতে পারে। সরকারী বাহিনীর আশা, এই ভারী হাউইজার লং মিতে নিয়ে যেতে পারলে শহর রক্ষা করা অনেক সহজ হবে।

মাথার ওপরে একটি লিয়াসোঁ প্লেন উড়ে যাচ্ছে আগে আগে। নজর রাখছে চারদিকের জঙ্গলে কোথাও 'ভিয়েৎকং'রা লুকিয়ে আছে কিনা। সেই 'বিমান আচ্ছাদনের' নীচে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে ২১তম পদাতিক ডিভিসনের দু' কোম্পানী সৈন্য।

নাঃ, কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না, প্লেন থেকে ফরোয়ার্ড

কণ্ট্রোল জানালো গ্রাউণ্ড কণ্ট্রোলকে। রাস্তা পরিষ্কার। জঙ্গলে কোথাও কিছু নড়ছে না।

ধীরে ধীরে সরকারী কলাম একটা খালের ধারে এলো। খাল পেরিয়ে তাদের যেতে হবে।

"অবস্থা কি রকম?" গ্রাউণ্ড কণ্ট্রোল জানতে চাইল। "খাল পার হওয়া যাবে তো?"

খালের পার ধরে দু'দিকে অনেকখানি জায়গা ঘুরে দেখে এলো লিয়াসোঁ প্লেন। গাছের মাথা প্রায় ছুঁয়ে ধীরে ধীরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে এলো। কোথাও কিছু নেই।

এক জায়গায় দেখা গেল একটি ডিঙ্গি নৌকা ডুবে আছে। কি ব্যাপার? অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই এরা সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। কে জানে জলের নিচেই ওই নৌকার আড়ালে কোন ভিয়েৎকং লুকিয়ে আছে কি না।

জলের প্রায় কাছাকাছি নেমে এলো প্লেনটা। যদি কাছেপিঠে কোথাও গেরিলা থেকে থাকে তাহলে গুলি করে নিজেদের জানান দেবে এই আশায়।

কিন্তু সব নীরব, স্থির। নৌকাটা নেহাৎই ডুবে আছে। আশে-পাশে জীবনের চিহ্নমাত্র নেই।

"রাস্তা মনে হচ্ছে একেবারেই পরিষ্কার। তোমরা এগিয়ে যেতে পার।" ফরোয়ার্ড কণ্ট্রোল জানালো। তারপর···

ধীরে ধীরে ওপরে উঠছিল ও-১এফ লিয়াসোঁ প্লেন। হঠাৎ একটা গুলি লেগে তার বুক চেঁদা হয়ে গেল। আর একটা গুলি ককপিটের কাঁচের আবরণ চুরমার করে ঠিকরে পড়ল। তারপর আরো গুলি ককপিটের ভেতরে পড়তে লাগল।

"অ্যামবুশ!" দ্রুত ওপরে উঠতে উঠতে চেঁচিয়ে উঠল ফরোয়ার্ড কণ্ট্রোলের লোক। "আমরা আক্রান্ত। এর এগিয়ো না, যেখানে আছো সেখানেই থাকো।"

কিন্তু ততক্ষণে এগিয়ে গিয়েছিল সরকারী কলাম। পায়ে পায়ে খাল পার হয়ে চলছিল ওপারে, চলছিল গেরিলাদের বন্দুকের নলের মুখে দৃপ্ত পায়ে।

যে জঙ্গল ওপারে নুয়ে পড়েছিল জলের বুকে, তার আড়াল থেকে এক সঙ্গে গর্জন করে উঠল গেরিলাদের বন্দুক। একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে।

পট পট করে দেখতে দেখতে মরে পড়ে গেল যারা ছিল সামনে, শিকারীর গুলি খেয়ে যেমন হাঁস আছড়ে পড়ে জলের বুকে। ঠিক এমনিভাবে 'হাঁস' শিকার করেছিল গেরিলারা আপ বাকে।

যারা ছিল পেছনে তারা দৌড়ে পালাতে গেল পেছন দিক দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ পেছনের জঙ্গলেও। শান্ত, নিস্তব্ধ যে ঝোপ গুলিতে জীবনের চিহ্নমাত্র ছিল না কয়েক মিনিট আগেও সেগুলি এখন আগুনের হল্কা ছিটিয়ে দিতে লাগল অবিশ্রান্ত।

খালের দুই তীরের জঙ্গল গিজগিজ করছিল গেরিলায়। অথচ বোঝা যায়নি একটুও। বোঝার উপায় ছিল না।

আহত ও-১এফ যখন 'প্যাডি কণ্ট্রোল' 'প্যাডি কণ্ট্রোল' বলে অস্থিরভাবে উড়তে উড়তে চিৎকার করে ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিল, ততক্ষণে দু' কোম্পানী সৈন্য একেবারে খতম। গেরিলারা ওই ১০৫ মিলিমিটার হাউইজার এবং আর যা অস্ত্রশস্ত্র ছিল সব নিয়ে সরে পড়েছে।

গেরিলারা কি জাদু জানে?

কিন্তু ক্যামোফ্লেজই ওদের একমাত্র জাদু নয়। জাদু যেন ওদের প্রতিটি কাজে, পদক্ষেপে।

এক-এক সময় এমন হয়, সরকারী বাহিনী হয়ত কোন জঙ্গল ঘিরে ফেলেছে। প্রচণ্ড বোমা বর্ষিত হচ্ছে আকাশ থেকে। সেই সঙ্গে চারদিক থেকে চলেছে গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণ। জঙ্গল

লণ্ডভণ্ড। এ ভাবে কয়েক ঘণ্টা আক্রমণ চালাবার পর সৈন্যরা জঙ্গলের ভেতর ঢুকে দেখে জঙ্গল ফাঁকা। তাদের বেড়াজাল ভেদ করে কেউ বেরোতে পারেনি অথচ কেউ কোথাও নেই।

জাদু ছাড়া এ আর কী?

পরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা গেল জঙ্গল ভর্তি শেয়ালের গর্তের মতো গর্ত। অজস্র। প্রত্যেকটি গর্ত এক একটি সুড়ঙ্গের সঙ্গে যুক্ত। সেই সুড়ঙ্গ চলে গেছে জঙ্গলের সীমানা পেরিয়ে।

মার্কিনী আর ভিয়েৎনামীরা যখন বোমার ফুলঝুরি ফোটাচ্ছিল জঙ্গলে, গেরিলারা সেই ফাঁকে ওই সুড়ঙ্গ পথে চলে গেছে অনেক দূরে।

'জোন ডি'তে ঠিক এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমেরিকানদের।

সায়গনের মাইল চল্লিশেক উত্তরে সাড়ে চার হাজার বর্গমাইলের এক বিস্তীর্ণ জঙ্গল এলাকার নাম জোন ডি। প্লেনে মাত্র কয়েক মিনিটের দূরত্ব।

কুমারী জঙ্গল জোন ডি। মানুষ সমান উঁচু ঘাসের জঙ্গল। জলে সপসপে। কোন রাস্তা সেখান দিয়ে যায়নি। কেবল কয়েকটা ছোট নদী বয়ে গেছে এধার-ওধার। অন্ধকার নদী। ঘন গাছের চাঁদোয়ার নিচে অনেক গভীরে: সেই আচ্ছাদনে মাটি ঢাকা পড়েছে মাইলের পর মাইল। মাইলের পর মাইল কোন জীবনের চিহ্ন নেই। নেই কোন ঘরবাড়ি, যদিও জলে-ডোবা কিছু ধানের ক্ষেত আছে এধার-ওধার।

এই নির্জন, পরিত্যক্ত বনভূমিতে সরকারের পদক্ষেপ ঘটেনি বহু বছরের মধ্যে, যদিও জায়গাটা সায়গন থেকে দূরে নয়। ওরা জানত গেরিলাদের একটা প্রধান ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল ওই জঙ্গলে, তবুও ওরা ভয় পেত। রাস্তাঘাট চেনা ছিল না ওদের। তাছাড়া জায়গাটা ছিল বড় বেশি নির্জন।

আমেরিকানরা শুনে বলল, ভয়ের কিছুই নেই। রাস্তা নেই?'

আমরা আকাশ দিয়ে যাবো। গেরিলাদের এই জঙ্গলের ঘাঁটি দখল করতেই হবে। নইলে সায়গনকে নিরাপদ করা যাবে না।

এলো প্লেন। বাঘা বাঘা বোমারু বিমান। বি-৫২ এলো গুয়ামের ঘাঁটি থেকে কয়েক হাজার মাইল উড়ে। সঙ্গে এলো ভারী ভারী বোমা। পাঁচশ-টনী হাজার-টনী বোমা। ওই সব বোমা শিলাবৃষ্টির মতো ফেলা হল জোন ডি'তে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দিনের পর দিন। বোমার আঘাতে চষে গেল জোন ডির মাটি। ছিটিয়ে দিল রাসায়নিক, জঙ্গলের লতা-পাতা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। যেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল বনস্পতি সেখানে দাঁড়ানো বলতে আর কিছু রইল না। প্রচণ্ড, নিবিড় বোমাবর্ষণে ওরা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল সবকিছু। কোন মহাযুদ্ধেও বোধ হয় এত ব্যাপক ধ্বংসকার্য হয় না যা ওরা করেছিল জোন ডি'তে।

তারপর ওদের ছত্রী সৈন্য নেমেছিল আকাশ থেকে। দলে দলে। নেমেই ওরা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। এত প্রচণ্ড আক্রমণ, নিশ্চয়ই গেরিলা যারা ছিল সব মরে কিমা হয়ে গেছে ততক্ষণে।

কিন্তু কোথায় কি? জোন ডি যেমন নির্জন, পরিত্যক্ত ছিল তেমনিই রয়েছে। গেরিলারা একজনও সেখানে নেই। একটি মৃতদেহও পড়ে ছিল না ওদের জয়ের পুরস্কার হিসেবে। একটিও না।

বিস্মিত আমেরিকানরা পরে আবিষ্কার করেছিল জোন ডি'র মাটির নিচে বিছানো রয়েছে সুড়ঙ্গ পথের একটা বিরাট জাল।

মাইলের পর মাইল জুড়ে। একটার সঙ্গে আরেকটা যুক্ত। এবং সবগুলি সুড়ঙ্গ পথই চলে গেছে জোন ডি'র বাইরে।

এই রকম কয়েকটা সুড়ঙ্গে ঢুকেছিল আমেরিকানরা। এক জায়গায় কিছু চাল ওরা মজুত দেখতে পেয়েছিল। আর এক জায়গায় একটা ঘরের মতো দেখে মনে হয়েছিল হয়ত একটা হাসপাতাল ছিল এখানে।

তার বাইরে ওরা আর কিছুই খুঁজে পায় নি।

গেরিলাদের সঙ্গে পারবে কেন আমেরিকানরা?

গোলা ছুঁড়ে আলো জ্বালিয়ে নিজেদের পরিচয় দেয় না এরা। এরা পথ চলে কেরোসিনের কুপী জ্বেলে হাত দিয়ে আড়াল করে। কালো জামা আর প্যান্ট পরে রাতের সঙ্গে রাত হয়ে মিশে অপরিচিত হাঁটা-পথ ধরে যেখানে আমেরিকানদের জীপ কিংবা সাঁজোয়া গাড়ি কোনদিন ঢুকবে না। দিনে ওরা আর পাঁচজন মানুষের মতোই সাধারণ, রাত্রে ওরা অন্ধকারের থেকে অভিন্ন। পায়ে টায়ারের চটি, পিঠে ঝোলা, এদের যাত্রা সুড়ঙ্গ থেকে সুড়ঙ্গে, বাঙ্কার থেকে বাঙ্কারে, জঙ্গল থেকে জঙ্গলে, জ্যামিতির ফরমুলার মতো দ্ব্যর্থহীন, নির্ভুল।

ওদের রসদ আসে না আকাশ থেকে। ওদের খাবার থাকে গ্রামে আর গ্রামে, মাটির অন্তরালে, সুড়ঙ্গের মধ্যে, যেখানে থাকে ওদের অস্ত্রশস্ত্রও। ভাতের একটা বড় গোল্লা যাদের একদিনের আহার, রসদের জন্যে তাদের কিসের চিন্তা? এক-একটা অ্যামবুশের দ্বারা যখন প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র যে কোন সময় সংগ্রহ হতে পারে তখন অস্ত্রের জন্যে ভাবনাই বা কিসের? ঝোপের আড়ালে, সুড়ঙ্গের মধ্যে কিংবা খড়ের ছাউনীর নিচে যাদের অস্ত্রের কারখানা, সপ্তদশ সমান্তরালের উত্তরে বোমা ফেলে তাদের কি সায়েস্তা করা যায়? দেশের পাহাড়, মাটি, জঙ্গল যে দুর্গ রচনা করেছে, এবং দেশের মানুষ যে দুর্গের প্রহরী. ক'টা স্কাইরেডার আর বি-৫২ তার কী ক্ষতি করতে পারে? নিজে ধরা না দিলে যাদের ধরা যায় না, জঙ্গলে কান পাতলেও যাদের খোঁজ পাওয়া সম্ভব নয়, চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেও যাদের আলাদা করে চেনা মুস্কিল, পাঁচ লাখ সৈন্য যদি দশ লাখও করা হয় তাহলেই বা তাদের কি আসবে কিংবা যাবে?

কোন বাধা এদের গতি রোধ করতে পারে না। কোন

প্রতিরোধ এদের কাছে নয় দুরতিক্রম্য। এরা যখন খুশি এবং যেখানে খুশি যেতে বা আসতে পারে। ভূগোল এদের পক্ষে, তাই এরা ইচ্ছেমতো বেছে নিতে পারে আক্রমণের জায়গা। সময় এদের পক্ষে, তাই অপেক্ষা করার সুযোগ এদের আছে। ন্যায়, নীতি, আদর্শ এদের পক্ষে, তাই অপেক্ষা যতই দীর্ঘ হোক, সঙ্কল্পে ভাঁটা পড়ার কোন আশঙ্কা নেই।

যুদ্ধ এরা এইখানেই অর্ধেকের বেশী জয় করে ফেলেছে। বাকি যেটুকু, সেটুকু নিছক কৌশল, কঠিন পরিশ্রম, আর নিখুঁত দলবদ্ধ প্রয়াসের দ্বারা এরা সহজেই অর্জন করে নেয়।

এই কৌশল এবং প্রস্তুতি গেরিলাদের আজকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে যেখানে ওরা শুধু দুর্ভেদ্য নয়, অপ্রতিরোধ্য।

হঠাৎ কোন ঘাঁটি বা লক্ষ্যবস্তু আক্রমণ করে না গেরিলারা। যে ঘাঁটি ওদের লক্ষ্য, তার একটা অনুকৃতি বানিয়ে নেয় প্রথমে। তারপর দিনের পর দিন ওই অনুকৃতির ওপর চলে নকল আক্রমণ। যতক্ষণ না প্রত্যেকটি লোক নিজের ভূমিকাটুকু মুখস্থ করে নিচ্ছে ততক্ষণ ওই জায়গার জঙ্গলের চেহারা কেমন, রাস্তা-ঘাট কোন দিকে কী আছে, শহর ওখান থেকে কত দূরে, সবকিছু পরীক্ষা করা হয় তন্ন তন্ন করে। ক্রমে প্রতিটি গাছ, প্রতিটি ঝোঁপ ওদের চেনা হয়ে যায়।

নিয়মিত গেরিলারা যখন এইভাবে প্রস্তুত হ'তে থাকে, তখন গোয়েন্দা বিভাগ নজর রাখে সরকারী বাহিনীর গতিবিধির ওপর। ঘাঁটির ভেতরে কত সৈন্য ও কী ধরণের অস্ত্র রয়েছে, কখন ওরা সবচেয়ে বেশী অপ্রস্তুত থাকে, এই সমস্ত খবর ওরা এক এক করে সংগ্রহ করে।

এদিকে গ্রামবাসীরা, যারা মিলিশিয়া, নির্ধারিত জায়গায় মাটি কেটে লুকোতে থাকে খাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র। যাতে অস্ত্রশস্ত্রের

কোন ঘাটতি না হয়, কিংবা খাদ্যের অভাবে অভিযান প্রত্যাহার না করতে হয় মাঝপথে।

আক্রমণ যেদিন হবে সেদিন লক্ষ্যবস্তুর আশেপাশের সমস্ত পথের দু'পাশে আঞ্চলিক গেরিলা সৈন্যরা চোরাগোপ্তা আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হয়। যাতে বাইরে থেকে কোন সৈন্য সহজে আসতে না পারে।

নিয়মিত গেরিলারা জায়গা নেয় লক্ষ্যবস্তুর চারিদিকে। ট্রেঞ্চ আর শেয়ালের গর্ত খুঁড়ে সুরক্ষিত করে নিজেদের। অপেক্ষা করে রাত্রির। যদি সরকারী বাহিনী টহলে বেরোয় এর মধ্যে, বাধা দেয় না কোন।

শূন্য ঘন্টা যখন আসে, তখন কোন এক ঝোপের আড়াল থেকে ঢাকের কাঠি পড়ে পাঁচবার। আক্রমণের সঙ্কেত পেয়ে যায় সারা বনভূমি। মর্টার আর মেশিন গানের কয়েকটা গোলা এসে পড়ে ঘাঁটির ওপর। চকিত হয় ঘাঁটির লোকেরা। তৈরী হয় পাল্টা আক্রমণের জন্যে। কিন্তু ততক্ষণে গেরিলাদের একটা সুইসাইড স্কোয়াড পৌঁছে গেছে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে। লম্বা একটা বাঁশের ডগায় বিস্ফোরক বেঁধে মুখটা এগিয়ে দেয় বেড়ার নিচে। তারপর বাঁশের নলের ভেতর দিয়ে তাতে দেয় আগুন লাগিয়ে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বেড়া ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার।

"তিয়েন-লেন!" (এগোও!) বলে ওরা ঢুকে পড়ে ঘাঁটির এলাকার মধ্যে। টপকে পার হয়ে যায় দেয়াল। দলে দলে গুলিতে গুলিতে ব্যস্ত রাখে ভেতরের সৈন্যদের।

ততক্ষণে চারদিক থেকে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে নিয়মিত গেরিলারা। ফাঁস ক্রমশ ছোট হতে থাকে। তারপরে এক সময় ওরাও ঢুকে পড়ে ঘাঁটির মধ্যে। প্রতিরোধ যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেটুকু শেষ হয়ে যায় নিঃশেষে।

কাজ শেষ হয়ে যায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ, খাদ্যদ্রব্য, ওষুধপত্র যা কিছু থাকে সব নিয়ে যেমন সহজে এসেছিল তেমনি সহজেই আবার সরে পড়ে গেরিলারা। নিয়মিত গেরিলারা মিশে যায় জঙ্গলে। মিলিশিয়ারা ফিরে যায় তাদের বাড়িতে, রাত থাকতে থাকতেই। কেবল আঞ্চলিক গেরিলারা জায়গায় জায়গায় থেকে যায় চারিদিকে নজর রাখবার জন্যে।

তারপর তারাও চলে যায় জঙ্গলে।

পরে যখন উদ্ধারকারী দল আসে তখন কয়েকটি মৃতদেহ ছাড়া ঘাঁটিতে আর কিছু নেই।

এগারো

চার্লি ও সবুজ টুপী

এই হচ্ছে যুদ্ধ আমেরিকানরা যা জয় করতে চাইছে।

এবং কিভাবে? টহলে ওরা বেরোয় ঠিকই, কারণ ওটা তাদের নৈমিত্তিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। ওরা বলে 'ওয়াকস ইন দি সান', রৌদ্রে ভ্রমণ।

কখনো কখনো মাসের পর মাস কেটে যায়, ওরা শুধু ঘুরেই বেড়ায়। লক্ষ্যহীন। 'ভিয়েৎকং'দের ডাক নাম ওরা দিয়েছে চার্লি। চার্লির টিকিটিও দেখা যায় না কোথাও।

চার্লি বোধ হয় ভয় পেয়েছে, ওরা ভাবে। মাঝে মাঝে হঠাৎ কোন ছেঁড়াখোঁড়া লতায়-পাতায় পা আটকে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে মাইন ফাটে কিংবা বর্শা ছিটকে এসে বিঁধে যায় শরীরে। কখনো পা গেঁথে যায় 'পাঞ্জি'তে,—ছুচলো বাঁশের ফলায়। প্রায়ই ফাঁদ পাতা থাকে রাস্তায়। গভীর গর্ত। তার তলায় আটকানো থাকে পাঞ্জি। ওপরে ঘাস মাটি দিয়ে ক্যামোফ্লেজ করা। একবার পা পড়লে আর রক্ষা নেই।

চার্লি না থেকেও আছে, হাড়ে হাড়ে টের পায় ওরা। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। কারণ চার্লিকে পাওয়া যাবে না হাতের কাছে। ওরা শুধু গালাগাল দেয়, চার অক্ষরের অশ্রাব্য গালাগাল!

কেউ কেউ নিজেদের আস্তানার দেয়ালে লিখে রাখে ওই গালাগাল। বড় বড় অক্ষরে। যাতে ঘুম থেকে উঠে আর ঘুমোতে যাবার সময় চোখে পড়ে।

কেউ কেউ হাতে উল্কি আঁকিয়ে লিখে রাখে: 'সাত কং!' 'কং'দের হত্যা কর।

ওরা উত্তেজিত হয়। ভাবে, ওরা জয়লাভ করছে।

একের পর এক জেনারেলেরা এসেছেন আর গেছেন। ১৯৫৪ সালে জেনারেল জন ও'ডানিয়েল। তারপর জেনারেল স্যামুয়েল উইলিয়ামস। তারপর জেনারেল লায়নেল ম্যাকগার। তারপর জেনারেল পল হারকিন্‌স্‌। এবং তারপর জেনারেল উইলিয়াম ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড। সায়গনের অদূরে ওরা একটি দ্বিতীয় পেন্টাগন বানিয়েছে। সেইখানে বসে ওরা খবর পাঠায় ওয়াশিংটনে: আমরা যুদ্ধ জয় করছি, আরো সৈন্য পাঠাও।

এই দুটো কথার মধ্যে যে কোন সঙ্গতি নেই সে খেয়াল তাঁদের হয় না।

সঙ্গে দোহার আছে সি-আই-এ। রিপোর্ট দেয়, 'কং'দের প্রায় মেরে এনেছি। এখন যত পারো সৈন্য পাঠাও। ভিয়েৎনামীরা কী ভাববে না ভাববে তা দেখার কোন দরকার নেই।

"রাস্তার মোড় ঘুরে আমরা নিশ্চিতভাবে জয়ের দিকে চলেছি।" এ-কথা প্রাক্তন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব রবার্ট ম্যাকনামারার।

কিন্তু জয়যাত্রা এমনই ছিল যে তার পরেও সৈন্য পাঠাতে হয়েছে জলের মতো। ১৯৬৫ সালের শেষাশেষি ছ' ডিভিশন মার্কিন সৈন্য ছিল ভিয়েৎনামে। এখন সেখানে সোয়া পাঁচ লাখ সৈন্য গিজগিজ করছে।

ম্যাকনামারা যখন ওই কথা বলেছিলেন তখন ভিয়েৎনামে মার্কিনীদের ভূমিকা ছিল উপদেষ্টার। ভিয়েৎনামীরাই যুদ্ধ করত, মার্কিনীরা শুধু যুদ্ধ বিষয়ে পরামর্শ দিত তাদের। ১৯৬৫ সাল থেকে এই যুদ্ধ আমেরিকার নিজের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং এখন একমাত্র ব-দ্বীপ এলাকার কিছুটা ছাড়া দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আর সর্বত্র যুদ্ধ পুরোপুরি আমেরিকান সৈন্যরাই লড়ছে।

ওয়াশিংটন তারপরেও বলছে এই যুদ্ধ তারা জয় করছে।

১৯৬৫ সালেও যেখানে মার্কিন সৈন্যদের হতাহতের সংখ্যা ছিল নগণ্য, এখন সেখানে প্রতি সপ্তাহে ১,২০০ হতাহত হচ্ছে। তবু ওরা বলবে যুদ্ধের গতি তাদের অনুকূলে।

১৯৬৫ সালে যেখানে যুদ্ধের খরচ ছিল ১০ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার, ১৯৬৭ সালে তা দাঁড়াল ২ হাজার ২০০ কোটি ডলারে। তবু আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যুদ্ধ ওরা জয় করতে সক্ষম।

তান সন নুট বিমানঘাঁটির এক কোণায় বিরাট এক ফটো স্টুডিও আছে। ওরা বলে ল্যাবরেটরী। ওখানে যারা কাজ করে হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন ওরা কোন মহাকাশ গবেষণাগারের টেকনিসিয়ান। মাথায় সাদা টুপি, মুখে ফেটি বাঁধা। ওই ফটো ল্যাবে প্রতি মাসে অন্তত ৩০ লক্ষ ফুট ফিল্ম ডেভলাপ ও প্রিন্ট করা হয়। রেডারে, ইনফ্রা-রেড ক্যামেরায় তোলা এই সব ছবি, অন্ধকারেও যার চোখ চলে। ছবি তোলা হয় প্রত্যেক দিন। বিশেষ করে যে সব জায়গায় বোমা ফেলা হয় সেই সব জায়গার ছবি। মিলিয়ে দেখা হয়। যদি দেখা যায় যেখানে জঙ্গল থাকার কথা নয় সেখানে জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে, তাহলে ওরা ধরে নেয় এখানে গেরিলারা আস্তানা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে চলে আক্রমণ।

প্রত্যেক দিন শত শত প্লেন আকাশে ওড়ে বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে। হাজার হাজার টন বোমা নিক্ষিপ্ত হয় বর্ষার ধারার মতো। সেই সঙ্গে চলে গোলন্দাজ আক্রমণ। বোমার কার্পেট বিছিয়ে দেয় ওরা। তবু গেরিলারা যেখানে খুশি এবং যখন খুশি আক্রমণ করতে সক্ষম। তবু বিয়েন হোয়া, দানাং, তান সন নুট কোন ঘাঁটিই নিরাপদ নয়। এবং ১৯৬৮ সালের ভিয়েৎনামী নববর্ষের দিনে সারা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অন্তত গোটা চল্লিশের শহরে একযোগে আক্রমণ চালিয়ে গেরিলারা প্রমাণ করে দিয়েছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তাদের শক্তিই প্রধান।

যুদ্ধ তাহলে জয় করছে কে?

একটা হিসাব দেওয়া হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। মার্কিন কম্যাণ্ডেরই তৈরী করা হিসাব। ওই বছর প্রথম ন' মাসে মার্কিন সৈন্যরা ছোট ছোট ইউনিটে ২৫ লক্ষ বার টহল দিয়েছিল। মাত্র ১২ হাজার ক্ষেত্রে গুলি করেছিল টহলদার দল। তা-ও 'ভিয়েৎকং'দের খোঁজ পেয়ে নয়, না দেখতে পেয়ে। রাগের চোটে।

এমন খুব কমই হয় যখন আমেরিকানরা নিজেরা গেরিলাদের সন্ধান পেয়ে গুলি ছোঁড়ে। একশ'র মধ্যে ৯০টি ক্ষেত্রেই গুলি প্রথমে করে গেরিলারাই। আমেরিকানরা শুধু পাল্টা গুলি চালায়। তাও মাত্র কয়েকবার। তারপরেই ওরা নিরাপদ জায়গায় পিছু হটে যায় এবং বেতারে সাহায্য চায় বিমানের।

কাম্বোডিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি পার্বত্য অঞ্চলের প্লাই মে শিবিরের ১২ জন মার্কিন সবুজ টুপী অফিসার এবং ৭০০ ভিয়েৎনামী সৈন্য, আমি শুনেছিলাম, দু' মাসে মাত্র একজন 'ভিয়েৎকং'কে নিহত করেছিল।

কমসে-কম আঠারো-কুড়িটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ও গোটা পনেরো সী-প্লেন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের উপকূলে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে, যাতে 'ভিয়েৎকং'রা সাম্পানে করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সৈন্য ও রসদ পাঠাতে না পারে।

"কিন্তু আমরা খুব বেশি কিছু খুঁজে পাচ্ছি না," টহলদারীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারেরা নিজেরাই স্বীকার করেন। "হয় ভিয়েৎকংরা আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছে আর না হয় ওরা সেখানে নেই।"

অথচ মার্কিনী প্রচার বোঝাতে চায় গেরিলারা ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে আসছে।

সায়গন ইউ-এস-আই-এস-এর দোতালায় একটি ঘরে ম্যাপ আর চার্ট দেখিয়ে মার্কিন মুখপাত্ররা প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় পৃথিবীর কাছে তাদের সাফল্যের কাহিনী প্রচার করেন। কঠোর সরকারী নিয়মে তাঁদের বিজ্ঞপ্তির বাইরে কোন সাংবাদিক কিছু পাঠাতে

পারবেন না। পাঠাতে গেলেই তাঁকে ভিয়েৎনাম থেকে বহিষ্কৃত হবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এবং তাঁদের বিজ্ঞপ্তির ভাষা প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রায় একই রকম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা 'ভিয়েৎকংদের' হটিয়ে দেন, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা 'হাল্কা' আর 'ভিয়েৎকং'দের বেলায় 'ভারী'।

কিন্তু ওই হিসাব কিভাবে তৈরী হয়?

সাংবাদিকদের মনে সংশয় অনেকদিন ধরেই ছিল। খবর পাঠাতে না পারলেও ইউ-এস-আই-এসের প্রেস ব্রিফিং ছাড়া অন্য নানা সূত্রে খবর এসে পৌঁছত তাদের কাছে। ওই খবরের সঙ্গে মার্কিন বিজ্ঞপ্তির কোন মিল ছিল না।

আমি যখন সায়গনে ছিলাম, তখন এই অমিল রীতিমত একটা আলোচনার বিষয় ছিল। তার কয়েক মাস আগেই এই নিয়ে একটা তুমুল হৈচৈ হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা এত গুরুতর হয়ে উঠেছিল যে, সাংবাদিকরা পর্যন্ত প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের স্পষ্ট অভিযোগ ছিল যে, ভিয়েৎনামী সামরিক কর্তারা নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করবার জন্যে গেরিলাদের হতাহতের সংখ্যা অন্তত চার-পাঁচগুণ বাড়িয়ে এবং নিজেদের হতাহতের সংখ্যা চার-পাঁচ ভাগ কমিয়ে বলছে।

এই অভিযোগ অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি আমেরিকানদের পক্ষে। কারণ তার পরেই চালাও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, কেবল যে হত বা আহত চোখে দেখা ও হাতে গোনা যাবে কেবল তার ভিত্তিতেই হতাহতের সংখ্যা রচনা করা হবে।

কিন্তু যখন ১৯৬৫ সালের শেষের দিকে আমেরিকানরা নিজেরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হল তখন তাদের বিরুদ্ধেও প্রকাশ্যেই এই অভিযোগ করা হল যে, তারাও হিসাব অন্তত তিন-চারগুণ বাড়িয়ে দেখাচ্ছে।

তবু যদি আমরা ধরে নিই যে, আমেরিকানরা সত্যি কথাই বলেছে, হিসেব ভাঁড়াচ্ছে না, তাহলে আজকে 'ভিয়েৎকং' বলে

কিছু থাকার কথা নয়। কারণ আমেরিকানদের নিজেদের হিসেবেই ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত (১৯৬০ থেকে) দু'লক্ষ ভিয়েৎকং নিহত হয়েছে, এবং আমেরিকানরা প্রচার করছে যে, যুদ্ধের ঢেউ এখন তাদের অনুকূলে, ভিয়েৎনামের মানুষ এখন আর গেরিলাদের আশ্রয় দিতে রাজী নয়, দলে দলে তারা চলে আসছে 'সরকারী এলাকায়'। অথচ ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে ওই আমেরিকানদেরই হিসাবে বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ২ লক্ষ ৯৫ হাজার গেরিলা রয়েছে।

এর কোন ব্যাখ্যা মার্কিন মুখপাত্ররা দেননি। অথচ যেখানে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কোন বছরেই মার্কিন হিসেবে গেরিলাদের সংখ্যা দু'লক্ষের বেশী ছিল না, সেখানে এই নিয়ে যে-কোন সৎ মানুষের মনেই প্রশ্ন দেখা দিতে বাধ্য।

হয় আমেরিকানদের দু'লক্ষ গেরিলা নিহত করার দাবী মিথ্যা, অতিরঞ্জিত, আর না হয় সাধারণ মানুষের থেকে গেরিলাদের বিচ্ছিন্ন হবার কথা একেবারেই ভিত্তিহীন। দুটির যেটাই সত্যি হোক তা থেকে এই কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হবে যে, মার্কিন সামরিক তৎপরতা যুদ্ধের গতি বিন্দুমাত্র ফেরাতে পারেনি।

যেমন পারেনি গেরিলাদের বিরুদ্ধে তাদের অন্য আরেক লড়াই ঃ ভিয়েৎনামীদের 'শান্ত' করবার, তাদের মন জয় করে নেবার প্রোগ্রাম।

বারো

অপারেশন সানরাইজ!

তখনো ভোর হয়নি। অন্ধকার সবেমাত্র ফিকে হ'তে আরম্ভ করেছে। ঝিরঝিরে, ঠাণ্ডা বাতাসে ভেসে আসছে প্যাগোডার প্রথম ঘন্টার আওয়াজ। মিলিটারী ট্রাকের একটা দীর্ঘ সারি সায়গন থেকে রওনা হল বেন কাটের পথে।

সায়গনের উত্তরে ২৭ মাইল দূরে বেন কাট। আরও উত্তরে 'জোন ডি', গেরিলাদের অন্যতম বৃহৎ ঘাঁটি। ট্রাকের কনভয় যখন ধুলোর ঝড় তুলে বেন কাটে গিয়ে থামল, তখন টোকা মাথায় লাঙল কাঁধে চাষীরা তৈরী হচ্ছে মাঠে যাবার জন্যে।

একগাদা ভিয়েৎনামী সৈন্য নেমে পড়ল ট্রাক থেকে। তারপর ছড়িয়ে গেল চারদিকে। চড়াও হল বাড়িতে বাড়িতে। চলল এলোপাথাড়ি গ্রেপ্তার। যেখানে যাকে পারল ধরে নিয়ে এসে জড়ো করল এক জায়গায়।

"তোমরা আজ থেকে আর এখানে থাকবে না," বিস্মিত, সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীদের জানানো হল। "তোমাদের জন্যে নতুন গ্রাম তৈরী হয়েছে বেন টুয়ং-এ, এখন থেকে সেখানেই তোমরা থাকবে।"

"সে কি! আমাদের বাড়িঘরের কী হবে?" কেউ কেউ প্রতিবাদ জানাবার ক্ষীণ চেষ্টা করল।

"আমাদের চাষের জমি যে এখানে। বেন টুয়ং-এ গেলে আমরা চাষ করব কী করে? খাবো কী?"

কিছু ভাবনা নেই, ভারপ্রাপ্ত অফিসার জানালেন ওদের। এক্ষুনি সকলকে ২৫ ডলার করে নগদ দেওয়া হবে। এছাড়া আগামী তিন মাস সামলে নেবার জন্যে চাল ও শুকনো মাছের

একটা নির্দিষ্ট রেশন প্রত্যেক দিন বিলি করা হবে। ঘর বাড়ি সরকারই বানিয়ে দেবেন, এবং সরকারই একখণ্ড করে জমি দেবেন চাষাবাদের জন্যে।

তা সত্ত্বেও ওরা যেতে চায় নি নিজে থেকে। যে গ্রামে ওরা বংশ-পরম্পরায় বাস করে এসেছে, যে গ্রামের প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে তাদের অন্তরের যোগ, তাদের সমাজ, তাদের জীবন, তাদের হাসি-কান্না যে গ্রামকে ঘিরে আবর্তিত, সেই গ্রামের সঙ্গে নাড়ীর সংযোগ কি ছেঁড়ো বললেই ছেঁড়া যায়?

তবু যেতে ওদের হয়েছিল। কারণ সৈন্যদের বন্দুকের নল ছিল তাদের দিকে তাক করা। যারা বাধা দেবে, এক গুলিতে তাদের দেহ সেইখানেই লুটিয়ে পড়বে মাটিতে।

যেমন ধুলো উড়িয়ে এসেছিল তেমনি ধুলো উড়িয়ে কনভয় ফিরে গিয়েছিল আবার। কিন্তু উন্মূলীত মানুষের সেই বোঝা যখন নামিয়ে দেওয়া হল বেন টুয়ং-এ, তখন দেখা গেল যারা এসেছে তারা হয় ছেলে না হয় বুড়ো। সতেরো থেকে চল্লিশের মধ্যে যাদের বয়স জিয়েমের বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে তারা পালিয়ে গিয়েছিল জঙ্গলে।

সরকার তাদের চিহ্নিত করল গেরিলা বলে।

একটা পুরো গ্রামাঞ্চলকে ছিন্নমূল করার এই যে অভিযান, তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন সানরাইজ।' এবং এই অভিযানের মধ্যে দিয়ে স্বরু হয়েছিল গেরিলাদের বিরুদ্ধে সায়গনের অন্য আর-এক লড়াই। গ্রামাঞ্চলকে 'শান্ত' করার লড়াই। প্যাসি-ফিকেশনের প্রোগ্রাম।

সায়গনের মার্কিন মহলকে আমি প্রায়ই বলতে শুনেছি এই প্রোগ্রাম হল একটি আশ্চর্য হাতিয়ার। ভিয়েৎকংদের যদি অস্ত্র দিয়ে পরাজয় করা না যায় তো এই প্রোগ্রাম দিয়ে যাবেই।

পরিকল্পনাটা অবশ্য বৃটিশের কাছ থেকে ধার করা। এই রকম প্রোগ্রামের দ্বারা বৃটিশ মালয়ের জঙ্গলে কম্যুনিস্ট বিদ্রোহীদের কোণঠাসা করে ফেলেছিল। সুতরাং ভিয়েৎনামেও এতে কাজ হবে, এ-ই ছিল ধারণা। মার্কিন উপদেষ্টারা ভেবেছিলেন, যদি গ্রামের লোককে তুলে এনে কতকগুলি নির্দিষ্ট সুরক্ষিত জায়গায় বসানো যায় তাহলে গেরিলারা আর তাদের সাহায্য পাবে না, এবং এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমে তারা রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হবে।

সুতরাং আর কোন কথা নেই। গ্রামের পর গ্রাম ভেঙে চলল স্ট্র্যাটিজিক হ্যামলেট বা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বসতি এলাকা স্থাপনের পালা। বিশেষ করে মেকং ব-দ্বীপ এলাকায় উৎসাহী প্রদেশ শাসকেরা বুলডোজার চালিয়ে রাতারাতি নতুন নতুন স্ট্র্যাটিজিক হ্যামলেটের পত্তন করতে লাগলেন। আমি সায়গনে থাকার সময় গেরিলাদের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতার বাইরে এটাই ছিল সবচেয়ে প্রধান আলোচ্য বিষয়।

এমনি একটি স্ট্র্যাটিজিক হ্যামলেট আমি দেখতে গিয়েছিলাম কিয়েন হোয়া প্রদেশে।

কিয়েন হোয়ার প্রদেশ-শাসক ছিলেন কর্নেল ট্রান-নক চাও। শোনা যায়, ১৯৬০ সালে একদিন তিনি সোজা প্রেসিডেন্ট জিয়েমের সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন: "আমাদের সৈন্যদের সামাজিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা দরকার। তাদের শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। সাধারণ মানুষের জন্যে তাদের কোন দরদ নেই। চাল থেকে আরম্ভ করে মেয়ে পর্যন্ত এরা হাতের কাছে যা পায় তা-ই চুরি করে। এদের জন্যেই লোকেরা ভিয়েৎকং হয়ে যাচ্ছে।"

জিয়েম নাকি এই তরুণ কর্নেলের কথা শুনে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে কিয়েন হোয়া প্রদেশের মুখ্য প্রশাসক করে পাঠান।

ট্রান-নক চাও নাকি কিয়েন হোয়ায় অসাধ্য সাধন করেছেন। পাঁচ বছর আগে কিয়েন হোয়ার দু'লক্ষ লোকের মধ্যে শতকরা ৮৫ জনই যেখানে ছিল সরকারের বিপক্ষে, আজ সেখানে 'ভিয়েৎকং'দের প্রভাব যদি থেকে থাকে তাহলে নাকি বড় জোর লাখ খানেক লোকের ওপর।

কিয়েন হোয়ার রাজধানী ট্রুক ইয়াংয়ে তাঁর অফিসের কনফারেন্স হলে একটার পর একটা ম্যাপ দেখিয়ে কর্নেল চাও বলছিলেন: এই পট পরিবর্তনের একটা বড় কারণ হল স্ট্র্যাটিজিক হ্যামলেট।

বিন নুয়েন হ্যামলেটে আমার গাড়ি যেখানে থামলো সেটা আমাদের দেশের রেলের কোয়ার্টারের মতো খুপরি ধরণের একটা বাড়ি।

ওটাই হ্যামলেটের অফিস। তারই পাশে হ্যামলেটে ঢোকবার একমাত্র গেট। গাছের গুঁড়ি কোনাকুনিভাবে গেঁথে তৈরী। তার ওপর কাঁটাতারের একটা জাল আটকানো। দু'জন সৈন্য পাহারায় রয়েছে দু'দিকে।

গেট থেকে একটা কাঁচা রাস্তা সোজা চলে গেছে কিছুটা দূর পর্যন্ত। তারই দু'পাশে সারি সারি কুঁড়ে ঘর। দরমার বেড়া, পাতার ছাউনি। একেবারে গায়ে গায়ে লাগানো। ভিত বলতে কিছুই নেই। সামনে একফালি করে জমি। কঞ্চির বেড়া দেওয়া। ন্যাড়া মাটিতে কয়েকটা সবুজের গুচ্ছ উঁকি দিচ্ছে কোথাও। কোথাও তা-ও না। কোথাও বা খুঁটির সঙ্গে গোরু বাঁধা।

বেশ বোঝা যায় বিন নুয়েনের এই জায়গাটা আগে জঙ্গল ছিল। মাঝে মাঝে কাটা গাছের গুঁড়িতে তার চিহ্ন রয়েছে। আশেপাশে জঙ্গল যদিও অনেক কেটে ফেলা হয়েছে তবু গাছপালা বেশ ঘন।

যদি বেতিয়ার উদ্বাস্তু শিবিরকে একটা জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে ফেলা যায় তাহলে যেরকম দেখতে হয় অনেকটা সেইরকম।

গেটের দু'পাশ থেকে শক্ত কাঁটাতারের বেড়া চলে গিয়েছে ওই কুঁড়েগুলিকে ঘিরে। বাইরে থেকে কোন লোক যাতে সহজে ভেতরে ঢুকতে না পারে তার জন্যে এই ব্যবস্থা। হ্যামলেটের যারা বাসিন্দা তাদেরও পারমিট দেখিয়ে বাইরে যেতে ও ভেতরে ঢুকতে হয়।

আমি যখন ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম বাড়িগুলি, সকাল তখন অনেকখানি গড়িয়ে গেছে। কিন্তু প্রাণের সাড়া ছিল না কোথাও। কুঁড়েগুলিতে কেবল একটা দরজাই ছিল, জানালা বলতে কিছু ছিল না। তাই ঘরের মধ্যেটা ছিল অন্ধকার। সেই অন্ধকার খুপড়ির মধ্যে খালি মাটিতে চাটাই বিছিয়ে কেউ শুয়ে ছিল, কেউ বসে। ছেলেমেয়েরাও যেন দরজার বাইরে আসতে ভয় পায়। দু'তিনটি চায়ের দোকান দেখেছিলাম, কয়েকজন বসে চা-ও খাচ্ছিল। কিন্তু চায়ের দোকানে আড্ডা বলতে যা বোঝায় তার কিছুই ছিল না।

যেন একটা বন্দী শিবিরের মধ্যে দিয়ে আমি পথ হাঁটছিলাম। কে এলো বা কে গেল সে-সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই কারো।

হ্যামলেটের অফিস হচ্ছে এই বন্দী শিবিরের কন্ট্রোল রুম। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা ওই জায়গাটার মধ্যে যে লোকগুলো থাকে তাদের প্রত্যেকের নাম অফিসের খাতায় লেখা আছে। কোন পরিবারে কতজন লোক, তারা আগে কোথায় ছিল, সেই এলাকা 'ভিয়েৎকং' প্রভাবিত কিনা, তখন কিভাবে চলত, এখন কিভাবে চলে, কার ক'টি ছেলেমেয়ে, ক'জন স্কুলে যায়, কোন্ স্কুলে কে যায়, ইত্যাদি আরো অনেক খুঁটিনাটি তথ্য।

ম্যাপ আর চার্টের ছড়াছড়ি অফিসের দেয়ালে। তার একটাতে দেখা গেল প্রত্যেকটি কুঁড়েঘরের অবস্থান নিখুঁত আঁকা রয়েছে।

ওরা বলে, বাইরের কোন লোক এসে যে হ্যামলেটে ঢুকে

লুকিয়ে থাকবে তার উপায় নেই। গোনা-গুণতি লোক। বাড়তি হলে তা চোখে পড়বেই।

প্রত্যেক পনেরো-কুড়ি দিন পরে হ্যামলেটের প্রত্যেকটি পরিবারকে একজন করে প্রতিনিধি পাঠাতে হয় অফিসে। সেখানে গোপনে, একটা বন্ধ ঘরে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাদের ইণ্টারভিউ নেওয়া হয়। কেবল তিনটি প্রশ্ন করা হয় ইণ্টারভিউয়ে:

এক, আপনার কি কোন সমস্যা আছে?

দুই, হ্যামলেটের কারো সম্পর্কে আপনার কি কোন অভিযোগ আছে?

তিন, এমন কারো কথা কি জানেন যার কাজকর্মে হ্যামলেটের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হ'তে পারে?

এই প্রশ্নের কী জবাব দেয় লোকেরা তা আমি জানতে পারি নি। তবে এটুকু জেনেছিলাম যে, পনেরো দিন পর পর অফিসের বন্ধ ঘরে তাদের হাজিরা দিতেই হবে। যদি কেউ না আসে তাহলে জেরার ঠেলায় বাড়ির লোককে অস্থির হ'তে হবে। কেন আসেনি, কোথায় ছিল তখন, কী করছিল ইত্যাদি নানা রকম প্রশ্ন। যদি ঠিক ঠিক জবাব দিতে না পারে তাহলেই তার নাম ব্ল্যাকবোর্ডে উঠে যাবে।

সামনে রাস্তার এক জায়গায় ওই ব্ল্যাকবোর্ড টাঙানো। তাতে সুন্দর ভাবে ধরে ধরে লেখা একটা বিরাট নামের তালিকা আটকানো রয়েছে। হ্যামলেটের লোকেদের মধ্যে যাদের আত্মীয় স্বজন 'ভিয়েৎকং' এলাকায় আছে কিংবা 'ভিয়েৎকং' বলে জানা গেছে তাদের নাম আছে ওই তালিকায়। জনসাধারণকে বলা হয়েছে তারা যেন এই লোকগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকে।

এ-রকম প্রায়ই হ'ত, আমি শুনেছিলাম, যখন কেউ কাজ করতে বাইরে গিয়ে আর ফিরে আসত না। কাঁটাতার টপকে রাত্রের অন্ধকারে পালিয়ে যেত কেউ কেউ জঙ্গলের মধ্যে।

এই সব ছোটখাটো বিদ্রোহের কারণ অনুমান করতে আমার কোন অসুবিধা হয় নি সেদিন বিন মুয়েন হ্যামলেটে ঘুরতে ঘুরতে। গ্রীষ্মের রোদ্দুর চড়চড়িয়ে উঠেছিল। ওই উত্তপ্ত, নিষ্কম্প মুহূর্তে আমার সামনে বিস্তৃত কুঁড়েঘরগুলিকে মনে হয়েছিল আরো অকরুণ। একটা গাছকে যদি শিকড় উপড়ে তারপর ফাঁকা মাঠে কোন কিছুতে ভর দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় তাহলে যেমন হয়, এ-ও ছিল তেমনি। এটা গ্রাম নয়, গ্রামের বিদ্রূপ। ওরা বলে বিন মুয়েন একটা নিউ লাইফ হ্যামলেট। কিন্তু নিউ তো দূরের কথা, কোন লাইফ আমি সেখানে দেখতে পাই নি। শুকনো মাটিতে কতগুলি ঘর আর তার ভিতরে কতগুলো মানুষ মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল শুধু। এরা উন্মূলীত, নিজের জমি থেকে, সমাজ থেকে, নিজের পরিবেশের মধ্যে নিজের মতো থাকার যে প্রশান্ত স্বাচ্ছন্দ্য সেই স্বাচ্ছন্দ্য থেকে, স্নেহ-ভালোবাসা-মায়া-মমতার নিবিড় বন্ধন থেকে। কাঁটাতারের মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসা জন্ম নিতে পারে না। বন্দী শিবিরের আবহাওয়ার মধ্যে পরিবার শিকড় মেলতে পারে না। বঞ্চিত নিরানন্দ অভাবগ্রস্ত জীবনে প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি সঞ্চারিত হ'তে পারে না।

বঞ্চিত বইকি। যে দৈনিক দাক্ষিণ্যের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের নিয়ে আসা হয়েছিল, সেই দাক্ষিণ্যটুকুও পৌঁছত না ঠিক মতো ও সময় মতো। অনেক সময় একেবারেই পৌঁছত না। মাঝপথেই পাচার হয়ে যেত। চাষ-বাসের জন্যে যে সার তাদের দেবার কথা তা সোজা চলে যেত কালো বাজারে। এমনকি যে কাঠ ওরা কেটে আনতো জ্বালানী হিসেবে, দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীরা তা-ও বাজেয়াপ্ত করত, তারপর ওই কাঠ নিজেরা বাজারে বিক্রি করে টাকাটা পুরতো পকেটে। অথচ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার কোন উপায় নেই, কারণ তাহলেই তারা হয়ে যাবে

'ভিয়েৎকং' এবং তখন বন্দুকের নল উদ্যত হবে তাদের প্রতিবাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেবার জন্যে।

এ এক অসহ্য, অবরুদ্ধ জীবন।

এই ইতিহাস শুধু বিন নুয়েনে নয়, এই ইতিহাস আজ সর্বত্র। কর্নেল চাও যখন বলছিলেন তাঁর প্রদেশে ইতিমধ্যেই ৮৩টি স্ট্র্যাটিজিক হ্যামলেট স্থাপিত হয়েছে, শীগ্‌গিরই আরো হবে, এবং সায়গনে মার্কিন কর্তারা যখন জানাচ্ছিলেন যে, সারা দেশে ৪৫টি প্যাসিফিকেশন ক্যাম্প ইতিমধ্যেই খোলা হয়েছে, আরো হবে, ক্রমে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ২,১৮১টি গ্রামের প্রত্যেকটিকেই নতুন করে গড়ে তোলা হবে, তখন আমার মনে হচ্ছিল এক বিরাট ধ্বংসকার্যে এরা লিপ্ত হয়েছে যা হাজার হাজার টন বোমার আঘাতের চাইতেও মারাত্মক। যে গ্রাম ভিয়েৎনামের মানুষের জীবনের প্রায় সবটা জুড়ে রয়েছে, সেই গ্রামকে ওরা ধ্বংস করতে উদ্যত। সারা দেশকে ওরা একটা বৃহৎ বন্দী শিবিরে পরিণত করতে চায় যেখানে বন্দুকের নল আর সঙ্গীনের ফলা মানুষের কাজ, মানুষের অবসর, মানুষের চিন্তা, মানুষের সমস্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে।

একটি মূক ট্র্যাজিডির স্মৃতি বহন করে আমি সেদিন বিন নুয়েন থেকে ফিরে এসেছিলাম।

কিন্তু শুধুই কি মূক? আমি একাধিক স্ট্র্যাটিজিক হ্যামলেটের কথা শুনেছিলাম যেখানে গ্রামবাসীরা গুলিকে ভয় করেনি, প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছিল। শিবির ভেঙে-চুরে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। ফিরে যেতে পারেনি তাদের আগের গ্রামে। সে-গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল সায়গনের বাহিনী। ওরা গিয়েছিল জঙ্গলে, 'ভিয়েৎকং'দের কাছে।

কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে ফেললেই দেশ নিরাপদ হবে এই কথার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। গেরিলারা ইচ্ছা করলেই যে-কোন

হ্যামলেটে অবাধে ঢুকতে পারত একথা আমি যাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনিই স্বীকার করেছেন। কাগজে-কলমে ব্যবস্থা যতই নিখুঁত হোক, সরকার পক্ষের সেকথা জানবার কোন উপায় নেই। কারণ যারা ভস্মীভূত সংসারের স্মৃতি নিয়ে হ্যামলেটে এসে দেখল কাঁটাতারের নাগপাশে তারা আবদ্ধ, তাদের কাছে গেরিলারা মুক্তির দূত, নিপীড়িতের বন্ধু। তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার কথা তারা চিন্তাও করতে পারে না।

এবং কোন স্ট্র্যাটিজিক হ্যামলেট বিচ্ছিন্নভাবে নিরাপদ নয়। নিরাপত্তা নির্ভর করছে আশেপাশের ঘাঁটি সরকারের দখলে আছে কিনা তার ওপর। এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই যখন ঘাঁটি রক্ষা করতে না পেরে সরকার পক্ষ নিজেরাই স্ট্র্যাটিজিক হ্যামলেট-গুলি ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেছে। মানুষগুলি দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু হয়েছে। জঙ্গল ছাড়া তখন আর কোথায় তাদের যাবার জায়গা থাকে? 'ভিয়েৎকং' ছাড়া আর কাদের ওপর তারা নির্ভর করতে পারে?

তারা নিজেরাই তখন 'ভিয়েৎকং' হয়ে যায়।

ভিয়েৎকং? কারা ভিয়েৎকং? অত্যাচারিত মানুষ যদি প্রতিবাদ জানাতে চায়, সরকারের দৃষ্টিতে তারাই ভিয়েৎকং। অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গেলেই তাকে 'ভিয়েৎকং' বলে চিহ্নিত হবে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আজ তা-ই ঘটেছে। স্বাধিকারের জন্যে যারা লড়াই করছে তারা তো বটেই, নিজের ছোট্ট সুখ, ছোট্ট সংসার, ছোট্ট পৃথিবীটুকু যারা আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় সরকারের চোখে তারাও আজ ভিয়েৎকং। কোন একদিন ভোরে উঠে তারা দেখতে পাবে তাদের ঘরে আগুন জ্বলছে, তাদের সম্বল লুণ্ঠিত, বন্দুকের নলের পাহারায় ট্রাক বোঝাই করে তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দূরান্তের কোন বন্দী শিবিরে।

ধীরে ধীরে একটা জাতি তার কক্ষ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে, একটা সভ্যতা তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে।

সেদিন বিন নুয়েনে আমি ভিয়েৎনামের বন্দী দশা দেখেছিলাম। দেখেছিলাম কি অসহায় যন্ত্রণায় লোকগুলি স্তব্ধ হয়ে আছে। সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, এটা 'অপারেশন সানরাইজ' নয়, অপারেশন সানসেট: নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে একদল উন্মত্ত চক্রান্তকারী একটা দেশের ভাগ্যে সূর্যাস্ত রচনা করতে চাইছে।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে আমাদের ক্যারিবু কিয়েন হোয়া প্রদেশের নদী-মাঠ-বন পেরিয়ে ছুটে চলেছিল সায়গনের দিকে। দূরে. অনেক দূরে মেকং একটা সরু ফিতের মতো দেখাচ্ছিল। ক্যারিবুর খোলা পেছন দিয়ে সেই দিকে তাকিয়েছিলাম। নিচে ধান-কাটা ক্ষেত আর নারকেলের জঙ্গলগুলো মিলে কেমন একটা স্বপ্নময় আবেশ রচনা করে রেখেছিল। সেই আবেশে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে আমি ভুলে গিয়েছিলাম কাঁটাতার আর উদ্যত মেশিনগানের স্মৃতি, হেলিকপ্টারের ওঠা-নামার বিকট চিৎকার, রাস্তায় রাস্তায় সশস্ত্র পাহারাদারের আনাগোনার ছবি।

চমক ভাঙলো আমার সঙ্গী একজনের আঙুলের মৃদু চাপে। তাকিয়ে দেখি কখন অজান্তে আরেকটি প্লেন আমাদের প্লেনের পাশে এসে গেছে এবং সমানে তাড়াতাড়া কাগজের টুকরো ছড়িয়ে চলেছে।

শুনলাম ওই কাগজের টুকরোগুলো হচ্ছে সায়গন সরকারের নতুন 'বোমা', সাই (সাইকোলজিক্যাল) ওয়ারের হ্যাণ্ডবিল।

হাওয়ার তোড়ে বুলেটের মতোই খানিক দূর ছুটে গিয়ে সেগুলি হেলে-দুলে ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে। তারপর ভাসতে ভাসতে নামছিল নিচের দিকে।

সায়গনের আশা, গ্রামের লোকেরা এই হ্যাণ্ডবিলগুলি পড়বে,

পড়ে বুঝতে পারবে 'ভিয়েৎকংরা' কি সাংঘাতিক বস্তু, এবং বুঝে দলে দলে চলে আসবে সরকারের দিকে। সরকার দু'হাত তুলে তাদের স্বাগত জানাবে।

এই আশা নিয়েই প্রত্যেক দিন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার হ্যাণ্ডবিল ছড়ানো হচ্ছে। তাতে লেখা থাকে: "সাবধান! ওখানে ভিয়েৎকং আছে, শীগ্‌গির বেরিয়ে আসুন!"

সেই সঙ্গে আরো অনেক কিছু লেখা থাকে: 'ভিয়েৎকংদের' অত্যাচারের নমুনা, সরকারের বদান্যতার প্রতিশ্রুতি, এবং আশ্বাস।

শুনে আমার প্রচণ্ড হাসি পেয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি অবাক হয়েছিলাম ওদের কপটতার বহর দেখে। একটা দেশের ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে বদান্যতা? একটা জাতির যন্ত্রণার বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি? একটি সুন্দর সভ্যতার সঙ্গে ব্যভিচার করার পর আশ্বাস?

তেরো

তোমার পাপ, আমার পাপ

হঠাৎ যেন দুলে উঠল সব কিছু। মাথার ভেতরটা তালগোল পাকিয়ে ঘুরতে লাগল, ঝাপসা হয়ে এলো চোখের দৃষ্টি, একটা প্রবল যন্ত্রণা কেবলই ঠেলে ঠেলে ওপরের দিকে উঠে আসতে চাইছে।

সেই সঙ্গে বমি। সমস্ত শরীর ঘুলিয়ে উঠছে, যেন পাকে পাকে এক্ষুনি বেরিয়ে আসবে।

এই সবেমাত্র তারা রাতের খাবার শেষ করেছে। খাবার বলতে একটুখানি সাদা ভাত আর একটা তরকারী। এ তারা রোজই খেয়ে আসছে। কিন্তু আর কখনো তো এরকম হয়নি। আর আজ মাত্র দুয়েক গ্রাস মুখে তুলেছে অমনি যেন ভেতরটা জ্বলে গেল একেবারে।

দেখতে দেখতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল অনেকে। বলি দেবার পর পাঁঠা যেমন অসহায়ের মতো ছটফট করতে থাকে, তেমনিভাবে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে গড়াতে লাগল তারা। মুখ কুঁচকে বীভৎস হয়ে উঠেছে। চোখ বিস্ফারিত। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে তারা প্রাণপণ চেষ্টা করছে চীৎকার করবার জন্যে। কিন্তু একটা ভয়ার্ত গোঙানি ছাড়া আর কিছুই বেরোচ্ছে না তাদের গলা থেকে। চাপ চাপ গোঙানি। যেন চাপ চাপ রক্ত।

তারপর হঠাৎই এক সময় থেমে গেল সব। গোঙানি, ছটফটানি। কেউ সিলিংয়ের দিকে হাত তুলে, কেউ মাটিতে মুখ গুঁজে, কেউ কুঁকড়ে দুমড়ে, কেউ হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে, কেউ বুকের নিচে হাত রেখে গলাটা উঁচু ক'রে স্থির হয়ে রইল।

একটা আতঙ্কিত চীৎকারে ভরে গেল সারাটা ঘর। যেন কোন অশরীরী-আত্মা তাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে এমনিভাবে এলোপাথাড়ি ছুটতে লাগল তারা। কিন্তু কোথায় পথ, পালাবার? অন্ধকার ঘর, চারদিকে অন্ধ দেওয়াল, সংখ্যাহীন মানুষ শুধু নিরুপায় অস্থিরতায় গিজগিজ করছে। গায়ে গায়ে ধাক্কা লেগে ওরা আরো আঁতকে উঠল শুধু।

সঙ্গে সঙ্গে যেন দুলে উঠল তাদেরও শরীর। এতে আরো ভয় পেয়ে গেল তারা। যন্ত্রণা! সমস্ত শরীর অসহ্য যন্ত্রণায় ঝিমঝিম ক'রে উঠল। মাথা ঘুরতে লাগল, বিকৃত হ'ল মুখ। গোঙাতে গোঙাতে একই ভাবে আছড়ে পড়ল আরো অনেকে। একই ভাবে হাত-পা ছুঁড়ল কিছুক্ষণ। তারপর একই ভাবে স্থির হয়ে গেল তারাও।

"বাচাও! আমাদের বাঁচাও!"

একটা প্রবল চীৎকার উঠে গেল সিলিংয়ের দিকে, তারপর মাথা ঘুরে হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পড়ে খান খান হয়ে গেল। গুমরে গুমরে, অন্ধকারে পথ খুঁজতে খুঁজতে ঐ আওয়াজ এক থেকে শত থেকে সহস্র হয়ে কেবলই মরীয়া আর্তনাদ ক'রে বলতে লাগল "আমরা মরে যাচ্ছি! ওগো, তোমরা আমাদের বাঁচাও!"

পাগলের মতো ওরা ছুটে গেল দরজার দিকে। আছড়ে পড়ল পাল্লার গায়ে। মাথা কুটতে লাগল। ধাক্কা দিতে লাগল অস্থির, নিরুপায় হাত দিয়ে। খামচাতে লাগল ভারী কাঠের গা। আর সেই সঙ্গে ভয়ার্ত চীৎকার। "আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি, কে কোথায় আছ আমাদের বাঁচাও!"

কিন্তু দরজা খুলল না। ভারী পাল্লার গায়ে বাইরে থেকে লাগানো ছিল তালা। সে তালা খুলবার জন্যে এগিয়ে এল না কেউ।

যেন মনে হ'ল অন্ধকার কেঁদে উঠল। দরজার দুটো পাল্লার মাঝখানে একটুখানি যে ফাঁক সৃষ্টি হয়েছিল ওদের টানাটানিতে, তার

মধ্যে মুখ চেপে ধরে বিস্ফারিত চোখ নিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল ওরা। সেখানে অন্ধকার। একটানা, নিরন্ধ্র অন্ধকার। আর কিছু চোখে পড়ল না তাদের। কিন্তু তারা শুনল, স্পষ্ট শুনতে পেল, ঐ অন্ধকারের স্রোত বেয়ে চারদিক থেকে আরো করুণ আর্তনাদ ভেসে আসছেঃ বাঁচাও! দয়া ক'রে আমাদের বাঁচাও!"

তবে কি তাদের মতো একই রকম বিপদ অন্যদেরও?

আতঙ্কে শিউরে উঠে ওরা ছিটকে পড়ল দরজা থেকে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল হতভম্ব হয়ে, যেন কোনো হরিণ আটকা পড়েছে চারদিকের শিকারীদের ব্যূহের মধ্যে। কিন্তু পথ একটা খুঁজে বার করতেই হবে। নইলে এই অন্ধকূপের মধ্যে মৃত্যু ছাড়া তাদের আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। নিশ্চিত, নিরুপায় মৃত্যু।

আর কোনোদিকে না তাকিয়ে তারা সোজা উঠে গেল দেয়াল বেয়ে কড়িকাঠের দিকে।

ঘরের দেয়াল যদিও ছিল পাকা কিন্তু ছাদটা ছিল খোলার। কড়িকাঠ ধরে ঝুলতে ঝুলতে এখন ওরা ঐ খোলার গায়ে মেরে চলল লাথির পর লাথি। ঐ ছাদই এখন তাদের একমাত্র ভরসা। ঐ ছাদ যদি না ভাঙা যায় তাহলে এই মৃত্যুর গহ্বর থেকে উদ্ধার পাবার আর কোনো আশা নেই। এবং ছাদ ওরা ভেঙেছিল। দেয়ালের কার্নিসের কাছ থেকে হুড় হুড় করে ভেঙে পড়েছিল খোলার টুকরোগুলি। আর বাইরে অন্ধকার আকাশে হঠাৎ কয়েকটা তারা ঝলমল করে উঠল।

মুক্তি! অবশেষে মুক্তি তাদের করায়ত্ত। শেষ পর্যন্ত বেরোবার একটা পথ পাওয়া গেছে! আর তাদের নিরুপায় যন্ত্রণায় ছটফট করে মরতে হবে না!

একটা কাতর উল্লাসের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল বিভ্রান্ত মানুষগুলি। ছাদের ঐ একটুখানি ফাঁক দিয়ে তারা এক

সঙ্গে ঠেলে বেরোতে চাইল। কোনোমতে মাথাটা একটু বার করে চেঁচিয়ে উঠল: "কে কোথায় আছ, আমাদের তোমরা বাঁচাও!"

"বাঁচাও!"

"আমরা মরে যাচ্ছি, আমরা মরে যাচ্ছি, আমাদের রক্ষা কর!"

"তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না কেউ? দয়া করে আমাদের উদ্ধার কর!"

হঠাৎ তাদের আর্তনাদ ডুবে গেল গুলির শব্দে। চারদিক থেকে অনেকগুলি রাইফেল একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। ওরা সাহায্য চেয়েছিল, মুক্তি চেয়েছিল। ওদের কান্নার জবাব এলো কঠিন, তীক্ষ্ণ বুলেটের আঘাতে।

গার্ড পোষ্টের মাথায় আলোগুলো জ্বলে উঠল একে একে। তাদের দীর্ঘ আলোর শুঁড়গুলি নড়ে চড়ে খুঁজতে লাগল অন্ধকারের শরীর। সেই আলোয়, শিকারী যেমন করে হাঁস শিকার করে ঝিলে, ওরা এক এক করে হত্যা করল লোকগুলিকে। এক এক করে ওরা দিশেহারার মতন উঠে আসছিল, আর এক এক করে গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়ে যাচ্ছিল নিচে।

এক সময় আর কোনো মুখ উঁকি দেবার জন্যে উঠে এলো না ঐ ফাঁক দিয়ে। এক সময় আর্তনাদও স্তিমিত হয়ে এলো ঐ বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে। একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছিল শুধু। যারা তখনও মরেনি অথচ যারা শীগগিরই মরবে তাদের গোঙানির আওয়াজ।

বাইরে উঠোনে তখন মৃতদেহের স্তূপ জমে উঠেছে। চারদিকের গার্ডপোষ্ট থেকে গুলির আওয়াজ আসছে সমানে। এবং আশেপাশের সমস্ত বন্ধ কুটীর থেকে মরীয়া চীৎকার আসছে: "বাঁচাও!" "বাঁচাও!"

পরের দিন সকালে যখন খুলে দেওয়া হল বন্ধ দরজাগুলি, তখন অনেকেরই উঠে দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। তবু তারা আনন্দে চীৎকার

করতে করতে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। ভেবেছিল এতক্ষণে বুঝি সত্যি সত্যিই মুক্তি এসেছে।

কিন্তু তারা জানতো না এটা মৃত্যুরই একটা ছলনা। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা ছোট্ট উঠোনটুকুর মধ্যে তারা যখন অস্থির হয়ে ঘুরছিল আর ঘুরছিল, তখন আবার ছুটে এসেছিল গুলি। মেশিনগানের গুলি। দিনের আলোয় তাদের আত্মগোপনের উপায় ছিল না। এবং গুলি আসছিল চারিদিক থেকে।

রক্তে লাল হয়ে গেল উঠোন। মৃতদেহে ঢেকে গেল মাটি। তার ওপর ফুলে উঠল আরও অসংখ্য মৃতদেহ। তারই মধ্যে যারা পারল তারা টলতে টলতে আবার কোনোরকমে ফিরে গেল ঘরে। যারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে অথচ মরল না, তাদের মাথায় ভাঙলো রাইফেলের কুঁদো।

তারপর এক এক করে, মৃতদেহগুলি কুড়িয়ে নিয়ে জড়ো করা হল একটা ঘরে। শেষে অন্যান্য সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে নিয়ে আসা হল যারা মারা যাবার আগে ধুঁকছিল। তাদের সকলকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল মৃতদেহের গাদায়। তারপর দরজা বন্ধ করে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল।

বিকেলের দিকে এলো ট্রাক, এবং আরো সৈন্য। কড়া পাহারার মধ্যে যখন ঐ ভস্মস্তূপ বোঝাই করা হচ্ছিল, তখন আশেপাশের সমস্ত ঘরে দরজা দেওয়া ছিল। দরজার বাইরে ছিল সশস্ত্র সান্ত্রী।

ঘরের ভেতর থেকে তারা শুধু শুনতে পেল এক একটা গর্জন হাঁসফাঁস করতে করতে বেরিয়ে গেল। তারা তখন জানত না, কিন্তু পরে জেনেছিল, ঐসব ট্রাকের গহ্বরে সেদিন অন্তত এক হাজার সহ-বন্দীর অবশেষ বাহিত হয়েছিল তাদের শিবির থেকে।

এই ঘটনা ঘটে ছিল ১৯৫৮ সালের ১ ও ২ ডিসেম্বর। দক্ষিণ

ভিয়েৎনামে। ফু লোই'র বন্দী শিবিরে। সায়গনের শাসনতক্তে তখন নো দিন জিয়েম। কুখ্যাত, কলঙ্কিত জিয়েম!

এখন যে প্রদেশের নাম বিন ডুয়ং, তখন তারই নাম ছিল থু-দাউ-মত। সেই প্রদেশে, সায়গন থেকে তেত্রিশ কিলোমিটার উত্তরে, সায়গন নদী আর তেরো নম্বর জাতীয় সড়কের মাঝামাঝি জায়গায় ছিল ফু লোই'র বন্দী শিবির। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল একটা পরিত্যক্ত ব্যারাক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন জাপানীরা ভিয়েৎনাম দখল করে নিয়েছিল তখন তারা বানিয়েছিল। জিয়েমই এটাকে সারিয়ে-টারিয়ে একটা জেলখানা শিবিরে পরিণত করেছিলেন। কারণ জেলখানার দরকার তাঁর বেড়ে যাচ্ছিল সমানে। হাজার হাজার লোক গ্রেপ্তার হচ্ছিল সারা দেশে। "জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক" এই অজুহাতে। কমিউনিস্ট, এই অভিযোগে।

এই এক অজুহাত ছিল জিয়েমের। "যতদিন না আইন ও শৃঙ্খলা পুরোপুরি পুনরুদ্ধার হচ্ছে", ১৯৫৬ সালের ১ জানুয়ারী এক অর্ডিন্যান্স জারী করে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "ততদিন কোনো ব্যক্তি যদি জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বলে গণ্য হন তাহলে প্রেসিডেণ্টের ডিগ্রী অনুসারে ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রস্তাব অনুযায়ী, তাঁকে আটক কিংবা অন্তরীণ কিংবা নির্বাসিত করা যাবে, কিংবা পুলিশের তত্ত্বাবধানে রাখা যাবে।"

এই অজুহাতকে ব্যবহার করে জিয়েম এক সন্ত্রাসের রাজত্বের পত্তন করেছিলেন দেশে। প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের কোন কণ্ঠ বিন্দুমাত্র উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা নির্মমভাবে দমন করা হত। কখনো গ্রেপ্তার করে, কখনো পীড়নে অত্যাচারে, কখনো বা স্রেফ হত্যা করে।

সুতরাং দেশের সর্বত্র অসংখ্য বন্দী শিবির গজিয়ে উঠল। নিন তুয়ান, কোয়াং নাম, কোয়াং ত্রি আর ফু ইয়েনে। কারণ যদিও প্রদেশে প্রদেশে, এবং প্রদেশের মধ্যে আবার জেলায় জেলায় একটা ব্যাপক

জেলখানার জাল ইতিমধ্যেই ছিল, এবং যদিও পুলো কোঁদোর আর ফু কুয়ক নামে তুটো পুরো দ্বীপই ছিল কয়েদীদের নির্বাসনে পাঠাবার জন্যে, তাতে কুলোচ্ছিল না জিয়েমের।

ফু লোই ছিল এই সব বন্দী শিবিরগুলির মধ্যে কুখ্যাততম। অন্যতম বৃহৎও বটে।

জিয়েম অবশ্য বন্দী শিবির বলতেন না, বলতেন 'রাজনৈতিক পুনর্শিক্ষা কেন্দ্র।' এই সব শিবিরের যারা ছিল বাসিন্দা তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করে জিয়েমের প্রতি অনুগত করাই ছিল নাকি উদ্দেশ্য।

আসলে কিন্তু এগুলি নিছক বন্দী শিবিরও ছিল না। ছিল মৃত্যু শিবির। সারা দেশ থেকে ধরে এনে যাদের রাখা হ'ত এখানে, তাদের ওপর চলত অকথ্য, অমানুষিক অত্যাচার।

মাটিতে ছোট ছোট গর্ত করে তার মধ্যে এক একজন বন্দীকে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ত হয়তো। গর্ত এমন ভাবে করা হ'ত যাতে বন্দীকে বসতেই হ'ত পিঠ বেঁকিয়ে, মাথা সামনের দিকে নামিয়ে। গর্তের মুখটা আটকে দেওয়া হ'ত কাঁটাতার দিয়ে, যাতে উঠতে না পারে। ঐভাবে তাকে ফেলে রাখা হ'ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, রোদ্দুরে কিংবা বৃষ্টিতে, যতক্ষণ না সে সহ্যের একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে চেতনা হারিয়ে ফেলত।

কিংবা গরমে লাল লোহার শিক সোজা ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ত বন্দীর গলা দিয়ে।

নয়তো একটা কাটারি দিয়ে গা থেকে মাংস কেটে নেওয়া হ'ত টুকরো টুকরো; কান, ঠোঁট, জিব কেটে ফেলা হ'ত; গলা আর পেট চিরে খুলে ফেলা হ'ত; পেট্রোলে ভিজিয়ে কাপড়ের টুকরো আঙুলে জড়িয়ে দিয়ে ধরিয়ে দেওয়া হ'ত আগুন।

পিন বিঁধিয়ে দেওয়া হ'ত, নখের নিচে, কিংবা চোখের মণিতে।

ফুটন্ত গরম জল ঢেলে দেওয়া হ'ত শরীরের ওপর।

কিংবা পা দুটো বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ত, মাথাটা ডুবিয়ে দেওয়া হ'ত খড় ভর্তি একটা গামলায়, আর বুকের পাঁজড়ে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে আঘাত করা হ'ত সজোরে।

মেয়েদের স্তন কেটে নেওয়া হ'ত, কিংবা জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ত পেট্রোল মাখিয়ে। রাইফেলের কুঁদোর আঘাতে একটু একটু করে কাঠের টুকরো ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ত তাদের গোপন অঙ্গে, নয়তো ইলেকট্রিকের তার ঢুকিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ত সুইচ।

অজস্র পেরেক বেঁধানো কোনো লম্বা কাঠ বিছিয়ে দেওয়া হ'ত মাটিতে। ছুঁচলো মুখগুলি বেরিয়ে থাকত। তার ওপর দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করা হ'ত বন্দীদের।

এই অত্যাচার শেষ পর্যন্ত সহ্য করার ক্ষমতা কারো ছিল না, থাকতে পারে না। অনেকেই মারা যেত। যারা তা সত্ত্বেও যেত না তাদের মেরে ফেলা হ'ত। কখনো গুলি করে, কখনো বিষ খাইয়ে।

যেমন হয়েছিল ফু লোই'য়ে। ফু লোই'র ছ' হাজার বন্দীর মধ্যে যে এক হাজার বন্দী মারা গিয়েছিল ১৯৫৮ সালের ১ ও ২ ডিসেম্বর, তাদের খাবারে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল জিয়েমের নির্দেশে।

বাকী পাঁচ হাজার বন্দীর ভাগ্যেও হয়তো একই পরিণতি অপেক্ষা করছিল, কিন্তু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল লোকের জানাজানিতে। ফু লোইয়ের গণহত্যার কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল লোকমুখে। সেদিন রাত্রের গুলির আওয়াজ আর অসহায় বন্দীদের আকুল কান্না শুনতে পেয়েছিল আশেপাশের গ্রামের লোকেরা। তারা ভিড় করে এসেছিল বারো ফুট উঁচু দেয়াল কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা শিবিরের চারপাশে। ঢুকতে চেষ্টা করেছিল ভেতরে। কিন্তু পারেনি। পারেনি কারণ, মেশিনগানের গুলি ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের দিকে। ভয়ে সরে গিয়েছিল ওরা, এবং মুখে মুখে নিয়ে গিয়েছিল এই বীভৎসতার কাহিনী।

কয়েকদিন পর। আরো অনেকগুলি ট্রাক এসেছিল ফু লোই'র শিবিরে। ঐ পাঁচ হাজার বন্দীকে ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া

হয়েছিল অন্যত্র। কোথায় কে জানে। আরো কিছুদিন পর হাজার হাজার সৈন্য এসে ছড়িয়ে পড়েছিল ফু লোই এলাকায়। নিরীহ মানুষগুলির ওপরে চলেছিল অত্যাচার, নিপীড়ন। তাদের প্রতিবাদের জবাব হিসেবে। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল শত শত লোককে। তারপর তাদেরও কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আজ পর্যন্ত তা কেউ বলতে পারে না।

ঐ 'অপারেশন' যখন চলছিল তখন দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন সামরিক সাহায্য উপদেষ্টা গ্রুপের অধিকর্তা জেনারেল এস. উইলিয়ামস উপস্থিত ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৪ সালের জুলাইয়ে জেনিভার চুক্তির মারফৎ ভিয়েৎনাম দ্বিধা বিভক্ত হবার পর থেকেই আমেরিকার প্রত্যক্ষ উস্কানিতে বাও দাই—জিয়েম চক্র দেশের দক্ষিণাংশকে কুক্ষিগত করার জন্যে তৎপর হয়। এই তৎপরতার প্রধান হাতিয়ারই হ'ল জনসাধারণের ওপর বেপরোয়া অত্যাচার আর নিপীড়ন। বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ সহ্য করতে পারত না জিয়েম-মার্কিন ষড়যন্ত্রকারীরা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের যে কোনো দাবীকে তারা দেশদ্রোহিতা বলে গণ্য করত। যুক্তির যে-কোনো কণ্ঠকে তারা মনে করত প্রচ্ছন্ন কমিউনিজম। অধিকারের যে কোনো কথাবার্তাকেই তারা মনে করত অসহ্য ঔদ্ধত্য। সাধারণ মানুষকে তাঁবে রাখবার একটি কৌশলের কথাই তাদের জানা ছিল। তা হ'ল: শক্তির দাপট, গুলি, বেয়োনেট।

কোয়াং নাম প্রদেশে চো ভুয়কের কয়েকজন চাষী ক্ষতিপূরণ চাইতে এসেছিল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে। কারণ জিয়েমের সৈন্যরা তাদের জমির সমস্ত গাছপালা তাদের অনুমতি না নিয়েই কেটে সাবাড় করেছে। স্থানীয় কর্তারা এর উত্তরে তাদের ওপর গুলি চালাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ওরা এতটা বুঝতে পারেনি। ওরা নিহত হয়েছিল দলে দলে। শিশুরা। অন্তঃসত্ত্বা মহিলারা।

আহতদের নিয়ে বিভ্রান্ত মানুষগুলি গিয়েছিল কাছেই একটি সামরিক ঘাঁটিতে। চিকিৎসার আশায়। ঐ ঘাঁটিতে ব্যবস্থা ছিল চিকিৎসার। কিন্তু ওরা তার বদলে আবার দিয়েছিল রাইফেলের গুলি।

একটি নদী ছিল সামনে। তার ওপারে আশেপাশের গ্রামের লোকেরা এসে জড়ো হয়েছিল গুলির আওয়াজ শুনে। ওরা আর কিছুই করেনি, কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল এ পারের অকারণ নরহত্যা। কিন্তু সেটুকুও সহ্য করতে পারেনি হত্যাকারীরা। তারা মেশিনগানের গুলিতে তাদের ঐ কৌতূহল মিটিয়ে দিয়েছিল।

আহতদের কুড়িয়ে নিয়ে তারা যখন ছত্রভঙ্গ হচ্ছিল, সেই মুহূর্তে এলো একটি প্লেন। পলায়মান জনতার ওপর কয়েকটা হাত বোমা আর অজস্র প্রচারপত্র ছিটিয়ে দিল। প্রচারপত্রে লেখা ছিল, জনতার এই অবাধ্যতার দরুণ তাদের আরো ব্যাপক শাস্তি দেওয়া হবে।

দু'দিন পরে হা লামের ঘাঁটি থেকে দু'টি জঙ্গী আর একটি স্পটার প্লেন এসে চো দুয়ক এলাকার চারদিকে কিছুক্ষণ ঘুরল। তারপর একটি একটি করে বাড়ি লক্ষ্য করে বৃষ্টির ধারার মতো ছিটিয়ে দিল গুলি।

নুয়েন ভান দুয়া, এক তরুণ কৃষক জেন ট্রে প্রদেশের কান তান গ্রামে তার মাঠে চারা ধান রুইছিল। এমন সময় এসেছিল জিয়েমের সৈন্যরা তাকে জোর করে শ্রমিক হিসেবে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে।

বাধা দিয়েছিল দুয়া। সে প্রতিরোধের শক্তি কতটুকু। সৈন্যরা তাকে গ্রেপ্তার করল, তারপর মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলল।

আশেপাশে মাঠে আর যারা কাজ করছিল, তারা ছুটে এসেছিল দুয়ার চিৎকার শুনে। জবাব চেয়েছিল সৈন্যদের এই আচরণের। জবাব দিয়েছিল সৈন্যরা, বুলেটের আঘাতে। কিন্তু তবু যখন ছত্রভঙ্গ

হতে চায়নি তারা, এবং তবুও যখন আরো লোকজন ছুটে আসছিল চারদিক থেকে, তখন সৈন্যরা হঠাৎ দুঃখিত হবার ভান করল। কারণ তারা ছিল সংখ্যায় অল্প, আর চাষীরা ক্রমেই মরীয়া হয়ে উঠছিল।

তারা জানালো, তুয়াকে তারা চিকিৎসার জন্যে মো কে'তে নিয়ে যেতে রাজী আছে। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারেনি লোকেরা। তারা সঙ্গে যেতে চাইল। সৈন্যরা তাতেও আপত্তি করল না।

একটি স্ট্রেচারে তুয়াকে শুইয়ে দুজন সৈন্য বয়ে নিয়ে চলল। পেছন পেছন চলল জনতা। পথে যোগ দিল আরো অনেকে।

তারা সবেমাত্র মো কে'র কাছাকাছি এসেছে, এমন সময় তিনটি ট্রাক এলো মো কে'র দিক থেকে। তিনটি ট্রাক বোঝাই সৈন্য। কোন কথা নেই, সতর্ক করা তো দূরের কথা, সৈন্যরা জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণ সমানে গুলি করার পর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল বেয়োনেট নিয়ে। বিভ্রান্ত জনতা ছত্রভঙ্গ হবার সময় পেল না।

যারা নিহত হয়েছিল তারা পড়ে রইল সেখানেই। যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের পেটাতে পেটাতে তোলা হল ট্রাকে। যারা গুরুতর রকমে আহত হয়েছিল—আক্ষরিক অর্থে শত শত—তাদের কোমরে ভারী ভারী পাথর বেঁধে ফেলে দেওয়া হল চো চিয়েন নদীর জলে।

ঘটনাগুলি ঘটেছিল ১৯৫৪ সালে।

১৯৫৫ সালের ৮ই জুলাই বিন-এর ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার হুয়ং দিয়েন-এ তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ পাঠালেন তান লাপ হ্যামলেটে যত লোক আছে তাদের সকলকে হত্যা করতে হবে। কারণ তারা নাকি সকলেই কমিউনিস্ট।

সাইত্রিশজন নরনারীর জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল তাঁর মুখের এক কথাতে।

পরের দিন তান হিয়েন হ্যামলেটের যত প্রাপ্তবয়স্ক লোক ছিল

তাদেরও সকলকে তিনি আনালেন তান লাপে। এবং তাদেরও সকলকে হত্যা করে তাড়াতাড়ি কবর দেওয়া হল বা রে নামে একটা ছোট্ট নদীর পাশে।

কয়েকদিন পরে প্রায় পনেরো জন মহিলা—তাদের মধ্যে পাঁচজন অন্তঃসত্ত্বা—হুয়ং দিয়েন ঘাঁটিতে এলো তাদের স্বামীদের বিষয় খোঁজ করতে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা গেল।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ দশজন সশস্ত্র সৈন্য মহিলাদের হাঁটিয়ে নিয়ে গেল আ চে নামে একটা নদীর ধারে। সেখানে এক এক করে তাদের ওপর বলাৎকার করল সকলে। তারপর তাদের শরীর বেয়োনেটের খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত করে গলা কেটে দু ভাগ করে সেখানেই ফেলে রেখে চলে গেল।

দুদিন পরে সৈন্যরা তান হিয়েপে ফিরে গিয়ে গোটা গ্রামখানি পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

যে কজন তখনো বেঁচেছিল সেখানে—তিনজন বয়স্ক পুরুষ ও পাঁচজন শিশু—তাদের বুকে বেয়োনেট বিঁধিয়ে হত্যা করা হ'ল।

এ সবই করা হ'ল কমিউনিজম ঠেকাবার নাম করে।

এবং কমিউনিজম ঠেকাবার নাম করেই তারা হিংস্র পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ত্রাণ তি নাম-এর ওপর।

কোয়াং নাম প্রদেশের দিয়েন বান জেলার ফু মি গ্রামের মেয়ে ছিল ত্রাণ। অল্প বয়েস। ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের লড়াইয়ের সময় গ্রামের ছেলেমেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল তার ওপর। এই ছিল তার অপরাধ।

সেই 'অপরাধে' জিয়েমের লোকেরা একদিন এসে চড়াও হ'ল তার বাড়িতে, তাকে নিয়ে গেল গ্রেপ্তার করে। কোনো বিচার নয়, বিচারের প্রহসনও নয়, কি লামের বন্দীশালায় তিন মাস তাকে আটকে রাখা হ'ল। তিন মাস ধরে তার ওপর চলল দলবদ্ধ অত্যাচার।

তিন মাস পর হঠাৎ কি খেয়াল হতে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই আবার গ্রেপ্তার করেছিল। মাসাধিক কাল আটকে রাখার পর দ্বিতীয়বারের মতো ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তাকে।

কিন্তু তৃতীয়বারের জন্যে গ্রেপ্তার হয়েছিল ত্রাণ। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে। এবং তৃতীয় দফায় তার ওপর চলেছিল জিয়েমের পশুদের বিকৃত প্রতিহিংসার অত্যাচার। ছুরি দিয়ে কিংবা গরমে লাল হয়ে যাওয়া চিমটে দিয়ে তার গায়ের মাংস ওরা ছিঁড়ে নিয়েছিল অসংখ্য জায়গায়। লোহাব হুক বিঁধিয়ে দিয়ে তার পায়ের মাংসে তাকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল কড়িকাঠ থেকে ; তারপর সমানে চলেছিল ঘুষি, লাথি, রাইফেলের কুঁদোর আঘাত। মাটিতে শুইয়ে হাত আর পা চেপে ধরে রেখেছিল কঠিন বুটের চাপে, আরেকজন বুটের আঘাতে ঠুকে ঠুকে একটা লাঠি ঢুকিয়ে দিয়েছিল তার গোপন অঙ্গে।

যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে চীৎকার করত ত্রান। ওরা অট্ট হেসে পালা করে লাথি মেরে যেত লাঠির ডগায়।

কখনো একটা 'জীবন্ত' বিদ্যুতের তার নিয়ে এসে লাগিয়ে দিত সেখানে। কখনো সেই তার আটকে দিত তার স্তনের বোঁটায়।

একবার দুজন মার্কিন সামরিক উপদেষ্টার নির্দেশে ও উপস্থিতিতে একটি জ্বলন্ত লোহা চেপে ধরা হয়েছিল তার যোনিদেশে। তারপর ঐ উপদেষ্টাদেরই নির্দেশে একটি হিংস্র কুকুর ছেড়ে দেওয়া হয়েছি তার ঘরে।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চলেছিল এই অত্যাচার। শেষের দিকে ত্রান যন্ত্রণায় অচেতন হয়ে পড়ে থাকত সাবাক্ষণ, এবং ক্রমে এমন অবস্থা হল যে তার বাঁচবার আর বিশেষ কোনো আশাই রইল না।

এই দেখে জেলের কর্তৃপক্ষ ত্রানকে পাঠিয়ে দিল তার মায়ের কাছে। জেলের ভেতরে মরলে জিয়েমের সুদক্ষ প্রশাসনের বদনাম

হবে যে। সুতরাং যদি মরতে হয় তো নিজের বাড়িতেই মরুক। তাতে তাদের কোনো দায়িত্ব থাকবে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরেনি ত্রান। কোনোরকমে বেঁচে গিয়েছিল স্থানীয় লোকেদের সেবায়, যদিও এই 'অঘটনে' সে নিজেই অবাক হয়েছিল সবচেয়ে বেশি।

এবং বেঁচে ওঠার পর আর সে থাকতে চায়নি জিয়েমের স্বর্গরাজ্যে। সে পালিয়ে গিয়েছিল সপ্তদশ সমান্তরালের উত্তরে। সেখান থেকে সে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে লিখে জানিয়েছিল তার ওপর জিয়েমের পুলিশের বর্বরতার কাহিনী।

কমিউনিস্ট দমনের নামে বর্বর অত্যাচারের যে অভিযান সুরু হয়েছিল জিয়েমের আমলে, আজ মার্কিনীদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে তা শতগুণ বৃদ্ধি পেয়ে একটা গণহত্যার রূপ নিয়েছে।

ভিয়েৎকংদের সঙ্গে লড়াইয়ে তাদের শোচনীয় ব্যর্থতার প্রতিশোধ তারা নিচ্ছে একটি দেশকে বিধ্বস্ত ও একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে। বছরের পর বছর ক্রমশ আরো সৈন্য ওরা পাঠিয়েছে ভিয়েৎনামে, আরো মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করেছে, কিন্তু তবু ভিয়েৎনামের মুক্তিসেনাদের তারা পর্যুদস্ত করতে পারেনি।

পারেনি, তার প্রথম কারণ গেরিলারা কোনো কেতাবী লড়াই লড়ছে না, যে লড়াই লড়তে আমেরিকানরা অভ্যস্ত। দ্বিতীয় কারণ গেরিলারা ভিয়েৎনামের সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা নয়; তাদের আলাদা করে চিনে নিয়ে খতম করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং গায়ের জ্বালা মেটাবার জন্যে তারা ভিয়েৎনামের বনাঞ্চল জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, তার জনপদগুলিকে ছারখার করে, তার মানুষগুলিকে নির্বিচারে হত্যা করে দেশকে 'শত্রু' মুক্ত করার জন্যে উদ্যত হয়েছে।

হত্যা আর ধ্বংসের এত সুপরিকল্পিত ও ইচ্ছাকৃত ইতিহাস পৃথিবীতে আগে আর কখনো লিখিত হয়নি। সমস্ত দুনিয়ার

চোখের সামনে পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিশালী দেশ একটি ক্ষুদ্র, শান্তিকামী, স্বাধীনতাকামী দেশের ওপর দিনের পর দিন তার ক্ষমতার ঔদ্ধত্য চরিতার্থ করে চলেছে, এর চাইতে কুৎসিত, এর চাইতে জঘন্য, এর চাইতে ঘৃণ্য আর কি হতে পারে?

এবং এই গণহত্যা চালানো হচ্ছে কিসের জন্যে? আমেরিকার সমর্থন ছাড়া যারা এক মুহূর্ত টিঁকতে পারে না এইরকম একদল অপদার্থ, দুর্নীতি-পরায়ণ, ক্ষমতাপ্রিয়, স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিকে সামনে রেখে নিজের রাজনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে। এর চাইতে অন্যায় ও বর্বর আর কি হতে পারে?

ওরা জানে না কে 'ভিয়েৎকং' আর কে নয়। ওরা কেবল সন্দেহ করতে পারে। এবং যেহেতু তাদের সন্দেহের কোনো যুক্তি ও ভিত্তি নেই সেই কারণে তাদের কাছে পাত্রাপাত্র ভেদ থাকে না। যে কেউ যে কোনো সময় এই সন্দেহের কবলে পড়তে পারে এবং তখন হিংস্রতার কোনো সীমা পরিসীমা থাকে না।

•এই হিংস্রতার নাম দেওয়া হয়েছে 'কাউন্টার-টেরার', পাল্টা সন্ত্রাস। 'ভিয়েৎকংরা' নাকি সন্ত্রাস সৃষ্টি করে গ্রামাঞ্চলের মানুষকে হাতে রেখেছে, সেটাই নাকি তাদের জয়ের মূলমন্ত্র (সাড়ে পাঁচ লাখ মার্কিন সৈন্য পৃথিবীর উন্নততম সমর সম্ভার নিয়ে এবং কোটি .কোটি টাকার অর্থনৈতিক সাহায্য নিয়ে সারা দক্ষিণ ভিয়েৎনাম চষে বেড়াচ্ছে, তার পরেও!)। তাই তারা পাল্টা-সন্ত্রাস সৃষ্টি করে 'ভিয়েৎকংদের' জব্দ করতে চাইছে।

এবং ওরা জানে না কারা 'ভিয়েৎকং'। সুতরাং দুনিয়ার সৎ ও বিবেকবান মানুষই বিচার করুক এই পাল্টা-সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে কারা?

কি রকম সন্ত্রাস? কি রকম অত্যাচার?

টহল দিতে গিয়ে যদি কোনো ভয়ার্ত গ্রামবাসীকে জলমগ্ন ধান ক্ষেতে কিংবা জঙ্গলের গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে দেখা যায়,

অমনি ধরে নেওয়া হবে সে ভিয়েৎকং। তাকে টানতে টানতে তুলে আনবে সৈন্যরা। হয়তো সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মেরে ফেলবে তাকে, নয়তো আরম্ভ হবে তার ওপর ধীর, দীর্ঘায়ত নির্যাতন।

তাকে মাটিতে শুইয়ে তার বুকের ওপর চেপে বসবে একজন সৈন্য। মুখটা ঢেকে দেওয়া হবে গামছা দিয়ে। তারপর সেই গামছার ওপর ঢালা হবে মগের পর মগ জল। বাতাসের জন্যে ছটফট করবে সে। মুখ ফাঁক করে নিঃশ্বাস নিতে চাইবে। কিন্তু জল আর জল ছাড়া আর কিছুই সে পাবে না। নাকে আর মুখে নিঃশ্বাসের বদলে ঢুকবে শুধু জল আর জল। সেই সঙ্গে তার কোমরে পেটে চলবে সবুট পদাঘাত, দু'জন সৈন্য তার দুটো পা ধরে মোচড়াতে থাকবে, যতক্ষণ লোকটা কোনো 'স্বীকারোক্তি' না করবে কিংবা মরে না যাবে ততক্ষণ।

কিংবা ঐ সন্দেহভাজন বন্দীর গলায় একটা গামছা ফাঁস দিয়ে বেঁধে দুটো মাথা দু'জন সৈন্য ধরে টাগ-অব-ওয়ার খেলবে।

নয়তো মাটিতে শুইয়ে চোয়াল দুটি ফাঁক করে ধরবে একজন, আরেকজন টিনের মধ্যে ভরে গ্যালন গ্যালন জল ঢেলে দেবে তার মুখে, এবং তৃতীয় আর কেউ রাইফেলের কুঁদো দিয়ে মেরে যাবে এলোপাথারি।

বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ওরা গেরিলা সন্দেহে কথা আদায় করার জন্যে গাছ থেকে পা বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে পেটে বুকে মাথায় অনবরত মেরে যায়, পুকুরের জলে ডুবিয়ে চেপে ধরে, কেটে খুঁচিয়ে মাংস বার করে দেয়, মাটিতে শুইয়ে গলায় রড চাপিয়ে দু পাশে দুজন পায়ে চেপে ধরে, ছুরি দিয়ে পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বার করে, ট্যাঙ্কের পেছনে বেঁধে টেনে নিয়ে যায় যতক্ষণ না মারা যাচ্ছে ততক্ষণ।

নির্যাতনের একটা অত্যন্ত প্রিয় পদ্ধতি হচ্ছে ইলেকট্রিক শক দেওয়া। হাতের আঙুলে ইলেকট্রিকের তার জড়িয়ে দিয়ে চালিয়ে

দেওয়া হয় ফিল্ড জেনারেটার। জ্বলে যায় শরীর, সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যায় বন্দী।

প্রায়ই ঐ তার আটকে দেওয়া হয় পুরুষ হলে তার জননেন্দ্রিয়ে, কিংবা মেয়ে হলে স্তনের বোঁটায়।

কখনো 'স্বীকৃতি' আদায়ের জন্যে এক এক করে হাতের আঙুলগুলি কেটে নেওয়া হয়, উপড়ে ফেলা হয় হাতের নখ, কিংবা কেটে নেওয়া হয় তার কান, জননেন্দ্রিয়। কোনো কোনো সামরিক ঘাঁটির দেয়ালে কানের মালা গেঁথে সাজিয়ে রাখতে দেখা গেছে।

ভিয়েৎকং সন্দেহে দুজনকে নিয়ে আসা হচ্ছিল সায়গনে। পথে প্লেনের মধ্যে এই সব এবং অন্যান্য নানা পদ্ধতি প্রয়োগ করে 'স্বীকৃতি' আদায়ের চেষ্টা চলছিল। কিন্তু তারা কিছু বলতে অস্বীকার করে, কেননা স্বীকার করার মতো কিছু ছিল না। রেগেমেগে একজন মার্কিন সৈন্য তাকে তিন হাজার ফুট উঁচু থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল বাইরে। ভয় পেয়ে অপর বন্দী একটা 'স্বীকৃতি' দিয়ে ফেলল। কিন্তু তারপর?

তারপর তাকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হ'ল বাইরে।

একটি গ্রামে ভিয়েৎকংদের খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল একদল দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সৈন্য। তাদের পরিচালিত করছিল একজন অস্ট্রেলীয় ওয়ারেন্ট অফিসার। অনেকক্ষণ ধরে বাড়িঘর ভেঙেচুরে, ক্ষেত-খামার তছনছ করেও তারা যখন একজনও গেরিলাকে ধরতে পারল না, তখন তারা কয়েকজন গ্রামবাসীকে ধরে নিয়ে এলো ওয়ারেন্ট অফিসারের সামনে।

তারপর চলল তাদের ওপর নানান ধরনের নৃশংসতা। কিছু পরে ভিয়েৎনামী সৈন্যদলের কম্যাণ্ডার উপদেষ্টার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল: "ব্যাটা কিছুতেই স্বীকার করছে না যে সে গেরিলা। আমার মনে হয় ওকে গুলি করা উচিত।"

"করবে?" জবাব দিল উপদেষ্টা।

"তা করো।"

সামনে এগিয়ে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল লোকটাকে। কম্যাণ্ডার তার রাইফেলটা তুলে নলটা ঠেকিয়ে ধরল তার বুকে এবং আর কোনো কথা না বলে গুলি করল।

মাটিতে লুটিয়ে পড়বার আগেই মারা গিয়েছিল লোকটা।

'বলতে পারো মা, কেন আমাকে নারীঘাতী, শিশুঘাতী হতে হবে?" এই প্রশ্ন করেছিল একজন মার্কিন নৌ সেনা, ল্যান্স কর্পোরাল রোনি উইলসন কানসাসের উইচিতায় তার মার কাছে লেখা একটি চিঠিতে।

"আমরা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চষে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ ভিয়েৎকংদের মর্টারের গোলা এসে পড়ল আমাদের ওপর," রোনি উইলসন লিখেছিল।

"লেফটেনাণ্ট আদেশ দিলেন গোলার আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে। আমরা আটজন ভিয়েৎকংকে মারতে পেরেছিলাম, প্রায় তিরিশজন পালিয়ে গিয়েছিল।"

"মৃত ভিয়েৎকংদের দেহ তল্লাসী করতে আমরা যখন ব্যস্ত ছিলাম তখন হঠাৎ দেখি নিহত একজনের স্ত্রী একটি গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে একটা সাবমেশিনগান তুলে নিয়ে আমাদের দিকে গুলি করতে আরম্ভ করল।"

"গুলি করলাম আমিও। আমার রাইফেল ছিল অটোমেটিক, কাজেই আমি কিছু বোঝবার আগেই প্রায় ছ' রাউণ্ড গুলি ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল।"

"চারটি গুলি লেগেছিল মেয়েটির দেহে, আর দুটি ছিটকে গিয়েছিল গুহার মধ্যে। এবং নিশ্চয়ই পাথুরে দেয়ালে লেগে গুলি দুটি ঠিকরে এসেছিল আবার, কেননা তার আঘাতে নিহত হয়েছিল একটি শিশু।

"শিশুটির বয়েস ছিল মাত্র দু' মাস। আমি আশা করি মরবার আগে সে কোনো যন্ত্রণা অনুভব করেনি!"

তারপরে মন্তব্য করেছিল রোনি: "আমি শপথ করে বলতে পারি এই জায়গাটা নরকের চাইতেও খারাপ।" কিন্তু বোধহয় সবটা বলেনি রোনি, কিংবা সবটা বোঝবার মতো ক্ষমতা তার ছিল না ঐ নিহত শিশুটি প্রমাণ করছে যে, সেদিন তারা ভিয়েৎকং বলে নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা করেছিল। কেননা সঙ্গে স্ত্রী আর দু'মাসের শিশু নিয়ে যুদ্ধ করতে আসে না কোনো নিয়মিত গেরিলা। এরা ছিল আমেরিকানদের নোংরা লড়াইয়ের উদ্বাস্তু, ঘর ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে যারা আশ্রয় নিয়েছিল জঙ্গলের মধ্যে গুহায়। এবং যদি তারাই ছুঁড়ে থাকে মর্টার, তাহলে সে মর্টার তারা যোগাড় করেছিল হানাদারদের বিরুদ্ধে নিজেদের সুরক্ষিত করবার জন্যে।

কিংবা কে জানে নিরীহ মানুষগুলিকে হত্যা করার ছুতা হিসেবে আমেরিকানদের ভাড়াটে কোন লোকই গুলি ছুঁড়েছিল কিনা। মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা যে ভাড়াটে লোকদের ভিয়েৎকং বলে সাজিয়ে থাকে, এই অভিযোগ স্পষ্টই করেছেন একজন মার্কিন সেনেটার, স্টিফেন ইয়ং।

১৯৬৫ সালের অক্টোবরে ভিয়েৎনাম সফর করে আসার পর তিনি বলেছিলেন, ঐ ভাড়াটে ভিয়েৎকংরা আসল ভিয়েৎকংদের সুনাম নষ্ট করার জন্যে জনসাধারণের ওপর যথেচ্ছ নির্যাতন চালিয়ে থাকে। এমন কি মার্কিন-দক্ষিণ ভিয়েৎনামী মহলও নির্যাতনী অভিযান চালাবার জন্যে তাদের 'দোহাই' হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে উৎপীড়ন আর অত্যাচার চালাবার জন্যে ছুতা বা অছিলা কোনটারই কখনো অভাব হয় না।

উইলফ্রেড বারচেট তাঁর 'দি ফারটিভ ওয়ার' বইয়ে একটি নির্যাতনের ঘটনার উল্লেখ করেছেন যা যে কোনো পাঠককে অসুস্থ করতে বাধ্য।

ঘটনাটি একটি তরুণী মেয়ের। মেয়েটির নিজের ভাষায়: "একদিন আমি বাড়ি ফিরে দেখলাম দু'জন সিকিউরিটি এজেন্ট

আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে তারা ফাইফো শহরে নিয়ে গেল, এবং সেখানে মাসের পর মাস অবিচ্ছিন্ন ভাবে আমার ওপর অত্যন্ত জঘন্য অত্যাচার চালানো হল।...

"একবার জ্ঞান হতে আমি দেখলাম আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ, সারা শরীর কুপিয়ে কুপিয়ে কাটা, সেখান দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত ঝরছে।

"ঘরে আরো কয়েকজন ছিল। আমি একজন মহিলার গোঙানি শুনতে পেলাম, এবং সেই আবছায়া অন্ধকারে দেখলাম একজন মহিলা একটা রক্তের 'পুকুরে' গড়াগড়ি খাচ্ছে। তাকে এত সাংঘাতিকভাবে প্রহার করা হয় যে, তার গর্ভপাত হয়ে যায়। তারপর চেয়ে চেয়ে আমি আরো দেখলাম। একজন বৃদ্ধকে চোখে পড়ল। তাঁর একটা চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছিল, তিনি মারা যাচ্ছিলেন। তাঁর পাশে পড়ে ছিল তেরো কি চোদ্দ বছর বয়েসের একটি ছেলে, মৃত। কিছু দূরে আরেকটি মৃত ছেলেকে দেখলাম, তার মাথাটা ফেটে দু'খানা হয়ে গিয়েছিল।

"ঐ বীভৎসতার মধ্যে আমাকে নিক্ষেপ করে তারা ভেবেছিল আমি এই সব দেখে ভয় পেয়ে সব স্বীকার করে ফেলব।"

এই ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এই ধরণের ঘটনা আজকে ভিয়েৎনামে ঘটছে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে। বন্দী, সন্দেহ-ভাজন সমস্ত মানুষের ভাগ্যে।

কিয়েন তুয়ং প্রদেশে কয়েকজন মহিলা অস্বীকার করেছিল তাদের গ্রামের ঘর বাড়ি জমি-জমা ছেড়ে স্ট্র্যাটিজিক হ্যামলেট নামক বন্দী শিবিরে যেতে। তাদের পাহারা দিয়ে, পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল টাউন স্কোয়ারে, সেখানে অসংখ্য দর্শকের সামনে তাদের পেট চিরে লিভারগুলি কেটে বার করে আনা হল। তারপর সেই লিভার টাঙিয়ে রাখা হল রাস্তার ধারে দৃষ্টান্ত হিসেবে।

আরেকটি গ্রামে একই অপরাধে ওরা সমস্ত অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে এনে জড়ো করেছিল একটা জায়গায়। তাদের বলা হয়েছিল,

আসন্ন মাতৃত্বের জন্যে তাদের সম্মান দেখানো হবে সরকারের পক্ষ থেকে।

ঐ সম্মান ওরা দেখিয়েছিল তাদের পেট চিরে, ভ্রূণগুলিকে কেটে বার করে এনে।

কা মাউ প্রদেশের একটা এলাকায় ভিয়েৎকংরা জড়ো হয়েছে এই খবর পেয়ে, তিন রেজিমেন্ট সৈন্য ও এক ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডো সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়েছিল সেখানে। বলা বাহুল্য, তারা দেখা পায়নি গেরিলাদের।

তার প্রতিশোধ তারা নিয়েছিল এই ভাবে :

জঙ্গলের ধারে ধারে, রাস্তার পাশে পাশে, এবং গ্রাম ও হ্যামলেটের চার পাশে ঘাপটি মেরে বসে রইল তারা। তারপর যারাই যেতে লাগল ঐ পথ দিয়ে কিংবা কাছাকাছি দিয়ে তাদেরই গ্রেপ্তার করতে লাগল। বাছ বা বিচার বলে কিছু রইল না। রইল না নারী কিংবা পুরুষ, শিশু কিংবা বৃদ্ধের পার্থক্য। এলোপাথাড়ি গ্রেপ্তার করে তাঁদের ওপর চলল অকথ্য নির্যাতন।

মেয়েদের ওপর বলাৎকার করা হল একের পর এক। মাঝে মাঝে দেওয়া হল ইলেকট্রিক শক। কিংবা তার গোপন অঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হল কোনো লম্বা কাঠের টুকরা। কয়েকজন পালাবার চেষ্টা করছিল, তাদের ওপর লেলিয়ে দেওয়া হল কুকুর। কিছু সংখ্যক মহিলাকে তাদের স্বামীদের চোখের সামনেই বলাৎকার করা হ'ল, তারপর গুলি করে মেরে ফেলা হ'ল তাদের।

রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলল গণহত্যা। একটি প্রাণীরও পালাবার উপায় ছিল না। হত্যাকারীরা ঘিরে রেখেছিল চারদিকের পথ। কেটে ফেলা হল তাদের মাথা, রাইফেলের কুঁদোর আঘাতে ফাটিয়ে চৌচির করা হল। শরীরটা টুকরো টুকরো করা হল কেটে। তার পর ঐ ফাটানো মাথা আর শরীরের টুকরোগুলো ফেলে দেওয়া হল নদীর জলে।

লং মি'তে (কান থো প্রদেশ) জনসাধারণকে শান্ত করার নামে তাদের শতে শতে হত্যা করে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আরও অনেক রকম ঢং আছে সভ্য দুনিয়ার বর্বরতার! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এই সব বর্বরতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কি শিশু, কি নারী, কি বৃদ্ধ কেউই বাদ যায় না।

পায়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে বন্দীকে, তারপর চারজন সৈন্য তার শরীরটাকে পাঞ্চিং বল হিসেবে ব্যবহার করে লাথি কিংবা ঘুষি মেরে যাবে। কিংবা ঐভাবে ঝোলা অবস্থায় হাত দুটো চেপে আটকে দিয়ে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে মারতে থাকবে।

এরপর আছে নৌকা বিহার। ময়লা সাবান জলে পেচ্ছাব আর মল মিশিয়ে ঢেলে দেওয়া হবে মুখে; তার পর মুখ বেঁধে চিৎ করে শুইয়ে রাখা হবে মাটিতে। ফুলে উঠবে পেট। সঙ্গে সঙ্গে একজন সৈন্য লোহা লাগানো বুট পরে উঠে দাঁড়াবে তার ওপর!

কিংবা বন্দীকে পেরেক ঠুকে ঠুকে আটকে দেওয়া হবে কোনো গাছের সঙ্গে, তারপর তাকে গুলি করা হবে। তান আন প্রদেশে তেইশটি যুবক-যুবতীকে ওইভাবে হত্যা করা হয়েছিল।

তারপর আছে 'স্বীকারোক্তি'। উঁচু একটা ইটের পাঁজার ওপর ব্যালেন্স রেখে দাঁড়াতে বলা হবে। চারিদিকে মাটিতে ছড়ানো থাকবে অসংখ্য ছুঁচলো লোহার ফলা। কিংবা ভাঙা কাঁচের একটা স্তূপের ওপর হাঁটু ভেঙে বসতে বলা হবে। এইভাবে থাকতে হবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যদি একটুও নড়াচাড়া করে কেউ অমনি সুরু হবে প্রহার। যদি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় তা'হলে ছুচলো লোহার ফলাগুলি অপেক্ষা করবে তার জন্যে।

যদি মনে হয় কোনো বন্দী সহজে মচকাতে চাইছে না, তা'হলে ধরে আনা হবে তার বাবা-মা'কে, কিংবা স্ত্রীকে, কিংবা আত্মীয়-স্বজনকে। তারপর তাদের চোখের সামনে পা দুটো ধরে, যেমন

করে কাপড় কাচে ধোবা, তেমনি করে আছড়ানো হবে একটা দেয়ালে, যতক্ষণ না মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়!

নয়তো চটের থলেতে ভরে বাইরে থেকে বেয়োনেট দিয়ে খোঁচানো হবে সমানে, তারপর পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে।

এতেও শেষ নয়। দু'ধারে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দৌড়ে যেতে হবে বন্দীকে। পেছনে ছুটতে ছুটতে আসবে একটা জীপ। যদি কখনো টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যায় অমনি জীপের চাকা চলে যাবে তার ওপর দিয়ে।

কখনো বা দু' পা শক্ত করে বেঁধে মেয়েদের পায়জামার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে বিষাক্ত সাপ। কিংবা পাঁচটা দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে নিচে খাদের মধ্যে রাখা হবে ছুঁচলো লোহার ফলা। তারপর এক এক করে দড়িগুলো কেটে দেওয়া হবে।

সুসভ্য বর্বরতা কত নৃশংস হতে পারে এগুলি তার নিদর্শন। মধ্য-যুগের অসংস্কৃত পৃথিবীতেও মানুষের সভ্যতা বোধ হয় এতখানি অন্ধকারে ঢাকা পড়েনি!

এবং ভিয়েৎনামের ট্র্যাজিডি কি কেবল এই সব ব্যক্তিগত নির্যাতন ও নৃশংসতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ?

এর উত্তর আছে তাং ডুকের নুয়েন ডিউর জবানবন্দীতে।

প্লাইকু প্রদেশে ১৯ নম্বর সড়কের পাশে কম্বোডিয়ার সীমান্তের অদূরে তাং ডুক একটি ছোট্ট গ্রাম। অর্থাৎ এক কালে ছিল, এখন আর নেই।

তেরো শ' মানুষের গ্রাম ছিল তাং ডুক। তারই একজন চাষী ছিল নুয়েন ডিউ। সুখে শান্তিতে নিজেদের ছোট্ট গণ্ডীটুকুর মধ্যে বেশ ভালোই কেটে যাচ্ছিল তাদের জীবন।

হঠাৎ একদিন বোমারু বিমানগুলি এলো।

তাং ডুকের মাইল আড়াই পূর্বে ডুক কো'তে ছিল একটি সরকারী

সামরিক ঘাঁটি। মার্কিন স্পেশাল ফোরসের একটি ইউনিটও মোতায়েন ছিল সেখানে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে গেরিলারা চড়াও হয়েছিল ঐ ঘাঁটির ওপর।

ক্রমে গেরিলাদের ফাঁস আরো শক্ত হ'ল। ঘাঁটি প্রায় যায় যায়। এক ব্যাটেলিয়ন দক্ষিণ ভিয়েৎনামী ছত্রী সৈন্য এনে নামিয়ে দেওয়া হল ঘাঁটিতে, কিন্তু বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব হ'ল না।

এমন সময় আকাশে হাজির হল আমেরিকার বিমান তার মারণাস্ত্রের ভয়াবহ সম্ভার নিয়ে। ডুক কো'র আশেপাশে বোমা ফেলল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর হঠাৎ তেড়ে এলো তাং ডুকের দিকে।

নুয়েন ডিউ বলেছিল, "আমরা ভাবতে পারিনি যুদ্ধ আমাদের গ্রামকেও আচ্ছন্ন করবে। আমি হলফ করে বলতে পারি ঐ সময় আমাদের গ্রামে একজনও গেরিলা ছিল না। তবু ওরা আক্রমণ করেছিল আমাদের, তবুও।"

ঘুরে ঘুরে, ডাইভ দিয়ে অনেকটা নিচে নেমে এসে বিমানগুলি নির্বিচারে বোমা ফেলল কৃষকদের কুটির লক্ষ্য করে। ভারী ভারী বোমা। নেপাম। গোটা গ্রামখানা মিশে গিয়েছিল মাটির সঙ্গে। বাড়ির অবশেষগুলি জ্বলছিল জায়গায় জায়গায়।

"অনেক লোক মারা গিয়েছিল," বলেছিল নুয়েন ডিউ। "আমি বলতে পারব না কতজন। প্রত্যেকেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল রাস্তায়। দৌড়চ্ছিল জঙ্গলের দিকে।"

তবু ক্ষান্ত হয়নি হানাদারেরা। ঐ ভীত, সন্ত্রস্ত, পলায়মান মানুষগুলির পিছু পিছু তারা ধাওয়া করে গিয়েছিল। তাদের মাথার ওপর নেমে এসে বোমায় বোমায় ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল।

যে কয়েকজন শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল জঙ্গলে, তাদের হত্যা করার জন্যে বনাঞ্চল জ্বালিয়ে দিয়েছিল নেপামে।

উত্তর আছে ঐ মার্কিন নৌ-সেনার উন্মত্ত হুঙ্কারের মধ্যে,

যে বলেছিল : "মেরে ফেল, সব্বাইকে মেরে ফেল। একজনও নড়ছে আমি দেখতে চাই না।"

১৯৬৫ সালের জুলাই মাস। আন হোয়া দ্বীপে গেরিলাদের সন্ধানে ধাওয়া করতে করতে নৌ-সেনারা এসে পৌঁছল একটা গ্রামে। ওদের ধারণা হ'ল গেরিলারা ঐ গ্রামেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

এক ধার থেকে বাড়ি-ঘর ভেঙে তছনছ করে আগুন লাগিয়ে দিতে দিতে এগোতে লাগল তারা। লোকজন ভয়ে ছুটতে লাগল সামনের দিকে, খোলা ধান ক্ষেতে, শরের বনে, জলায় গিয়ে আশ্রয় নিল অনেকে। তাদের পেছন পেছন মেশিন গানের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে দৌড়তে লাগল নৌ-সেনারা।

গ্রামের শেষে দেখা গেল একজন মহিলা মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। তাব বুকের পাশের একটা ক্ষতস্থান থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে ভেসে যাচ্ছে মাটি। তার ভয় পাওয়া বাচ্চাগুলি তাকে ঘিরে কাঁদছে এবং ভয়ে ভয়ে একবার নৌ-সেনাদের দিকে চাইছে আরেকবার মুমূর্ষু মাকে আঁকড়ে ধরছে।

যে বাড়িটার সামনে পড়েছিল মহিলা, সেটা জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর হঠাৎ তাদের মনে হ'ল একটা বাড়ি থেকে যেন গুলির আওয়াজ এলো। সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেল আশেপাশের যত বাড়ি ছিল সব। একটি বাড়ির ভেতরে একটা বাঙ্কারে কয়েকজন নরনারী লুকিয়ে ছিল, আগুন থেকে তারা বেরোবার পথ খুজে পায়নি।

দারুণভাবে দগ্ধ অবস্থায় তাদের বার করে নিয়ে এলো একজন সৈন্য। সেই দেখে আরেকজন চেঁচিয়ে বলে উঠল : "মেরে ফেল, সব্বাইকে মেরে ফেল! একজনও নড়ছে আমি দেখতে চাই না।"

ওপাশে একটা সাব-মেশিনগান থেকে গুলি করে যাচ্ছিল আরেকজন সৈন্য। মাটির তলায় হাতবোমা ফাটবার একটা চাপা আওয়াজ শোনা গেল। তারপরেই শোনা গেল তার উৎফুল্ল চীৎকার :

"মেরেছি, একটা ভি-সি'কে মেরেছি! না, মনে হয় একসঙ্গে দুটো জারজই ঘায়েল হয়েছে!"

ব্যাপার আর কিছুই নয়। বাড়ি বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় একটা গর্তের মতো দেখতে পেয়েছিল সে। মনে হয়েছিল যেন কয়েকজন লাফিয়ে সেখানে ঢুকে পড়েছিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে সে গুলি ছিটিয়ে দিয়েছিল আর গড়িয়ে দিয়েছিল একটা হাতবোমা।

একজন দক্ষিণ ভিয়েৎনামী কর্পোরালকে বলা হল গর্তের ভেতরে গিয়ে শিকারগুলো বার করে আনতে।

ভিয়েৎনামী কর্পোরাল তাদের বার করে এনেছিল একে একে: দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে, এগারো থেকে চোদ্দর মধ্যে বয়েস।

তারা ভয় পেয়ে ঢুকে পড়েছিল ঐ গর্তে, কেন না নৌ-সেনারা এসে চড়াও হবার আগে একটি হেলিকপ্টার এসে গ্রামের ওপর উড়ে উড়ে গ্রামবাসীদের সাবধান করে বলে গিয়েছিল তারা যেন যে যার বাড়ির মধ্যেই থাকে।

উত্তর আছে সেই ভয়ার্ত চাষীর নীরব মৃত্যুর মধ্যে যে হঠাৎ ধান ক্ষেতের কাদা থেকে উঠে দৌড়তে আরম্ভ করেছিল।

তার গ্রামে চড়াও হয়েছিল সৈন্যদল। এবং একজনও গেরিলাকে ধরতে না পেরে জ্বালিয়ে দিয়েছিল গ্রাম।

সেই লেলিহান আগুনের হাত থেকে পালিয়ে কৃষক চলে এসেছিল মাঠে। হাঁটু সমান কাদা, আর তার ওপর জল। সেই জলে-কাদায় গা ডুবিয়ে সে লুকিয়ে ছিল ধান গাছের আড়ালে।

ভেবেছিল, গ্রামখানাকে ছাই করে দিয়ে বুঝি ক্ষান্ত হবে হানাদারের দল।

কিন্তু হয়নি। হঠাৎ দেখা গেল গ্রাম ছেড়ে তারা ছড়িয়ে পড়েছে আশেপাশের মাঠে। কয়েক ফুট পর পর দাঁড়িয়ে একটা লম্বা সারিতে প্রতিটি ধানের গোড়া দেখতে দেখতে এগোতে লাগল।

যেন জাল ফেলা হয়েছে কোনো পুকুরে ছেঁকে তোলবার জন্যে। উদ্যত মেশিনগান প্রত্যেকের হাতে।

সৈন্যরা যখন প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে, তখন হঠাৎ লোকটা জলের মধ্যে থেকে লাফিয়ে উঠে প্রাণপণে দৌড়তে আরম্ভ করল। ঐ গভীর কাদার মধ্যে দৌড়ানো প্রায় অসম্ভব, তবু তারই মধ্যে সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুটতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে যতগুলি মেশিনগান, টমিগান, রাইফেল আর পিস্তল ছিল মাঠে, সব গর্জে উঠল একসঙ্গে। সবগুলির নল তাক করা ছিল ঐ একটি পলায়মান, ভয়ার্ত, নিরস্ত্র মানুষের দিকে। সবগুলি নিরবচ্ছিন্ন গুলি করে চলল।

আশ্চর্য, তবুও দৌড়চ্ছিল লোকটা। কোনোদিকে না চেয়ে, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছিল। কিন্তু মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে। তার পরেই ঘুরে পড়ে গিয়েছিল কাদায়। নীরবে, একটিবারের জন্যেও চীৎকার না করে।

ভয়ঙ্কর একটা উল্লাসে চীৎকার করে সৈন্যরা এগিয়ে গিয়ে দেখল তখনও মরেনি সে, যদিও চারটে বুলেট তার নগ্ন বুক ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল। হাত-পা ছুড়ছিল সে, মাথাটা অস্থিরভাবে নাড়াচ্ছিল এপাশ-ওপাশ, মুখ ভরে গিয়েছিল রক্তে। কেবল ঐ মুখে ছিল না কোনো যন্ত্রণার শব্দ।

তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তারা হাসতে লাগল। একজন মাঠ থেকে একটা খোঁটা কুড়িয়ে এনে তার গলায় চেপে ধরল।

এমন সময় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এলো একটি মেয়ে। এতক্ষণ সে কোথায় ছিল কে জানে। হয়তো প্রাণের ভয়ে নিজেও লুকিয়েছিল আশেপাশের কোনো ধান গাছের আড়ালে। আর সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে এসেছে।

তাকে দেখে হো হো করে আবার হেসে উঠল সবাই। নানারকম মন্তব্য বর্ষিত হতে লাগল।

"আরে, এটা আবার কোত্থেকে এলো?"

"একেবারে বাঘের ঘরে এসে হাজির, বেটির মতলবটা কি?"

"কি রকম ডাগর-ডোগর দেখেছিস! ধরব নাকি?"

"এইখানে? এই মাঠে? তার চাইতে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে হয়।"

কোনোদিকে কান দিল না মেয়েটি। যেন আর কিছুতেই তার ভাবনা নেই, আর কোনো ইতরতাকেই সে ভয় করে না।

কাদার মধ্যেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সে। মুমূর্ষু লোকটার মাথাটা টেনে নিল তার কোলে। আঁজলা করে ধান ক্ষেতের কাদা-জল তুলে নিয়ে পরম যত্নে ক্ষতস্থানগুলি ধুইয়ে দিতে লাগল। মাঝে মাঝে হাত বোলাতে লাগল তার কপালে। কখনো দু'হাতে মুখটা ধরে নুয়ে পড়ে কি যেন বলতে লাগল বিড়বিড় করে।

কেবল সে আর ঐ লোকটা, এ ছাড়া যেন আর কেউ ছিল না সারা জগতে।

প্রায় দশ মিনিট পরে মারা গেল লোকটা।

কাঁদল না। মেয়েটি বসে রইল স্থির হয়ে। লোকটার মাথাটা তার কোলে ঝুলে পড়েছে একদিকে। একটা হাত দিয়ে সে ঢেকে দিল তার চোখ দুটি।

ধীরে ধীরে, একটু একটু করে সে এক সময় চোখ তুলে তাকালো চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যদের দিকে। সে চোখে দৃষ্টি ছিল না। জলের একটা অস্পষ্ট আবরণ শুধু চিকচিক করছিল।

ঐ লোকটা ছিল তার স্বামী।

উত্তর আছে কোয়াং নাই প্রদেশের ভান-হা গ্রামের সেই নারী-শিশু-বৃদ্ধ বৃদ্ধার কাতর নিবেদনের মধ্যে যারা কাঁপতে কাঁপতে তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল অগ্রসরমান মার্কিন ট্যাঙ্কগুলির সামনে।

"দয়া করে আমাদের মারবেন না। বিশ্বাস করুন এই গ্রামে এখন কোনো পুরুষ মানুষ নেই, এখানে এখন আমরা একা।"

কিন্তু থামেনি আমেরিকার ট্যাঙ্ক। ওরা ভেবেছিল এটা বুঝি গেরিলাদেরই একটা চাল : শিশু, নারী আর বৃদ্ধদের এগিয়ে দিয়ে তাদের গতি শিথিল করতে চায়। সুতরাং—

সুতরাং মেশিনগানের গুলিতে ঐ আশ্রয়ার্থী নারী-শিশুকে ওরা বিদ্ধ করেছিল। তারপর তাদের ওপর দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল গোলা ছুঁড়ে আর বোমা ফেলতে ফেলতে।

এটাই হচ্ছে মার্কিন যুদ্ধের রীতি ভিয়েৎনামের গ্রামাঞ্চলে। ওরা এগোয়, ওদের যাত্রাপথের দু'পাশে নরক জ্বলতে থাকে, আহতের আর্তনাদে ভারী হয় আকাশ, মৃতদেহে অবরুদ্ধ হয় রাস্তা, পাকা ধানের গাছগুলি লুটিয়ে পড়ে কাদায়।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে সমানে গোলা আর গুলি বর্ষণ করার পর যখন পদাতিক সৈন্যরা ঢুকতে যাবে গ্রামে, তখন গ্রামের প্রায় ৮০ শতাংশ বাড়ি মাটির সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে।

সেই ধোঁয়ানো ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে পদাতিক বাহিনী ছড়িয়ে পড়ল যে বাড়িগুলি তখনও দাঁড়িয়েছিল তাদের দিকে। একটি একটি বাড়ি লক্ষ্য করে ওরা হাতবোমা ছুঁড়ে দিতে লাগল দরজার মধ্যে দিয়ে। বিস্ফোরণে ভেঙে পড়তে লাগল সেগুলি তারপর ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে টেনে বের করতে লাগল অচেতন, অর্ধমৃত নারী-শিশুর মৃতদেহ। রাইফেলের কুঁদো দিয়ে তাদের মেরে শেষ করতে লাগল।

তারপরেও অনেকক্ষণ ধরে ওরা চালালো গুলি। মাঝে মাঝে এক একটা সন্দেহজনক গর্ত দেখে ছুঁড়তে লাগল হাতবোমা। কখনো ধোঁয়া-শেল।

অবশেষে তারা যখন ফিরে গেল, তখন একটি জীবন্ত প্রাণীও ছিল না কোথাও। গাছে গাছে ফলগুলি পর্যন্ত ঝলসে গিয়েছিল।

তারা ফিরে গেল যে পথ দিয়ে তারা এসেছিল। পাকা ধানের ওপর দিয়ে। বিরাট বিরাট এ-পি-সি (আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার) ট্যাঙ্কের নিচে দলিত মথিত হয়ে গেল চাষীর পরিশ্রমের ফসল, তার ভবিষ্যতের আশা।

এই ব্যাপক, নিবিড় ধ্বংসকাণ্ড, এই নির্বিচার, সুপরিকল্পিত হত্যা, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে চলে আসছে বছরের পর বছর। যত গ্রাম আছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তার অর্ধেকেরও বেশি বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল ১৯৩২ সালের মধ্যেই, যখন গেরিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সক্রিয়ভাবে আরম্ভ হয়েছে মাত্র দু'বছর। তারপর আরও সম্প্রসারিত হয়েছে যুদ্ধ। আরো মার্কিন সৈন্য আমদানী হয়েছে ভিয়েৎনামে। মার্কিন প্রতিহিংসা হয়েছে আরো মরীয়া।

"জানো, তোমরা জানো, ঐখানে বাড়িতে আমার ছেলেমেয়েরা, নাতি-নাতনীরা আছে। আমি তাদের কাছেই যাচ্ছি।" বলেছিল আন লাও উপত্যকায় হুং-নন গ্রামের সত্তর বছরের এক বৃদ্ধা।

একটি জ্বলন্ত ধ্বংসস্তূপের দিকে সে আঙুল তুলে দেখালো।

গ্রামখানাকে পুড়িয়ে ছারখার করার পর একজায়গায় বিশ্রাম করছিল মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সৈন্যরা। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছিল চারদিকে অসংখ্য থামের মতো। হিস হিস শব্দ উঠছিল ভগ্নস্তূপের মধ্যে থেকে। হঠাৎ হঠাৎ এক একটি বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, এবং সেই সঙ্গে ধুলো-মাটি উথলে উঠে ছড়িয়ে পড়ছিল। এধার ওধার ছড়ানো ছিল অসংখ্য মৃতদেহ, মানুষের, গরু-বাছুরের।

হঠাৎ, নেহাৎই হঠাৎ একা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছিল ঐ বৃদ্ধা। তার চোখের দৃষ্টি ছিল বিশ্রস্ত, তার শরীর ভাঙতে ভাঙতে এসে ঠেকেছিল হাড় ক'খানিতে, তার চুলগুলি এলোমেলোভাবে উড়ছিল তার মুখটি ঘিরে।

ঘাসের ওপর ছড়ানো মৃতদেহগুলি মাড়িয়ে মাড়িয়ে সে আসছিল

সৈন্যদের দিকে। আর বিড়বিড় করে বলছিল: "আমি বাড়ি যাচ্ছি। হ্যাঁ, এই রাস্তা দিয়েই তো আমার বাড়ি যেতে হয়।"

"এই পাগলী, তুই এখানে কি করছিস?" একজন সৈন্য চেঁচিয়ে উঠল।

একটা মরা মানুষের দেহে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল বৃদ্ধা, কোনোমতে টাল সামলে নিল। "আমার লাঠি?" বলে উঠল সে। "আমার লাঠিঠা কোথায় গেল?"

তার পরেই সে দ্রুত হাঁটতে লাগল অন্যদিকে। "আমাকে বাড়ি যেতেই হবে। আমি আর এখানে থাকতে পারছি না, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।"

"যেতে দিও না, ওকে যেতে দিও না" একজন মার্কিন সৈন্য চেঁচিয়ে উঠল। "ও নির্ঘাৎ ভিয়েৎকংদের গুপ্তচর।"

দৌড়ে গিয়ে একজন সৈন্য তার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো।

"ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা।" বৃদ্ধা কাঁদতে লাগল। তার দৃষ্টিহীন চোখের গহ্বর থেকে গড়াতে লাগল জল। "আমার ক্ষিদে পেয়েছে, আমি বাড়ি যাব।"

ধ্বস্তাধ্বস্তি করে সে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আবার চলতে লাগল। আবার তাকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসা হল।

এবার সে কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল মাটিতে। এক একজন সৈন্যের হাত ধরে ধরে বলতে লাগল: "বিশ্বাস করছ না তোমরা? আমি সত্যি বলছি, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।"

"থাক থাক, আর ন্যাকা কান্না কাঁদতে হবে না," খেঁকিয়ে উঠল একজন।

আরেকজন বলল: "যেতে ইচ্ছা হয় যা, কিন্তু মনে রাখিস মরবার জন্যে যাবি।"

ধীরে ধীরে লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল বুড়ি। তারপর পা

টানতে টানতে চলতে লাগল সে, বিধ্বস্ত, ধোঁয়ানো একটি ধ্বংসস্তূপের দিকে।

ধীরে, অত্যন্ত ধীরে।

যেতে যেতে এক সময় সে নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল সৈন্যদের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট-মাখানো একটি কাগজের প্লেট। আরো কিছুদূর গিয়ে একটা খালি টিন।

তারপর ধোঁয়ার আড়ালে তাকে আর দেখা গেল না।

ঐ বৃদ্ধার ভস্মীভূত সংসারের মধ্যে আছে ভিয়েৎনামের ট্র্যাজিডি।

এবং ট্র্যাজিডি আছে ঐ ছবির মধ্যে যেখানে বাবা জড়িয়ে ধরেছে তার শিশু পুত্রকে। তিন বছরের শিশুর হাত, পা, বুক, পিঠ, মুখ পুড়ে কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। ফেটে ফেটে পড়ছে চামড়া। দু'টি অসহায় চোখ মেলে সে শুধু তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আপনার দিকে, দুনিয়ার বিবেকের দিকে।

নেপাম কি বীভৎস ক্ষতি করতে পারে, ঐ শিশুটি তার নিদর্শন।

এবং ঐ বাচ্চা মেয়েটি, একটা বিধ্বস্ত গ্রামের পথে যে একাকী কাঁদতে কাঁদতে পথ হাঁটছে, যার হাত পুড়ে গেছে নিদারুণ ভাবে।

আর ঐ দুধের শিশুটি যার শরীর এত বিশ্রী ভাবে পুড়ে গেছে যে মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কোনভাবে তাকে চেনা যায় না, তবু মা যাকে বুকে বেঁধে একটা বোতল থেকে জল খাওয়াচ্ছে।

সন্ত্রাসের অস্ত্র নেপাম। এক ধরনের পেট্রোলিয়াম জেলি। তরলও নয়, ঘনও নয়, থকথকে। মাটির সঙ্গে যেই সংস্পর্শে আসে অমনি তাতে আগুন জ্বলে ওঠে। ভয়ঙ্কর আগুন। নেপামের ছিটকে পড়া প্রতিটি কণার সঙ্গে সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় সামনে যা পায় সবকিছু। মানুষ, বাড়িঘর, গাছপালা, সব। বাতাস থেকে শুষে নেয় অক্সিজেন, ছটফট করে মরে যায় কাছাকাছি যত মানুষ থাকে সকলে।

সেই নেপাম ওরা বৃষ্টির ধারার মতো নিক্ষেপ করে চলেছে সারা ভিয়েৎনাম জুড়ে প্রতিনিয়ত। সেই সঙ্গে ফসফরাস বোমা, যা নেপামের চাইতেও মারাত্মক, যার আগুন চামড়ায় একবার লাগলে আর ছাড়ানো যায় না। এবং সাড়ে সাত শো, হাজার, তু'হাজার পাউণ্ড ওজনের বোমা যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হত, যা ভয়ঙ্কর আঘাতে কেবল সবকিছু বিধ্বস্তই করে না, যেখানে পড়ে সেখানে পুকুরের মতো গর্ত হয়ে যায়।

সকাল তখনো সাতটা বাজেনি। কোয়াং নাই প্রদেশের ফো মিন গ্রামের চিনি ব্যবসায়ী হোয়াং তান হুং যাচ্ছিল কোয়াং নাই শহরের দিকে। তার সঙ্গে ছিল তুই বন্ধু, আন আর সন।

শহর থেকে যখন তারা মাইল চারেক দূরে, এমন সময় মাথার ওপর তুটো সাধারণ প্লেন ও চারখানা জেট এসে হাজির হল।

কাছাকাছি তুটো বসতি এলাকা ছিল, বা লা ও ভান তুয়ং।

মাকিন বিমানের পক্ষে এর চাইতে চমৎকার লক্ষ্যবস্তু আর হতে পারে না।

দৌড়ে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল তারা। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়ল বনাঞ্চল। হোয়াং দেখল, লেলিহান আগুন তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে।

ঐ তুটি ছোট্ট বসতি এলাকা লক্ষ্য করে প্লেন থেকে ফেলা হয়েছিল রকেট বিস্ফোরক আর নেপাম অজস্র, অন্তহীন ধারায়।

হোয়াংয়ের মনে হ'ল সমস্ত শরীর যেন ঝলসে যাবে। এত উত্তাপ চারদিকে। প্রায় তিনশ মিটার দূরে কয়েকটা বাড়ি অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল তখনও। প্রাণপণে সেইদিকে দৌড় দিল হোয়াং।

কিন্তু পৌঁছতে পারে নি। তার আগেই সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিল।

আগুন জ্বলছিল তার শরীরে।

ঐ বোমা-বৃষ্টির মধ্যেও চার-পাঁচজন লোক ছুটে বেরিয়ে এলো।

তাড়াতাড়ি মাটি চাপা দিয়ে কোনোমতে নেবালো আগুন। তারপর তাকে নিয়ে গেল দশ মাইল দূরের একটা ফিল্ড হাসপাতালে, ভিয়েৎকং এলাকায়।

হাসপাতালে আসার পর তার জ্ঞান ফিরেছিল এবং তখনই সে শুনল যে আগুন নেবানো হলেও প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত তার শরীর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল।

তাকে শোয়ানো হয়েছিল কলাপাতার ওপর এবং তার দেহ ছিল নগ্ন। হোয়াংয়ের মনে হ'ল যেন তাকে কোনো ফার্নেসের মধ্যে শুইয়ে রাখা হয়েছে।

আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

দশ দিন কেটেছিল এইভাবে। মাঝে মাঝে জ্ঞান আসছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল আবার। সারাটা পিঠ নিদারুণভাবে পুড়ে গিয়েছিল। কাজেই কাত হয়ে ছাড়া শোবার উপায় ছিল না।

সেই সঙ্গে ছিল জ্বর, আর অসহ্য অবর্ণনীয় যন্ত্রণা।

পনেরো দিন পর তাকে পাঠানো হ'ল বড় হাসপাতালে। সেখানে চার মাস পর্যন্ত তার জ্ঞান পুরো ফিরে আসেনি। প্রতিটি মুহূর্ত সে যন্ত্রণায় ছটফট করেছে। শরীর থেকে পোড়া মাংস খসে খসে পড়ে গেছে। পুঁজ বেরিয়েছে সমানে। সমস্ত শরীর দুর্গন্ধে ভরে গিয়েছিল। শোবার উপায় ছিল না, বসে বসে কাটাতে হ'ত সারাক্ষণ। খাবার উপায় ছিল না, কেননা জলীয় জিনিস ছাড়া আর কিছু গলা দিয়ে নামত না।

পাঁচ মাসের মাথায় সে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল তার জেলার হাসপাতালে।

১৯৬৫ সালের অক্টোবরে হোয়াং চূড়ান্তভাবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু এখনও তার শরীর প্রায়ই অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এক ধরণের হলুদ জলীয় পদার্থ তার শরীর থেকে এখনও

চুইয়ে চুঁইয়ে পড়ে। এখনও সে সম্পূর্ণ নগ্ন না হলে ঘুমোতে পারে না।

মাথা নাড়তে পারে না সে। তার গোটা পিঠ ফুলকপির ফুলের মতো ঝলসে গেছে; সে পিঠ কাঠের মতো শক্ত। তার বাঁ কান গলে মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে, বাঁ হাতটা ওপরের দিকে সেঁধিয়ে গেছে শরীরের মধ্যে।

প্রতিদিন শত শত প্লেন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আকাশে ওড়ে বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে। এক ইঞ্জিনের ছোট ছোট 'সেসনা' বিমান। এই প্লেনগুলিকে বলা হয় 'বার্ড ডগ', অর্থাৎ পাখি কুকুর। উড়ে বেড়ায় বলে এগুলি পাখি, আর উড়ে উড়ে গেরিলাদের সন্ধান করে বেড়ানোই কাজ বলে কুকুর।

প্রত্যেকটি 'বার্ড ডগ' সেসনা হচ্ছে এক একটি উড়ন্ত ঘাঁটি, ফরোয়ার্ড এয়ার কনট্রোল। এমনি অগ্রবর্তী ঘাঁটি আছে মাটিতেও। মূল ঘাঁটি থেকে একটু দূরে দূরে। কোনো জঙ্গলের প্রান্তে কিংবা কোনো নদীর তীরে। এগুলিকে বলা হয় ফরোয়ার্ড অপারেটিং বেস।

উড়ন্ত কিংবা স্থাবর এই অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলিতে যারা থাকে তাদের কাজই হ'ল গেরিলাদের ওপর নজর রাখা। কিন্তু ওরা চেনে না. কে গেরিলা আর কে নয়। ওরা শুধু সন্দেহ করতে পারে। এবং ওরা যাকে মনে করে সন্দেহজনক তেমনিভাবে কাউকে ঘোরাফেরা করতে দেখলেই ওরা বেতারে জানিয়ে দেবে সে কথা। অগ্রবর্তী ঘাঁটি থেকে যে অনুরোধ যাবে, অন্য সব অনুরোধের ওপরে তাকে স্থান দেওয়া হয়। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে প্লেন, আসবে গোলন্দাজ বাহিনী। একটা জায়গা মোটামুটি অনুমান করে নিয়ে প্রচণ্ড বোমা ও গোলাবর্ষণ করে ফিরে যাবে।

এবং ওদের সন্দেহের রকম কি?

চোখে দেখার দরকার নেই, কেবল গুজব শুনলেই হল যে অমুক

জায়গায় কিছু ভিয়েৎকং রয়েছে। অমনি আরম্ভ হয়ে যাবে আক্রমণ।

ক্ষেতে কাজ করছে চাষী, আকাশ থেকে কোনো বীর-পুঙ্গবের ধারণা হল ও একজন ভিয়েৎকং। সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে প্লেন, চলবে গোলা, গুলি।

পুকুরে স্নান করছে মহিষ, সেসনা আন্দাজ করে নিল ওটা একটা ভিয়েৎকং। অতএব চালাও গুলি।

ক্ষেতের কোনো জায়গা একটু বেশি সবুজ দেখাচ্ছে, অমনি রকেটে, বিস্ফোরকে, নেপামে ধানের ক্ষেত তছনছ হয়ে যাবে।

অনেক সময় ওরা জানেও না কোথায় বোমা ফেলছে। বিশেষ করে রাত্রে।

ঘুরতে ঘুরতে যখন এবং যেখানে ইচ্ছা হবে গোলা নিক্ষেপ করবে। দেখা যাক ওখানে কোনো গেরিলা আছে কিনা এই ভেবে ফেলবে বোমা। এক একটা জায়গাকে 'ফ্রি ফায়ারিং জোন' বা অবাধ আক্রমণ অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এইসব অঞ্চলে যে কেউ, যত ইচ্ছা যেভাবে খুশি গোলা ও বোমা বর্ষণ করতে পারে। এক একটি প্লেন বা হেলিকপ্টার যায় আর নিস্তব্ধ অন্ধকারে তাদের মারণাস্ত্র উজাড় করে ঢেলে দিয়ে আসে।

শুধু নেপাম নয়, শুধু সাধারণ ভারী ভারী বোমাও নয়, সেই সঙ্গে একটি বিশেষ ধরণের মারাত্মক মারণাস্ত্র, যার নাম সি-বি-ইউ।

সি-বি-ইউ হচ্ছে ক্লাস্টার বম ইউনিটের সংক্ষিপ্ত নাম। এগুলি অন্যান্য বোমার মতো ধ্বংসকার্য করার জন্যে তৈরী নয়, বিশেষভাবে মানুষ মারার জন্যেই তৈরী। অর্থাৎ এগুলি হচ্ছে অ্যান্টি-পার্সোনেল বম।

এক একটি ক্লাস্টার বম ইউনিট বা ঝাঁক-বাঁধা বোমার মধ্যে থাকে একটি মূল বা মাদার বম। একটা লম্বা টিনের পাত্রের মতো দেখতে। এর মধ্যে থাকে ৬৪০টি 'পেয়ারা', অর্থাৎ মাঝারি বোমা। মাটি

থেকে প্রায় আধ মাইল ওপরে থাকতে এই 'পেয়ারা'গুলি মূল বোমা থেকে বেরিয়ে আসে।

প্রত্যেকটি 'পেয়ারা'র মধ্যে থাকে ১৬০টি ইস্পাতের ছোট ছোট বল। 'পেয়ারা' মাটিতে পড়ে বিস্ফোরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই বলগুলি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এই বলগুলি কংক্রীটের বা বাড়িঘরের ক্ষতি করে না কিন্তু মানুষ বা জন্তু-জানোয়ারের মাংসের মধ্যে তা ছিঁড়ে-খুঁড়ে ঢুকে যায় এবং একবার দেহের মধ্যে ঢুকতে পারলে সেগুলি পাকস্থলী, বুক, হাত, পা ভেদ করে ঘুরে ঘুরে কুরে কুরে এগিয়ে চলে।

এই রকম এক টিন ক্লাস্টার বোমা কয়েক শ' ফুট চওড়া আর বহু গজ লম্বা জায়গায় ঘাস-কাটার মতো প্রত্যেকটি মানুষকে খতম বা গুরুতর জখম করতে পারে।

এই সব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ধ্বংসের এক সর্বাত্মক অভিযান চলে আসছে ভিয়েৎনামে প্রতি দিন প্রতি রাত্রে, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে।

•এর ওপর আছে বিষাক্ত রাসায়নিক, গ্যাস। এগারো হাজার পাউণ্ডের এক এক বোঝা রাসায়নিক স্প্রে করতে সময় লাগে মাত্র চার মিনিট। ঐ চার মিনিটের স্প্রে তিনশো একরেরও বেশি জায়গায় যা কিছু সবুজ সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে সক্ষম।

যেহেতু জঙ্গল গেরিলাদের আশ্রয় সেইজন্য ঐ ছুতায় তারা ভিয়েৎনামের বনাঞ্চলকে এইভাবে নিষ্পত্র করতে উদ্যত হয়েছে। শুধু বনাঞ্চল নয়, এই বিষাক্ত রাসায়নিক ছড়ানো হচ্ছে ধানের ক্ষেতেও, গেরিলাদের খাদ্যের সংস্থান নষ্ট করার নাম করে। এবং কেবল ধানের ক্ষেতেও নয়, জনপদ এলাকাকেও, তাদের ওপর ব্যর্থতার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে, লোকগুলিকে তিলতিল করে হত্যা করার জন্যে, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গোড়া থেকেই পঙ্গু করে দেবার জন্যে।

গণহত্যার আর কি উপকরণ বাকী থাকতে পারে ?

প্লেন থেকে স্প্রে করে ছড়ানো এই বিষ পানীয় জল, খাদ্যদ্রব্য, শাকসব্জী, গাছপালার সঙ্গে মিশে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর এলাকায়। পাউডারের আকারে এই বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয় চিনি বা চালের সঙ্গে তারপর সেই চিনি ও চাল বিক্রী বা বিতরণ করা হয় জনসাধারণের মধ্যে। কিংবা বিষাক্ত রাসায়নিক ছিটিয়ে দেওয়া হয় কুয়ায়, নদীর জলে। কোয়াং নাই প্রদেশে এই রকম একটি বিষাক্ত নদীর জলে সাঁতার কাটবার পর তিনটি ছেলে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বোমারু বিমানের পেছন পেছন সাধারণত বিষাক্ত রাসায়নিক নিয়ে আসে হেলিকপ্টার কিংবা ডেকোটা। উজাড় করে ঢেলে দিয়ে যায়। বিষের গন্ধে যেন পুড়ে যায় নাক, জ্বালা করে চোখ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ধানের গাছ, আলুর পাতা, গাছের পাতা সব ঝরঝরে হয়ে যায় পুড়ে। তারপর মারা যায় পশু-পাখি। যে হতভাগ্য মানুষগুলি সেখানে থাকে, এর পরে আসে তাদের পালা। হঠাৎ প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয় মাথায়। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কাশতে কাশতে প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়। সেই সঙ্গে চলে বমি। বমির সঙ্গে বেরোতে থাকে রক্ত। ক্ষিদে চলে যায় সম্পূর্ণ। ঘুমোনো অসম্ভব হয়ে পড়ে। মনে হয় যেন সমস্ত শরীর হঠাৎ ওজন হারিয়ে ফেলে হাওয়ায় ভাসছে। ক্রমে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে, তারপর চোখ অন্ধ হয়ে যায় একেবারে।

সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে তারা।

একবার নয়, দু'বার নয়, কখনো কখনো বার বার ফিরে ফিরে আসে হত্যাকারীর দল। ফিরে ফিরে ছিটিয়ে দিয়ে যায় বিষাক্ত রাসায়নিক, যতক্ষণ না মাটির ওপর রীতিমতো একটা তৈলাক্ত আস্তরণ পড়ে যায় বিষের। এগুলিকে সাধারণ আগাছা নষ্টকারী রাসায়নিক বলে চালানো হচ্ছে, কিন্তু আসলে এগুলি হচ্ছে সাদা

আর্সেনিক, আর্সেনাইট সোডিয়াম, আর্সেনাইট ক্যালসিয়াম, ক্যালসিক সায়ানামাইড, ডিনিট্রোফেনল আর ডিনিট্রিকর্টো। এগুলি সবগুলিই অত্যন্ত মারাত্মক বিষ। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর যে তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি ছড়িয়ে পড়ে, বিষাক্ত রাসায়নিকের এই নির্বিচার ব্যবহার তার চাইতেও মারাত্মক।

এবং দেখা গেছে এই সব বিষ শুধু বনাঞ্চলেই নয়, বড় বড় ঘনবসতি এলাকাতেও ছড়ানো হয়েছে।

গণহত্যা ছাড়া একে আর কি নামে অভিহিত করা যায়?

এত বড় ব্যভিচার ইতিহাসে আর কখনো হয়নি। নিজের রাজনৈতিক স্বার্থ আর শক্তির জেদ বজায় রাখার জন্যে একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার এত কুৎসিত ষড়যন্ত্র দেখা যায়নি আর কখনো। কী বীভৎস অত্যাচার, কি নিবিড় নির্যাতন, কি ব্যাপক ধ্বংসলীলা, কি বেপরোয়া নরহত্যা! এবং অপরাধের কি অবাধ অধিকার! দুনিয়া চুপ করে, হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে, আর বর্বরেরা একটি নিরপরাধ জাতির বুকের ওপর বসে তার টুঁটি ছিঁড়ে রক্ত পান করে চলেছে।

কি চমৎকার!

দিন তুয়ং প্রদেশের হোয়া ফু গ্রামের একটি বাচ্চা ছেলে লে ভান দিন তার বাড়ির কাছে একটা বীজতলায় কাজ করছিল। এমন সময় দু'জন সৈন্য তাকে দেখতে পেয়ে ডাক দিল: "এই ছোকরা, এদিকে আয়!"

হঠাৎ সৈন্যদের দেখে এত ভয় পেয়েছিল ছেলেটি যে তার নড়বার শক্তি ছিল না। সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করে চলে গিয়েছিল।

এর নাম কি যুদ্ধ?

দুপুরবেলা তার বাড়িতে বসে মা আর একজন প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে খেতে বসেছিল তেরো বছরের ছেলে গিয়ান। ঐ সময় আশেপাশে কোথাও কোন গেরিলা-বিরোধী অভিযান চলছিল না। হঠাৎ একটা হেলিকপটারের আওয়াজ শোনা গেল আর তার পরেই মেশিন-

গানের বুলেট ছাদ ফুটো করে প্রবল বেগে আসতে লাগল। অন্তত দুটো বুলেটের আঘাতে আহত হল গিয়ান।

এর নাম কি যুদ্ধ?

ফু ইয়েন প্রদেশের চি থান গ্রামে বোমায় বোমায় ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত করে আমেরিকানরা এলো। কয়েকটি মেয়ে ঐ সময় হাট থেকে ফিরছিল। রাইফেল উঁচিয়ে তাদের ঘিরে ফেলে বলল জি-আইরা: "খোল্, তোদের পা-জামা খোল্!" তারপর চলল তাদের ওপর সমবেত বলাৎকার।

এর নাম কি যুদ্ধ?

"আমেরিকানরা যখন আসে তখন আমার আঠেরো বছরের মেয়ে আর চোদ্দ বছরের ছেলে গরু চরাচ্ছিল। তারা আর ফিরে আসে নি।" এই অভিযোগ এক ক্রন্দনরত মা'র।

এর নাম কি যুদ্ধ?

কোয়াং নাই প্রদেশের সন তিন জেলার গ্রামে পলায়মান নারী, শিশু আর বৃদ্ধদের ধরে এনে একটি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়ে হাত বোমা আর বিষাক্ত গ্যাস ছুঁড়ে দিয়েছিল ভেতরে। এগারো-বারো বছর বয়সের মেয়েদেরও ওরা বলাৎকার করতে করতে হত্যা করেছে। সন ত্রা গ্রামে একটি অন্তঃসত্ত্বা মহিলার ওপর বলাৎকার করে ছুরি দিয়ে তার পেট চিরে ভ্রূণ বার করে খণ্ড খণ্ড করে কেটেছিল; তারপর মহিলার হাত-পা আর স্তন কেটে নিয়েছিল।

হে ভগবান, এরই নাম কি যুদ্ধ?

অথচ এই যুদ্ধই ভিয়েৎনামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দিনের পর দিন। আমরা তার প্রতিকার করতে পারছি না। এ পাপ আমার, এ পাপ আপনার, এ পাপ সমগ্র মানবজাতির।

চোদ্দ

সভ্যতার সূর্যাস্ত

ভিয়েৎনামীদের মধ্যে একটি পুরানো গল্প প্রচলিত আছে। একটি ব্যাঙ এবং একটি বিছা দু'জনেই একটি নদীর ধারে বসেছিল। ব্যাঙের কোন তাড়া ছিল না, কিন্তু বিছার তাগিদ ছিল ওপারে যাবার। কিন্তু কী করে যায়। সে তো সাঁতার জানে না।

বিছা বলল ব্যাঙকে: "ভাই ব্যাঙ, তুমি আমাকে নদীটা পার করে দেবে?"

ব্যাঙ বলল: "না বাবা, আমি তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাই আর তুমি মাঝপথে আমাকে কামড়ে দাও।"

বিছা: "বিশ্বাস কর আমার সে-রকম কোন উদ্দেশ্য নেই। আমি শুধু নদীটা পার হ'তে চাই। আর তাছাড়া মাঝপথে যদি আমি তোমাকে কামড়াই তাহলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে তো আমিও ডুবব, কারণ আমি সাঁতার জানি না।"

ব্যাঙ ভাবলো, এটা তো বিছা ঠিক কথাই বলেছে। মাঝপথে সে কামড়াবে কেন। অগত্যা সে রাজী হল।

ব্যাঙের পিঠে চেপে বসল বিছা। ব্যাঙ তাকে নিয়ে নামল জলে এবং এক সময় পৌঁছে গেল ওপারে তীরের কাছে।

আর সেই সময়েই বিছা ব্যাঙের পিঠ থেকে নেমে ডাঙায় উঠতে যাবে, ব্যাঙের গায়ে দিল সজোরে একটা কামড় বসিয়ে।

যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বিস্মিত ব্যাঙ জিজ্ঞেস করল বিছাকে: "এটা কী রকম হল?"

বিছা ততক্ষণে ডাঙায় উঠে পড়েছে, হাসতে হাসতে জবাব দিল: "জিন লোই, আমি দুঃখিত।"

জেনেভা বৈঠকে মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে ("আমরা এই চুক্তির কথা নজরে রাখছি এবং আশ্বাস দিচ্ছি যে, আমরা এমন কিছু করব না যাতে এই চুক্তি বিঘ্নিত হতে পারে") মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েৎনামের অনিচ্ছুক ঘাড়ে কায়েম হয়ে বসেছিল। তারপর উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হয়ে গেছে তখন নিজেরই দেওয়া কথার খেলাপ করে ভিয়েৎনামীদের বুকে সজোরে দাঁত বসিয়ে দিতে তার "স্বাধীন" বিবেকে বাঁধেনি।

বিগত চোদ্দ বছর ধরে সেই বিষাক্ত কামড়ের যন্ত্রণায় ভিয়েৎনামের মানুষ ছটফট করে মরছে।

হ্যাঁ, একটা দেশ, একটা জাতিকে ওরা সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায়, সুপরিকল্পিতভাবে, তিলে তিলে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। এই চক্রান্তের সম্পূর্ণ কাহিনী যদি কোনদিন উদঘাটিত হয় তাহলে দেখা যাবে এত জঘন্য, এত নগ্ন, এত ব্যাপক গণহত্যা ইতিহাসে আর কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি।

লে ভান বিয়া আমাকে বলেছিল, আমার দেশে যাচ্ছ, দেখবে কত সুন্দর সে দেশ। কিন্তু সে কোন্ দেশ আমি দেখে এলাম। সে কোন্ দেশ আমি দেখছি। একটা ছোট্ট দেশ, যে আর পাঁচটা দেশের মতোই স্বাধীনভাবে বাঁচতে চেয়েছিল, একটি ক্ষুদ্র জাতি যে নিজের ছোট্ট সুখ, ছোট্ট দুঃখ নিয়ে শান্তিতে থাকতে চেয়েছিল, পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি তার ওপর নিজের ক্ষমতার ঔদ্ধত্য চরিতার্থ করছে। এর চাইতে কুৎসিত আর কী হতে পারে?

ওরা বলবে, যুদ্ধ হলেই এই ধরণের কিছু কিছু দুর্ঘটনা ঘটবে এ আর বিচিত্র কি। কিন্তু আমি বলতে চাই এটা যুদ্ধ নয়, জেহাদ। ওরা 'শত্রু'কে খুঁজে পাচ্ছে না, 'শত্রু'কে ওরা চেনেও না, চেনার সাধ্যও ওদের নেই, তাই সাধারণ মানুষকে হত্যা করে ওরা 'শত্রু'কে খতম করতে চায়। এত নোংরা, এত বর্বর লড়াইয়ের কথা ইতিহাসে আর লেখা নেই।

যত গ্রাম আছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তার অর্ধেকেরও বেশী বিধ্বস্ত

হয়ে গিয়েছিল ১৯৬২ সালের মধ্যেই, যখন গেরিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সক্রিয়ভাবে আরম্ভ হয়েছে মাত্র দু'বছর।

তারপর এই যুদ্ধ ক্রমে আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। আরো মার্কিন সৈন্য আমদানী হয়েছে ভিয়েৎনামে। আগে রণনীতি ছিল 'ক্লিয়ার অ্যাণ্ড হোল্ড', অর্থাৎ জায়গায় জায়গায় ঘাঁটি করে সেখান থেকে গেরিলাদের হটিয়ে কায়েম হয়ে বসে থাকা। ১৯৬৪ সাল থেকে ওই নীতি পাল্টে করা হয় 'সার্চ অ্যাণ্ড ডেষ্ট্রয়,' অর্থাৎ গেরিলাদের খুঁজে বার করে খতম কর। ১৯৬৫ সালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সর্বত্র ব্যাপকভাবে বোমারু আক্রমণ চালানো হবে। ভিয়েৎনামে তখন যুদ্ধ পরিচালনা করছেন জেনারেল ওয়েস্ট-মোরল্যাণ্ড, আর ওয়াশিংটনে গদীতে রয়েছেন প্রেসিডেণ্ট জনসন।

আরো তিন বছর কেটে গেছে তারপর। মার্কিন অস্ত্রাগারে যত রকমের মারণাস্ত্র আছে এবং মার্কিন গবেষণা যত নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছে, তার সবগুলি এই তিন বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে ভিয়েৎনামে।

ওরা বলে কেবল 'ভিয়েৎকংদের' বিরুদ্ধেই এইসব মারণাস্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে। এর চাইতে নির্জলা মিথ্যা কথা আর কিছু হতে পারে না। বেশীর ভাগ সময়েই ওরা জানেই না গেরিলারা কোথায় আছে। ওরা আন্দাজে আক্রমণ চালায়।

নইলে বি-৫২ ভারী বোমারু বিমান ব্যবহার করার দরকারই হ'ত না।

অতিকায় বিমান বি-৫২। যদি পারমাণবিক যুদ্ধ লাগে তাহলে এই বিমানই আমেরিকার পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপ করবে। অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তীর্ণ এলাকায় নিবিড়ভাবে বোমাবর্ষণ করতে এই বিমানের জুড়ি নেই। এবং মার্কিন মহলের নিজেদের স্বীকারোক্তি অনুসারে এই বিমান ব্যবহার করা হচ্ছে বিশেষভাবে এই জন্যে যে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু আকাশ থেকে নজর করা সম্ভব নয়।

সায়গনের উত্তরে ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মধ্য-অঞ্চলে দিনের পর দিন প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয়েছে বি-৫২ দিয়ে। নিবিড় বোমাবর্ষণে কার্পেট রচনা করা হয়েছে মাটিতে। এর পরেও আমাদের বিশ্বাস করতে হবে কোন গ্রাম, কোন জনপদ ধ্বংস হয়নি, অ-সামরিক কোন ব্যক্তির গায়ে আঘাত লাগেনি? এবং এই ধ্বংসকার্য, এই আঘাত সজ্ঞান ইচ্ছাপ্রসূত নয়?

১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে টংকিং উপসাগরে একটি রহস্যজনক অতিরঞ্জিত এবং অনেকাংশে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে মার্কিন সরকার ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে যুদ্ধকে সপ্তদশ সমান্তরালের উত্তরে সম্প্রসারিত করেন। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত সমানে, দিনের পর দিন, তাঁরা উত্তর ভিয়েৎনামের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করে আসছেন। এই নির্লজ্জ আক্রমণের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী প্রতিবাদ ধ্বনিত হলে তারা জানান, এই বোমা কোন লোকালয়ে ফেলা হচ্ছে না, কোন অসামরিক ব্যক্তি এর দ্বারা নিহত হচ্ছে না; এই আক্রমণের উদ্দেশ্য উত্তর থেকে দক্ষিণে সৈন্য ও রসদ চলাচলের যে-সব রাস্তা আছে সেগুলি নষ্ট করে দেওয়া।

সবাই ভাবল, কত সংযম, কত বিবেচনা! কিন্তু কেমন ছিল ওই সংযম ও বিবেচনার ধরণ?

'বিহাইণ্ড দি লাইনস—হ্যানয়' বইয়ে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর হ্যারিসন সল্স্‌বেরী তার কিছু কিছু উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু তার চাইতেও বিস্তৃত, মর্মস্পর্শী, স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে ফ্রাঁসোয়া শালে নামে আরেকজন সাংবাদিকের লেখায়। 'লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ ইন হ্যানয়' এই শিরোনামে ফিলিপিন্সের ম্যানিলা টাইমস কাগজে ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে পরপর তিনি যে লেখাগুলি লেখেন তা সকলকে স্তম্ভিত করেছিল।

শালে লিখেছেন: "কোথায় আরম্ভ করব? দৃশ্যপট হতাশ-জনকভাবে স্থায়ী। লিটল লেকটা পার হয়ে সবেমাত্র আমি মোড়

ঘুরেছি, অমনি চোখের সামনে অত্যন্ত শোচনীয় একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। এই একটিমাত্র এলাকায়, শহরের একেবারে মাঝখানে এবং কোন সামরিক লক্ষ্যবস্তু থেকে দূরে, আমি গুণে গুণে দেখলাম কমপক্ষে ১৫৩টি বাড়ি একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। বাড়িগুলির অধিকাংশই ছিল তিন তলা। এখন শুধু অবশিষ্ট আছে বাঁকানো ধাতু আর ভাঙা ইট-কাঠের একটা স্তূপ: ব্যালকনিগুলি এসে নেমেছে রাস্তায়।

"ভেতরে, যারা মাত্র কালকেও সেখানে বাস করেছিল এবং যারা মারা যায়নি, দেখলাম তারা ওই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে, এখানে ভাঙা-চোরা ভাতের হাঁড়ি, সেখানে মহিষের শিংয়ের চপস্টিক, কিংবা প্রিয়জনের কোন ফটো···

"বিমানগুলি বাক মাই হাসপাতালকেও রেহাই দেয়নি। শুনলাম, একজন ডাক্তার ও দু'জন নার্স সমেত ২০০ জন হতাহত হয়েছে। এমনকি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের বাড়িটিও বাদ যায়নি। বছর পঁচিশ বয়সের একজন ভারতীয় সৈন্য, মঙ্গল, বৃটিশ দূতাবাস থেকে মাত্র এক ঢিলের দূরত্বে একটি শেল্টারে যাবার সময় শ্রাইক ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়। দেয়ালটা ভরে গিয়েছিল বোমার টুকরায়, বসন্তের গুটির মতো। সিঁড়িটির অস্তিত্বই ছিল না।"

এরপর শালে একটি পুরো গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার বিবরণ দিয়েছেন।

"হ্যানয় ও সপ্তদশ সমান্তরালের মাঝামাঝি তাই বিন প্রদেশে তান তিয়েন নামে একটি গ্রাম ছিল। ছিল—কারণ এখন আর নেই। দু'টি মার্কিন বিমান আঠেরোটি বোমায় মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এই গ্রামকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল।

"এখন সেখানে একটি বাড়িও দাঁড়িয়ে নেই। একান্নজন নিহত হয়েছিল, তাদের মধ্যে ৩৯ জন শিশু ছ'জন বৃদ্ধ, এবং দু'জন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। আহত হয়েছিল ৩১জন, তার মধ্যে আটজন শিশু ও একজন বৃদ্ধ।

"এই ধ্বংসকার্য চালানো হয়েছিল এমন এক ধরণের বোমা নিয়ে যা মানুষের দেহ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দেয়। বেলা তখন ১টা বেজে পাঁচ মিনিট। মাঠে কাজ করছিল লোকেরা। বোমার আওয়াজ শুনে দৌড়ে ফিরে গিয়ে দেখে পুড়ে যাওয়া গাছের ডালপালায় হাত, পা, মাথা, নাড়ীভূঁড়ি আটকে আছে। এই হাত, পা, মাথা, নাড়ীভূঁড়ি যাদের ছিল তারা কয়েক মিনিট আগেও নিজেদের সুখ, নিজেদের আনন্দ নিয়ে বেঁচে ছিল।"

এবং কিসের খেসারত দিয়েছিল তারা ?

শালে বলছেন: "সমস্ত কিছু বিবেচনা করার পর আমার মনে হয়েছে এই গ্রাম একটা ভুল করেছিল। আরো অনেক গ্রামের মতো এই গ্রামটি বোমারুদের ফিরতি রাস্তার ধারে অবস্থিত ছিল। ফেরার পথে ওরা তাদের শেষ বোমাগুলি ফেলে গিয়েছিল এখানে, কারণ বোমা হাল্কা করতে না পারলে তাদের বিমানবাহী জাহাজে নামতে দেওয়া হবে না।

"একটা গোটা প্রদেশকে এইভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিন বিন প্রদেশ। তারই একটি শহর ফাট ডিয়েন। ফাট ডিয়েন বলে এখন আর কিছু নেই। আমি তার ধ্বংসাবশেষ দেখে এসেছি।"

এর পরে যদি নিউ ইয়র্কের বন্দরের মুখে দাঁড়ানো স্ট্যাচু অব লিবার্টিও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে যে, আমেরিকা ভিয়েৎনামে কোন নোংরা লড়াই লড়ছে না, তবু আমরা সে-কথা বিশ্বাস করতে পারব না।

লে ভান বিয়া আমাকে নিয়ে গিয়েছিল তার বাড়িতে। বুংয়ে।

খুব বড় জায়গা নয় বুং। আমাদের দেশের গঞ্জের মতো। দু'চারটে দোকান এধার-ওধার ছড়ানো। বেশীর ভাগই মনিহারীর, কিছু ছিট-কাপড়ের, দুয়েকটা কোকা-কোলার। সেইখানেই বিয়ার 'প্রাসাদ'।

ছোট্ট দোতলা বাড়ি। একতলায় দোকান। বিয়া নিজেই দোকান দিয়েছে। সাংবাদিকতার সঙ্গে এ-কাজটিও সে করে। পার্টিশন দিয়ে দোকান থেকে ঘরের একটা অংশ আলাদা করে রাখা হয়েছে। সেখানেই বিয়ার ছোট্ট সংসার। দোতলায় একখানা ঘরে জিনিসপত্র রাখা থাকে, মাঝে-মধ্যে দরকার হলে শোয়ও।

সংসার! ওই অন্ধকার খুপরির মধ্যে কয়েকটি প্রাণীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নাম যদি সংসার হয়, তবে তা-ই।

আমি যেতেই সারা গায়ে ধুলো-কাদা মাখা দুটি ছেলেমেয়ে আদুড় গায়ে ওই খুপরি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তাদের একজনকে কোলে তুলে নিয়ে এক গাল হেসে বিয়া পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল: "আমার ছেলে।"

বিয়ার সঙ্গে আমি সেই খুপরির মধ্যে ঢুকেছিলাম। দেখলাম, ঘরের এক কোণে, মাটি থেকে গজখানেক উঁচু হবে, একটা ইটের পাটাতন বানানো রয়েছে। ভেতরটা ফাঁকা। ছেলেমেয়ে দুটি একবার তার মধ্যে ঢুকছে আরেকবার বেরোচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম: "এটা কি ব্যাপার বিয়া?"

বিয়ার চোখ দুটি নিমেষে করুণ হয়ে এসেছিল। "এই তো আমাদের জীবন," সে বলেছিল। "কখন লড়াই লাগবে, গোলা-গুলি ছুটবে কে জানে। গোলা-গুলির আওয়াজ শুনলেই আমরা ওর ভেতর গিয়ে ঢুকি। তবু কিছুটা বাঁচোয়া।"

তারপর একটু থেমে সে বলেছিল, "এমনও সময় গেছে যখন রাতের পর রাত ওই ইটের গাঁথনির নিচে ঘুমোতে হয়েছে।"

"এইরকম গাঁথনি কি সব বাড়িতেই আছে?" আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

"প্রায় সব বাড়িতেই," সে বলেছিল। "না রেখে উপায় কী বল, একটা নিরাপত্তা তো চাই। আমাদের জন্যে নয়, আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে।"

ওই গাঁথনিগুলিকেই ওরা চালাচ্ছে বাঙ্কার বলে, এবং বাড়ির ভেতর এই রকম গাঁথনি থাকলেই ওরা মনে করে সেটা 'ভিয়েৎ-কংদের' ঘাঁটি। এই রকম সন্দেহের ভিত্তিতে হত্যা করেছে শত শত মানুষকে, জ্বালিয়ে দিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম।

অপর পক্ষে গেরিলাদের হাতে যে-সব মার্কিনী ধরা পড়ে, তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অপরাধের অভিযোগ আছে। অথচ তাদের প্রতি গেরিলাদের আচরণ কী রকম?

আমি একজন মার্কিন সামরিক উপদেষ্টার কথা শুনেছিলাম যিনি 'ভিয়েৎকংদের' হাতে বন্দী হয়েছিলেন। তাঁর কাজই ছিল 'ভিয়েৎকংদের' কিভাবে ধ্বংস করা যায় সে-সম্পর্কে দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সৈন্যদের পরামর্শ দেওয়া। সুতরাং তাঁর প্রতি 'ভিয়েৎকংদের' রাগ থাকা স্বাভাবিক।

কিন্তু, ১৯৬২ সালের ডিসেম্বরে ছাড়া পাবার পর তিনি জানিয়েছিলেন, কোন সময়েই তিনি 'ভিয়েৎকংদের' হাতে নিগৃহীত হননি। তারা তাঁকে খুবই যত্নের সঙ্গে রেখেছিল। এবং বড়দিনের প্রাক্কালে তাঁকে টিকিট কেটে একটা বাসে তুলে দিয়ে বলেছিল, তিনি এখন নির্ভয়ে তাঁর স্বাধীনতায় ফিরে যেতে পারেন।

ওই মার্কিন উপদেষ্টার নাম রোক মাতাগুলে। গুয়াম দ্বীপবাসী মার্কিনী। তিনিই আরও জানিয়েছিলেন যে, গেরিলারা অবাধে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতো এবং গ্রামবাসীরা তাদের নিজে থেকেই এগিয়ে এসে খাবার ও আশ্রয় দিত।

মিঃ শালে তাঁর রিপোর্টে একজন মার্কিন পাইলটের উল্লেখ করেছেন যিনি হ্যানয়ের ওপর আক্রমণ চালাতে গিয়ে গুলিতে ভূপাতিত হয়েছিলেন।

মিঃ জন সিডনী ম্যাককেইন, ওই বৈমানিক, হ্যানয়ের একটি হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে মিঃ শালেকে বলেছিলেন তাঁর কথা।

"আমি হ্যানয়ের ওপর বোমা ফেলার জন্যে এসেছিলাম। আমার ২৩তম অভিযান। ওই সময়েই আমার বিমান আহত হয়। ইজেক্টার সীটের সাহায্যে আমি রক্ষা পাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ইজেক্টার সীটের ব্যবস্থাকে চালু করতে গিয়ে আমার দুটি হাত আর ডান পা ভেঙে যায়। আমি চেতনা হারিয়ে একটি লেকের জলে পড়ে যাই। কয়েকজন ভিয়েৎনামী জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে তুলে নিয়ে আসে। আমি পরে জানতে পারি ওরা জনা দশেক ছিল। তারা আমাকে সোজা হাসপাতালে নিয়ে আসে। আমার অবস্থা ছিল মর-মর। একজন ডাক্তার আমার পায়ে অপারেশন করেন এবং একই সময় অন্যান্যেরা আমার হাত দুটির যত্ন নেন।"

মিঃ শালে জিজ্ঞেস করেছিলেন: "ওরা আপনার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করছে?"

"খুব ভালো। সকলেই আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে।"

"খাবার কী রকম?"

দুর্বলভাবে হাসলেন মিঃ ম্যাককেইন। বোঝা যাচ্ছিল সামান্য নড়াচড়াতেও তাঁর কষ্ট হচ্ছে।

"এটা তো আর প্যারিস নয়। প্যারিসের খানা কী করে আশা করতে পারেন। কিন্তু ভালোই চলে যায়।"

"আপনাকে কিছু পড়তে-টড়তে দিয়েছে কি?"

"দিয়েছিল, কিন্তু আমার হাত একটা খবরের কাগজও ধরতে পারে না।"

ওরা বলে 'ভিয়েৎকংরাই' ওদের আক্রমণের লক্ষ্য। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে, জবাব দিক "স্বাধীন" দুনিয়ার বিবেক, নারী ধর্ষিত লাঞ্ছিত অপমানিত হয় কেন? কেন 'ভিয়েৎকংদের' খোঁজ না পেলে গ্রামকে গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যায়? কেন হাসপাতাল,

স্কুল, মঠ, মন্দির গীর্জার ওপর বোমা বর্ষিত হয়? কেন সাত-আট-দশ বছরের ছেলেমেয়েরা নিহত হচ্ছে দলে দলে? কেন চাষীর ধানের ক্ষেত পুড়ে ছাই হয়ে যায়? কেন মাতৃহারা শিশু, পুত্রহারা জননীর কান্নায় ভিয়েৎনামের আকাশ, বাতাস, নদী, বন, মাঠ ভরে ওঠে?

আর যদি আজ এটাই ওরা বুঝে থাকে যে 'ভিয়েৎকংরা' ভিয়েৎনামের প্রতিটি মানুষের মধ্যে, ধূলিকণার মধ্যে, জঙ্গলের পাতার মধ্যে, নদীর স্রোতের মধ্যে, মাঠের ঘাসের মধ্যে হাজার, লক্ষ, কোটি হয়ে ছড়িয়ে আছে, এবং যদি এটাই হয়ে থাকে যে, ভিয়েৎনামকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত না করা পর্যন্ত 'ভিয়েৎকংদের' পরাস্ত করা যাবে না তাহলে ওই দেশে থাকবার কোন্ অধিকার তাদের আছে?

রক্ত উত্তপ্ত না হয়ে পারে না যখন দেখি এশিয়ার মাটিতে গণহত্যার এই চক্রান্ত করেছে আমেরিকা তার নিজের বৈষয়িক স্বার্থরক্ষার খাতিরে। ১৯৩৫ সালে যুদ্ধ সম্প্রসারণের পেছনে একটা বড় উদ্দেশ্যই ছিল শিথিল মার্কিন অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলা। এটা পক্ষপাতদুষ্ট অনুমান কিংবা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচার নয়।

১৯৩৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদটি দিয়েছিলেন মিঃ এম, জে, রোস্যান্ট, আর তার শিরোনামা ছিল 'ভিয়েৎনামের যুদ্ধ মার্কিন অগ্রগতিতে সাহায্য করছে।' ঐ সংবাদ থেকেই আমি এখানে কিছু কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি।

মিঃ রোস্যান্ট লিখছেন: "অল্পে অল্পে এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী শান্তিকালীন অর্থনৈতিক বিকাশ প্রায় শেষ হবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। ভিয়েৎনামের যুদ্ধের সম্প্রসারণ তাকে নবজীবন দান করেছে।

"জনসনের সরকার এটা স্বীকার করছেন না, ...কিন্তু সর্বশেষ যে অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান প্রচার করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক কাজকর্ম শিথিল হয়ে এসেছিল এবং পিছু দিকে না হটলেও দীর্ঘকালের জন্যে ঐ কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবার একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। ভিয়েৎনাম এসে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে।...

"সামরিক ব্যয় যদি সম্প্রতি না বাড়ানো হ'ত তাহলে আগস্ট মাসে (শিল্প উৎপাদনে) যে শৈথিল্য দেখা গিয়েছিল তা আরো প্রকট হ'ত। তাহ'লে সম্প্রসারণের কালের সমাপ্তি সূচিত হতে পারত। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যয়, যা এখন বাড়ছে, কমতে পারত। এবং ক্রেতারা তাদের চাহিদাকে সংকুচিত করার ফলে উৎপাদনও আরো কমতে পারত।...

"ভিয়েৎনাম যুদ্ধের সম্প্রসারণ একেবারে ঠিক সময় বুঝে করা হয়েছিল। এর ফলে সরকার নিজের অক্ষমতার কথা স্বীকার না করেও প্রয়োজনীয় (অর্থনৈতিক) অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। এর দ্বারা কেবল অর্থনীতিই হোঁচট খাওয়া থেকে বেঁচে যায়নি, জনসন সরকারের সুনামও রক্ষা পেল।"

গেরিলারা কম্যুনিস্ট না অ-কম্যুনিস্ট, ভিয়েৎনামের লড়াই কম্যুনিজম প্রসারের আন্দোলন কি না, সে প্রশ্ন আজ অবান্তর। বৃহৎ শক্তির ক্ষমতার অপরিমেয় ঔদ্ধত্য, "সভ্য ও স্বাধীন" দুনিয়ার এই বর্বরতম অত্যাচার ভিয়েৎনামের প্রশ্নটিকে আজ মানবজাতির সামনে সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক প্রশ্ন রূপে হাজির করেছে। ছোট বলেই কি কোন দেশের স্বাধীনভাবে বাঁচবার অধিকার নেই? ক্ষুদ্র বলেই কি কোন জাতির নিজের ইচ্ছা মতো নিজের ভাগ্য ঠিক করে নেবার অধিকার নেই? একদল স্বার্থান্বেষী, দুর্নীতিপরায়ণ, অপদার্থ, অর্থলোভী, ক্ষমতালোভী তাঁবেদারের পরামর্শে একটা গোটা জাতিকে আমরা ধ্বংস হ'তে দেব? এবং দেশের অধিকাংশ মানুষের

ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের বৈষয়িক স্বার্থ রক্ষার ও রাজনৈতিক খামখেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি একটা জাতির ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, আমরা তা সহ্য করব ?

পৃথিবীর শান্তি, পৃথিবীর নিরাপত্তা আজ এই প্রশ্নগুলির ওপর নির্ভর করছে। মানবজাতির ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে ভিয়েৎনামে। ভাগ্যের এই পরীক্ষায় যদি আমরা জয়লাভ করতে চাই, তাহলে বৃহতের ক্ষমতার এই ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে দুনিয়ার সৎ, শান্তিবাদী, ন্যায়পরায়ণ মানুষকে সংঘবদ্ধ হ'তেই হবে।

মানুষ, মানুষের অধিকারের চাইতে কোন মতবাদ বড় হ'তে পারে না।